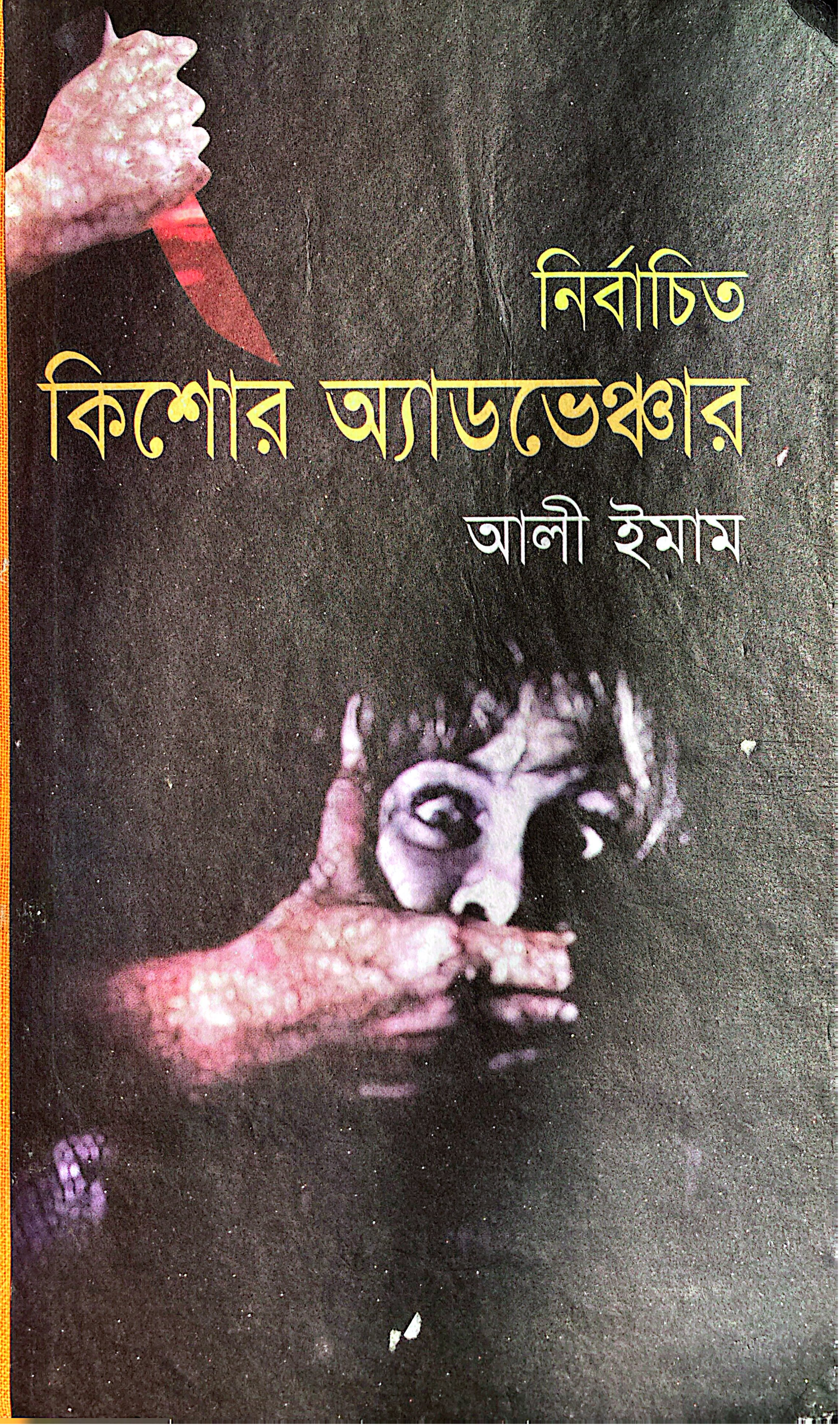
নির্বাচিত কিশোর অ্যাডভেঞ্চার

আলী ইমাম



নির্বাচিত কিশোর অ্যাডভেঞ্চার

আলী ইমাম



আরো প্রকাশন

আরো প্রকাশন
৬৮/৬৯, রুমী মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISBN. 984-728-024-10

প্রকাশক
আলমগীর মল্লিক
১২/১৩, ৬৮-৬৯ রুমী মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুঠোফোন : ০১৯১১-৩৫২০০৪

প্রথম প্রকাশ ❑ একুশে বইমেলা, ২০১৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ ❑ একুশে বইমেলা, ২০২০

প্রচ্ছদ ❑ মশিউর রহমান

বর্ণবিন্যাস ❑ মাইক্রোটেক কম্পিউটার
মুদ্রণ ❑ হেরা প্রিন্টার্স, ২/১ তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য ❑ তিনশত নব্বই টাকা মাত্র

Nirbachito Kishore Adventure, by Ali Imam, Published by Alamgir Mollik
First Published : February 2016, 2nd Edition : February 2020
Aaro Prokashon, 12/13, 68-69 Rumi Market, Dhaka-1100
Mobail : 01911-352004
e-mail : aaro.prokashon@gmail.com,

Price : Taka 390.00 Only US $ 15 ∈ 10

USA DISTRIBUTOR : MUKTADHARA, 37 69 74* ST F12
JACKSON HEIGHTS NY 11372 TEL : (718) 565-7258

উৎসর্গ

মোসতাক আহমেদ

রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনি বিন্যাসে
যিনি নতুন মাত্রা এনেছে

সূচিপাতা

অ্যাডভেঞ্চার গল্প

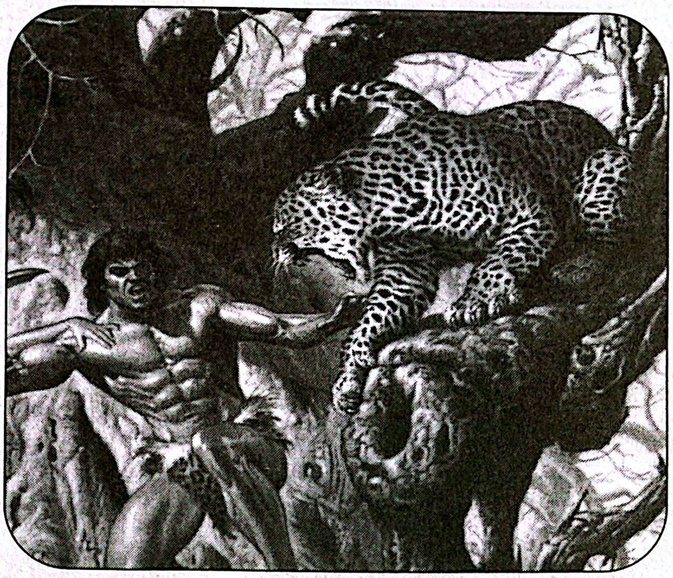
কালো চিতা-১১
নীলডুংরির আতঙ্ক-২৬
কঙ্ক-৩৯
তিসিমুখির চিলের বাসা-৪৪
সে দিন রাতে-৫০
শাদা কাকাতুয়া-৫৬
সোনার চিল-৬৫
পাশিঘাট পেরিয়ে-৭২
সোনালি শহর-৭৫
ধীরাশ্রমের সেই লোক-৯১
পাখির মৃত্যু-৯৪
পাহাড়ে প্রেতপুরি-৯৮
রুকুর বন্ধু-১০৪
মৃতদেহ চুরি গেল-১০৯
ইচ্ছেশক্তি-১১৫
সমুদ্রের ভয়ঙ্কর-১২২

অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস

কালো সারসের রহস্য-১৩১
প্রবাল দ্বীপের আতঙ্ক-১৭১
বিরল প্রাণীর খোঁজে-২০৫



অ্যাডভেঞ্চার গল্প



কালো চিতা

সরসর করে একটা শব্দ হলো যেন। বাতাসে পাতা কাঁপার শব্দ এটা না। সামনের ঘনবনটা নড়ছে। কোনো প্রাণী আছে ওখানটায়। ঝোপের আড়াল থেকে আকা তাকিয়ে থাকে। ওর চোখ দুটো চিলের চোখের মতো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। ওখানে পায়ে পায়ে মৃত্যু। কোথাও গাছের বাকলের রঙের সাথে শরীর মিশিয়ে জড়িয়ে আছে সাপ। সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে। কোনো গাছের ডালে ঘাঁপটি মেরে বসে আছে চিতা। চোখের পলকে হলুদ ঝিলিক তুলে ঝাঁপিয়ে শরীর ফালা ফালা করে দেবে। এ বনে বেঁচে থাকতে হলে তাই প্রতিপদে সাবধানী হতে হয়। এ পাহাড়ে বেঁচে থাকতে হলে তাই লড়াই করে টিকে থাকতে হয়। ওদের দলের গুণীন বুড়ো রাতেরবেলা আগুনের শিখার পাশে বসে তাই বলে, যারা লড়াই করতে পারবে শুধু তারাই বেঁচে থাকবে। ঝড় আমাদের ঘর ভাঙে। ঝড় তাই শত্রু। পাহাড় থেকে পাথর নামে গড়িয়ে। সেই পাথরে আমাদের মানুষ যায় থেঁতলে। তাই পাহাড় আমাদের শত্রু। নদীর বানে কখনো কখনো ভেসে যাই আমরা। তাই নদী আমাদের শত্রু। এ ছাড়া হিংস্র প্রাণী তো রয়েছেই। চারদিকে এতো শত্রু। তাই লড়াই করে টিকে থাকতে হবে আমাদের।

তখন আগুনে পোড়ান হয় শিকার করে আনা পশুর মাংশ। দলের সবাই গোল হয়ে বসে থাকে আগুনের কুণ্ডের চারদিকে। রাতচরা পাখিরা

ডাকে। সেই মাংশ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় ওরা। সাথে মহুয়া কুঁড়ির ঘন রস। দলের কেউ কেউ চিৎকার করে নাচতে থাকে।

হেই বাবা বোংগা! আমাদের দাও শাণ দেয়া পাথর। তাই দিয়ে অস্ত্র বানাব আমরা। সেই অস্ত্র বিঁধবে গায়ে পশুর বুকে। পশুর রক্তে সবুজ ঘাস লাল করে দেব।

হেই বাবা বোংগা। আমাদের দাও শক্ত ধাতু। তা ঘষে ঘষে বর্শা বানাব আমরা। সেই বর্শা বিঁধবে গিয়ে ধূর্ত চিতার বুকে। ধূর্ত চিতা আমাদের সন্তানদের নিয়ে যায় বনে। আমাদের সন্তানদের শাদা হাড় পাই বনে। ঐ চিতার বিনাশ চাই।

বোংগা দেবতার উদ্দেশ্যেই এই গান গাইতে গাইতে তখন নাচতে থাকে দলের লোকেরা। রাতের আকাশে নক্ষত্র জ্বলে ঝিকমিক করে। আগুনের তেজ কমে আসতে থাকলে শুকনো পাতা ছুঁড়ে দেয়া হয়। আকা মাংশ খেতে খেতে এ সব দেখে।

এখন দুপুরের লাল রোদে এই পাহাড়ি জায়গাটা কেমন সুনসান করছে। অনেক উঁচুতে উড়ছে কয়েকটি বাজপাখি।

আকার হাতের মুঠোতে ধরা পাথরের ফলা। চোখ সামনের ঘাসবনের দিকে। যদি কোনো প্রাণী দেখা যায়। আকাশে যখন ভালো করে আলো ফোটেনি তখনি ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে আকা। সেই থেকে শিকারের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছে। অন্যদিন হলে ওর বাবাই যেত। কিন্তু আকার বাবা এখন আহত হয়ে ঝুপড়ির এক কোণায় কুঁকড়ে পড়ে আছে।

উত্তরের শালবনের কালোচিতা থাবা মেরে তার একটা পা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। তবু বাবা লড়াই করেছে। ওদের গোত্রের সবচাইতে সাহসী পুরুষ হচ্ছে আকার বাবা শল্লকী। কতদিন বুনো মোষ আর শম্বর মেরে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে এসেছে। ঘামে ভেজা শরীর চকচক করে। কাঁধ বেয়ে নেমে এসেছে নিহত পশুর রক্তের ধারা। যেনো এক বীরপুরুষ আসছে। ওদের এক গানে আছে:

> পাহাড় থেকে আসবে নেমে বীরপুরুষের ছেলে,
> আমরা সবাই হবো খুশি দেখতে তাকে পেলে।
> তার কাছে যে আছে জানি পাথর, লোহার ফলা,
> তাই দিয়ে সে কাটতে পারে বুনো পশুর গলা।
> বীরপুরুষের ছেলে ওগো এসো তাড়াতাড়ি,
> তোমার জন্যে নদীর তীরে বসত তৈরি করি।

কত দিন ভেবেছে আকা, ওর বাবা এক বীরপুরুষ। সেই মানুষটা এখন মাটিতে শুয়ে তীব্র যন্ত্রণায় গোঙায়। কখনো দুহাতে মাটি আঁচড়াতে থাকে। আকার মা তখন চিৎকার করে কাঁদে। কি হয়ে গেল সেই দুরন্ত মানুষটা।

ও আকা। আকারে। তুই শালবনে যা। ঐ কালোচিতাকে মেরে নিয় আয় আমার সামনে। কালাচিতার মাথা আমি ঝুলিয়ে রাখব ঘরের সামনে।

বাবা তখন সাপের মতো ফুঁসতে থাকে। কিন্তু ফণা তুলতে পারে না। কালোচিতা ফণা মুচড়ে দিয়েছে।

কোথায় গেল সেই সব দুরন্ত দিন। যখন ওরা অপেক্ষা করতো কখন শিকার নিয়ে ফিরবে দুঃসাহসী শল্লকী। শেষবিকেলের যাই যাই রোদের ভেতরে ফিরে আসত বাবা। কখনো হয়ে যেত সন্ধে। তখন পাখিরা ডানা ঝাপটে নীড়ে ফিরছে। আকার মা যব গুঁড়ো করে রান্না করত। আকা ফাঁদ পেতে ধরে আনত সিন্ধু সারসের ছানা। তাই সেদ্ধ করে রাখত। কখনো বন থেকে কুড়িয়ে আনত পাখির ডিম। সেই ডিমের হলদে কুসুমের সাথে মাটি খুঁড়ে তোলা সবজির নরম ডগা মিশিয়ে খেতে খুব স্বাদ।

কলকল করে বয়ে যাওয়া নদীর তীরে সবুজ মাঠ। সেখানেই এখন আস্তানা গেড়েছে ওদের দল। বুনো হাঁসের মতো যাযাবর ওরা। খাবার ফুরিয়ে গেলে এক ঘাসবন থেকে অন্য ঘাসবনে গিয়ে ডেরা বাঁধে।

যেখানে শস্যবীজ পাওয়া যায়, পশু, মাছ পাওয়া যায়, সেখানেই যায় ওরা। পাহাড়ের ঢালু জমির আগাছা কাটে। মাটি কুপিয়ে ঝুরুঝুরে করে। বীজ বোনে। নদীর তীরের পলিমাটি ওদের কাছে খুব প্রিয়। বানের পানিতে ভেসে আসে পলি। সেই মাটি উর্বরা। শস্যচারা সে মাটিতে লকলক করে বেড়ে ওঠে। পাকা শিষ ঝুমঝুম করে দোলে যখন তখন ওদের দলে আনন্দ ছড়িয়ে যায়। গুণীন ফিসফিস করে বলে, উত্তর আকাশের কাজল মেঘ দেখেছি আমি। এই বৃষ্টিতে ফসল বাড়বে। এবার বৃষ্টির জন্যে আর আমাদের পশু জবাই করতে হবে না। আকাশের দেবতা তুষ্ট আছেন।

গত শীতে এখানে এসেছে ওরা। ওদের দলপতি ভল্লু জায়গাটি পছন্দ করেছে। ঘন কুয়াশার ভেতর দিয়ে হেঁটে আসছিল। চোখের সামনে শাদা একটি দেয়াল ঝুলছে। বাতাস যেনো হিমের চাবুক। সেই ঝাপটায় চোখ

মুখ জ্বলতে থাকে। পশুর ভারি চামড়া গায়ে জড়িয়ে রেখেছে দলের সবাই। ভল্লের শরীর চিতাবাঘের চামড়া দিয়ে ঢাকা। পাথুরে রাস্তায় পায়ের পাতা কেটে রক্তাক্ত হয়েছে। কত দিন থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে তাদের। ডেরা বাঁধার জন্যে মনের মতো জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। শিশুরা খিদের জ্বালায় চিৎকার করে কাঁদে। ওদের সাথে আছে শুকনো নোনা মাংশ। তাই ভিজিয়ে নরম করে খায়। পথে যেতে যেতে হয়তো কোনো গাছের ডালে মৌচাক দেখা যায়। সবুজ পাতার ভেতরে ঝকঝক করছে মৌচাক। খোপে ভরা টসটসে লাল মধু। তখন মৌচাকের নিচে শুকনো ঘাসে পাথর ঘষে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সেই তাপে মৌমাছিরা যায় পালিয়ে। মৌচাক ভেঙে মধু খায় ওরা। শরীর গরম হয়ে যায়।

ভল্লকে জড়িয়ে ধরে গুণীন। গোত্রের লোকদের মঙ্গল কামনায় তারও ঘুম আসে না। কত রকমের ভয় চারদিকে। মন্ত্র পড়ে গুণীন তাদের রক্ষা করে। রোগ দেখা দিলে কালো হাঁসের রক্ত ছিটিয়ে দেয় ডেরার চারপাশে। ফসল নষ্ট হবার আগেই সাবধান করে দেয়। গুণীনের তাই খুব কদর দলের মাঝে। দুই হাতে মেলে ছুটে আসছে কাকুই বুড়ি।

ও ভল্ল, এ নদীতে মাছ আছে?

আছে। বিরাট বিরাট সব মাছ।

আমারে তাহলে বিষকাঁটা এনে দিবি? আমি মাছ ধরব।

তুই না বুড়ি আমাকে কত গালমন্দ করেছিলি। এখন দেখলি তো কেমন জায়গা।

ও ভল্লা, তুই রাগ করিস না। আমারে বিষকাঁটা এনে দে।

কাকুই বুড়ি চালশে চোখে তাকিয়ে থাকে। মাথার উপর দিয়ে তখন একঝাঁক হাঁস কক কক করে ডেকে যায়। শল্লীকী একটা বড় মাছ নদী থেকে ধরেছে। তাই দেখে কয়েকজন উল্লাসে চিৎকার করছে। শিকার ধরতে শল্লকীর জুড়ি নেই।

এ দলের লোকেরা নদীতে বিষকাঁটা ফেরে মাছ ধরে। ঝোপ থেকে ছিঁড়ে আনে এসব কাঁটার ডাল। সেগুলো ছেঁচে নদীর পানিতে ছড়িয়ে রাখে। লতার রস পানিতে মিশলে মাছেরা মরে ভেসে ওঠে। তখন খপখপ করে ওরা মাছ ধরে। সবুজ পাতায় মাছ মুড়ে আগুনের ভাঁপে সেদ্ধ করে খায়।

ভল্ল সবাইকে ডেকে জুড়ো করে। বলে, শোনো তোমরা, গুণীন বলেছে এখন আর আমাদের কোনো বিপদ নেই।

গুণীন তখন তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। দুটো বাজপাখি গোত্তা মেরে নেমে আসছে। আকার হঠাৎ মনে হলো সেদিকে তাকিয়ে গুণীন যেনো একটু চমকে উঠল। গোত্রের সবাই সাগ্রহে তাকিয়ে আছে গুণীনের দিকে। গুণীন তখন খাঁচা থেকে একটি হরিয়াল বের করে ছেড়ে দেয়। সেটা ফরফর করে ডানা মেলে উত্তরের শালবনের দিকে উড়ে যায়। গুণীনের মুখে হাসি ফোটে।

এই শালবন আমাদের পশু দেবে।

লোকেরা সে কথা শুনে আনন্দে চিৎকার করে। গুণীন তখন খাঁচা থেকে একটি ধপধপে খরগোশ বের করে। সেই খরগোশটাকে ছেড়ে দিতেই ওটা ছুটে যায় পুবের পহাড়ের দিকে।

গুণীন তখন ভরাট গলায় বলে, পুবের পাহাড়ও আমাদের খাবার জোগাবে।

শীতের থাবাকে তখন কিছুটা কাবু মনে হয়। দলের বুড়োরা এই দীর্ঘ যাত্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কাকুই বুড়ি একদিন খনখনে গলায় চিৎকার করে বলল, আর কত দূর নিয়ে যাবি? ও ভল্লা, এবার আমাদের সবাইকে কি মেরে ফেলবি নাকি? আগের সর্দাররা তো কখনো এমন করেনি।

কাকুই বুড়ির কথাকে অন্য বুড়োরা সমর্থন করে। দলের মধ্যে হইচই শুরু হয়। ছুটে আসে ভল্ল। চোখ দুটো টকটকে লাল। কানে পাখির রঙিন পালক গোঁজা। ভল্ল বলে, এই তো সামনেই আছে নদী। ভালো ঘাসজমি। অনেক পশু সেখানে।

সত্যি। অনেক পশু পাওয়া যাবে?

বুড়োদের চালশে চোখ তখন মাংশ খাওয়ার আনন্দে জ্বলজ্বল করছে। মুখের কোণা দিয়ে গড়াচ্ছে লালা। শুকনো নোনা মাংশ খেতে খেতে অরুচি ধরে গেছে। এখন খেতে ইচ্ছে করছে সদস্য নিহত পশুর রক্তমাখা তেলতেলা মাংশ। শম্বরের রোঁয়ার ভাঁজে ভাঁজে মিশে থাকে চর্বি। তার কি স্বাদ। শালপাতার আগুনে ঝলসালে স্বাদ আরো বাড়বে।

কতদিন সে রকম রক্তমাখা মাংশ দেখে না। স্বপ্নের মতো মনে হয়। কুয়াশা আরো ঘন হয়। হিমে ভিজে মরে যায় কেউ কেউ। দলের লোক কমে।

একদিন হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে ভল্ল। ঐ তো নদী। ঐ তো সেই জায়গায়।

তখন সূর্যের সোনালি আলো কুয়াশার জমাট পর্দাকে মুছে দিয়েছে। ক্লান্ত শ্রান্ত দলটির চোখের সামনে ভেসে উঠল চিকচিকে নদী। সবুজ মাঠ থকথকে ঘাসে ভরা।

আঃ নদী, নদী বলে দলের লোকজন ছুটতে লাগল সামনের দিকে। হাসিমুখে তাকিয়ে আছে ভল্ল। তার বুনো ঈগলের মতো চোখ দুটোতে আনন্দ। নিজের দলের জন্যে চমৎকার একটি জায়গার সন্ধান এবার দিতে পেরেছে সে।

একটা উঁচু পাথরের উপর উঠে দাঁড়ায় ভল্ল। লোকগুলো ঘাসজমির ভেতরে ছুটোছুটি করছে। কেউ কেউ আবার উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে নদীতে। এদের রক্ষা করার দায়িত্ব তার। উত্তরে ঘন শালবন। পুব দিকে বিশাল পাহাড়। সূর্যের আলো মুঠি মুঠি ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। গুণীন কাছে এসে বলে:

সূর্য যদি দেয় ছড়িয়ে এমন ধারা আলো,
তবে জেনো মাটির বুকে ফলবে ফসল ভালো।
নদী যদি এমনি করে কুলকুল বয়,
সুখের পাখি গাছের ডালে চুপটি বসে রয়।
পাড়ার যদি অমন করে ঠেকায় ঝড়ের গতি,
তখন বলো আমাদের আর কে করবে ক্ষতি

সারা গোত্রের লোকদের আনন্দ চিৎকারে বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। কিন্তু আকার চোখে লেগে থাকে আকাশ থেকে গোত্তা মেরে নেমে আসা বাজপাখি আর গুণীনের সেই চমকালো চেহারা।

দলপতি ভল্ল দুহাত তুলে বলতে থাকে, তোমরা তাহলে ডেরা বাঁধার কাজ শুরু কর। কাল থেকে ফসলের জমি তৈরি করব। আজ রাতে উৎসব হবে। কুরু আর শল্লকীর শিকার করা নীলগাই দিয়ে ভোজ হবে। বোংগা দেবতার জন্যে আজ রাতে কালো শম্বার বলি দেব আমরা।

লোকজন তখন ডেরা বাঁধার কাজ শুরু করেছে। একপাশে কুরু নীলগাইয়ের চামড়া ছিলে ফেলছে। কোথায় কোথায় ঘর করতে হবে গুণীন সে সব জায়গা হাতের লাঠি দিয়ে দাগ কেটে দেখিয়ে দিচ্ছে। আকার মা মাটিতে শক্ত ডাল পুঁতে খুঁটি বানিয়েছে। সেই খুঁটির উপর

পশুর শুকনো চামড়া লাগাতে থাকে। আকা ওর মাকে সাহায্য করছে। শল্লকী পাথরে লোহা ঘষছিলো।

বুঝলিরে আকা, কাল তোকে জঙ্গলে নিয়ে যাব। কেমন করে ছুটে গিয়ে বুনো মোষের পেটে ফলা ঢোকাতে হয় তা শিখিয়ে দেব।

আকার মা বলে, সাবধানে থাকবে। বুনো মোষ না আবার ছুটে এসে ওকে গেঁথে ফেলে।

হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে শল্লকী। সেই শব্দে সামনের গাছ থেকে কয়েকটা পাখি উড়ে যায়।

কিরে আকা, পারবি না বুনো মোষ ধরতে? আমার ছেলে তুই। কোন দিন শিকার না মেরে বন থেকে ফিরে আসিনি।

তখন আকার আঙুল ডগা নিশপিশ করে।

খুব পারব। মোষের শিং গুঁড়িয়ে দেব। শম্বরের গলার রগ ফলা দিয়ে এক টানে ফেলব ছিঁড়ে। তখন গলগল করে রক্ত ঝরবে।

এ সব কথা বলার সময় আকাকে কেমন বুনো দেখায়। নাকের পাশটা তিরতির করে কাঁপে। ওর মনে হয় আহত পশুকে ঝাপটে ধরে মাটির উপর ফেলতে। গরম রক্ত ছিটকে পড়বে মুখে। রক্ত তো নয় যেন লাল ফুল। আকা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে শালবনের দিকে।

কুরু তখন গাছে ঝোলান নীলগাইয়ের পেটের মাঝখানটা চিরে ফেলেছে। আকা ও বাবার কাছে এসে ফিসফিস করে বলে, আমি নীলগাই দেখেছি। শল্লকী গর্বভরা চোখে তাকিয়ে থাকে। ছেলেটার সাহস আছে। সাহস না থাকলে যে বেঁচে থাকার যায় না। যে কোনো সময় এই তরতাজা শরীরটা একতাল মাংশ হয়ে পড়ে থাকবে মাটিতে। জীবন কি নিষ্ঠুর। দুর্বল হয়ে আর বেঁচে থাকা চলে না।

সে রাতে বিরাট উৎসব। মাঠের মাঝখানে দাউদাউ করে জ্বলল আগুন। সবাই চরপাশে গোল হয়ে বসেছে। গুণীন উঠে দাঁড়ায়। তার মুখে লালচে আভা।

এখানে আসতে অনেক কষ্ট হয়েছে আমাদের। পথে মারা গেছে কয়েকজন। যারা মরেছে তাদের আত্মা এখনো মুক্তি পায়নি। সেই আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে।

রাতের হু হু বাতাসে গাছের পাতা সরসর করে। কেউ কেউ ভয় পেয়ে পেছনে তাকায়। গুণীনের চিৎকার শোনা যায়, ঐ সব আত্মার মুক্তি

দিতে হবে। একজন ঐ পাহাড়ে গিয়ে বাজপাখিকে ছিঁড়ে তার শরীর টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে আসতে হবে। আমি মন্ত্র পড়ে দিয়েছি। ঐ সব আত্মারা তাহলে মুক্তি পাবে। কে যাবে পাহাড়ে?

গুনীনের হাতে ধরা একটি বাজপাখি পালক ফুলিয়ে আছে। আকার মনে পড়ে আকাশ থেকে গোত্তা মেরে নেমে আসা বাজের কথা।

কে যাবে? আমাদের সকলের মঙ্গলর জন্যে কে যাবে?

ও পাশে থেকে উঠে দাঁড়ায় শল্লকী,

আমি যাব।

সকলে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে শল্লকীর দিকে। এতো রাতে পাহাড়ে যেতে একটুও ভয় নেই। আকা চারদিকে তাকায়। তার বাবার জন্যে গর্ব হচ্ছে। গুনীনের হাত থেকে বাজপাকি নিয়ে পাহাড়ের দিকে যায় শল্লকী। অন্ধকারে তার বিশাল শরীরটা মিলিয়ে যায়। রাতচরা পাখি ডাকে। নীলগাইয়ের মাংশ তখন ঝলসানো হচ্ছে। সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। শল্লকী ফিরে আসলে ভোজ শুরু হবে। কিন্তু শল্লকী যদি ফিরে না আসে? সকলে মাঝেই একটা অজানা আতঙ্কের অদৃশ্য স্রোত বয়ে যায়। শল্লকী না ফিরলে ওদের অমঙ্গল হবে। কাকুই বুড়ি সুর করে গাই থাকে :

বীর চলেছে দূর পাহাড়ে বীরের যে নেই ভয়,
সাহস দিয়ে করেছে সে সকল বিপদ জয়।
আকাশ দিয়ে উড়ে যাওয়া পাখি যে তার হাতে,
সেই পাখিটি টুকরো হবে কুচকুচে এই রাতে।
শীতের থাবা নিয়ে গেছে মোদের যে সব লোক,
আজকে রাতে আত্মা তাদের মুক্ত ডানা হোক।

ধারাবুড়ির গানের সাথে সবাই গলা মেলায়। ভল্ল মহুয়া কুঁড়ির রস খাচ্ছে। এক সময় পাহাড় থেকে ফিরে আসে শল্লকী। তার মুখে সাফল্যের চাপা আনন্দ। তখন শল্লকীর প্রশংসা করে সবাই চিৎকার করে।

সেই থেকে ওরা আছে এখানে নদী থেকে মাছ ধরে। ঝিনুক দিয়ে চেঁছে ফেলে মাছ।

আকা নদীতে ঝাঁপাঝাঁপি করে। বনে গিয়ে ফুলভরা গাছের ডাল দেখে। কেমন করে আলোর মতো হয়ে যায় সে সব ডাল। রোদ বৃষ্টির ভেতরে সবুজ লকলকে ঘাচারার মতো বড় হয়ে উঠছে আকা।

যে দিন বাবা চিতার থাবায় আহত হয়ে ফিরল সেদিন খুব কষ্ট হয়েছিলো আকার। কয়েকজন লোক বাবাকে কাঁধে করে নিয়ে এলো। একটা পা নেই। টপটপ করে রক্ত পড়ছে। এই বাবা কত পশুর সাথে লড়াই করেছে। কতো বুনো মোষ মেরে এনেছে পাহাড় থেকে। গাছের ডালে মরা নীলগাই ঝুলিয়ে যখন পাথরের ফলা দিয়ে চাক চাক করে মাংশ কাটত তখন দলের সাবই ঘিরে থাকত শল্লকীকে।

বুড়ো চিৎকার করে বলে, ও শল্লকী, তুমি আরো দূর পাহাড়ে যেও। সবুজ হরিণ যদি কখনো পাও। সবাই কিন্তু সবুজ হরিণ পায় না।

আমি একটা দেখেছি। ঐ পাহাড়ের পেছনে।

শল্লকীর কথা শুনে বোড়ারা অবাক হয়। সত্যি! সবুজ হরিণ দেখেছ?

দেখেছি। একদিন না একদিন ঐ হরিণ আমি শিকার করে আনবই?

সেই সবুজ হরিণ আর শিকার করা হয়নি শল্লকীর। এখন এক পা হারিয়ে কুশি পাতার ঝুপড়িতেই ঘাসের উপর শুয়ে আছে। গুণীন আহত স্থানে লতাপাতা বেটে লাগিয়ে দিয়ে গেছে। সারারাত যন্ত্রণায় ছটফট করে শল্লকী।

আকা, তোকে এখন থেকে শিকারে যেতে হবে।

যাব।

পাহাড়ের পেছনে যেতে হবে।

যাব।

কাঁটা ঝোপে লেগে শরীর যাবে চিরে।

তবু যাব।

সবুজ হরিণ মারতে হবে তোকে। সবাই ভেবেছিল আমি ওদের জন্যে সেই হরিণ মেরে আনব। কিন্তু পারলাম না।

আকা দেখে ওর বাবার চোখ পানিতে টলমল করছে। তখন আকা আরো এগিয়ে আসে। বাবাকে কখনো এমন অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকতে দেখেনি। আকাশ দিয়ে উড়ে যাওয়া সিন্ধু-সারসের ঝাঁকের দিকে তাকিয়ে উদাস হয়ে যায় আকা। শল্লকী মাটিতে শুয়ে আহত সাপের মতো গোঙায়। ঘাসের চাপড়ার ভেতরে মুখ গুঁজে দেয়। বলে, আমি পারলাম না।

আকা আবেগের ওর বাবার হাত ধরে।

আমি পারব। সবুজ হরিণ নিয়ে আসব দলের জন্যে।

সেই থেকে আকা সবুজ হরিণের খোঁজে। ভোর থেকে পাহাড়ে। সামনের ঘাসবনটা দুলতেই জায়গা হয়েছে। সরসর করে শব্দ হচ্ছে। কোনো প্রাণী আসছে বুঝি।

গতরাতে গুহার দেয়ালে পশু হত্যার ছবি এঁকেছে গুণীন। দপদপ করে মশালের শিখা জ্বলছিল। গুণীনের সামনে রঙ ভরা পাত্র। শিকারে যাবার আগে দেয়ালে পশু হত্যার ছবি আঁকতে হয়। ওদের বিশ্বাস, এতে সহজেই শিকার পাওয়া যায়।

গুণীন রঙ দিয়ে বুনো মোষের ছবি আঁকছিল।

আকা পেছনে এসে দাঁড়ায়।

একটা সবুজ হরিণের ছবি আঁকব।

গুণীন হাসলেন।

ও হরিণ যে সহজে দেখা যায় না।

যায়। আমার বাবা দেখেছে।

যারা দুরন্ত সাহসী শুধু তারাই পাবে সবুজ হরিণ।

আগুনের শিখাতে গুণীনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আকা। ওর বুকের ভেতরে যেন নদীর জোয়ারের মতো একটা কিছু ফুঁসে উঠছে।

গুণীন ফিসফিস করে বলে, বুঝলে আকা, সবুজ হরিণ হলো আমাদের জন্যে অমঙ্গল। দেখছ না আমাদের দলের কত দুঃখ। জোয়ান মানুষেরা পাহাড়ে গিয়ে যায় হারিয়ে। আর ফেরে না। রক্তবমি করে মারা গেল কত জন। আমি জানি, আরো ভয়ংকর সব বিপদ অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে।

আকার তখন মনে হয় আকশ থেকে গোত্তা মেরে নেমে আসা বাজপাখি দেখে চমকে ওঠো গুণীনের সে দিনের মুখ। তবে কি অমঙ্গলের আভাস পেয়েছিল গুণীন? দূরের গাছ থেকে পেঁচা ডেকে ওঠে।

কি বিপদ?

আমি দেখেছি ঘাস হলুদ হয়ে যেতে। এর মানে কোনো দল এগিয়ে আসছে আমাদের বিনাশ করতে।

তারা কি পশু?

না পশু না। তারা আমাদের মতো দুপেয়ে মানুষ। তুমি দেখনি আকা, এবার যব শীষে পোকা লেগেছে। দিনের বেলায় আগুনে ঘূর্ণি হাওয়া বয়। পেঁচার ঝাঁক এসে বাসা করেছে চারদিকে। এর সবই হলো অমঙ্গলের লক্ষণ।

কারা আসছে আমাদের বিনাশ করতে? কারা তারা?

জানি না। সেদিন মন্ত্র পড়ে চোখ বন্ধ করে বসেছিলাম। হঠাৎ মনে হলো ঝড়ের মতো কারা ছুটে আসছে নতুন এক প্রাণীর পিঠে বসে। হাতে বর্শা।

আকা জানে, গুণীন আগামী বিপদের কথা বলতে পারে।

সবুজ হরিণ যদি হত্যা করা যায় তবে এ অমঙ্গল দূর হবে।

শুধু সবুজ হরিণ নয়, কালো চিতাকেও হত্যা করতে হবে।

কালো চিতা। যে তার বাবার একটা পা ছিঁড়ে নিয়েছে। তার অমন দুরন্ত টগবগে বাবাকে কাবু করে দিয়েছে। আকা যেনো দেখে আকাশ থেকে গোত্তা মেরে নেমে আসছে বাজ।

সেই থেকে পাথর ঘষে ধারালো করেছে আকা। লোহা পিটিয়ে বানিয়েছে বর্শা। যখন উত্তরের বাবাতে দূরের দীঘল ঘাসবন দুলতে থাকে তখন সেদিকে তাকিয়ে থাকে আকা। কারা আসছে ছুটে নতুন প্রাণীর পিঠে বসে? ওরা তো কখনো এমন দল দেখেনি। মাঝে মাঝে ওদের দলের উপর আক্রমণ হয়েছে। তাদের মতোই দেখতে ওরা। অন্য গোত্রের মানুষ। তারা কোনো প্রাণীর পিঠে বসে আসেনি। কিন্তু গুণীন বলেছে ওরা আসছে নতুন কোনো প্রাণী পিঠে চেপে। একটা অজানা আশংকায় কেঁপে ওঠে আকা।

মাটিতে শুয়ে ছটফট করে বাবা।

ওরে আকা, আমি আর পাহাড়ে যেতে পারব না? সামনে তীব্র শীত আসছে। এখন থেকে মাংশ না জমালে তখন খাবি কি?

চোখ জ্বালা করে আকার।

কালো চিতা আমার সর্বনাশ করল।

গুণীন বলেছে, সবুজ হরিণের সাথে কালো চিতাকেও হত্যা করতে হবে।

ঘাসবন সরসর করছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় আকা। কয়েকটা ঘাসফড়িং ঝিনঝিন করে উড়ছে। হাত দিয়ে লম্বা ঘাস সরাতেই বিস্মিত হয়ে যায় আকা। একটা নতুন প্রাণী। ঘাস খাচ্ছে। চকচকে শরীর। মাঝে মাঝে পেছনে পা দুটো নাড়ছে। খয়েরি বরণ। লেজে অনেক লোম। পারে নিচে কালো মতো। ঘাস খেতে মাঝে মাঝে শরীর ঝাঁকুনি দিচ্ছে প্রাণীটা। এমন প্রাণী এর আগে কখনো দেখিনি সে। মুখ দিয়ে চিঁহি চিঁহি শব্দ

করছে। রোদ সেই প্রাণীর শরীরে পড়ে যেন পিছলে যাচ্ছে। হঠাৎ আকা দেখে একজন মানুষ এদিকে আসছে ঢালু জমি দিয়ে। চট করে গাছে আড়ালে সরে যায় সে। কি রকম সুন্দর ঐ লোকটা। তামাটে রঙ। পাতার ফাঁক দিয়ে জ্বলজ্বল করে দেখতে থাকে আকা। লোকটা তাদের মতো কালো না। লম্বা নাক। পরনে ঝলমলে পোশাক। লোকটি এসে সেই প্রাণীটর কাছে যায়। প্রাণীটি তাকে দেখে চিঁহি চিঁহি শব্দ করে। লোকটি সেই প্রাণীটির পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করতে থাকে। এটি তাহলে পোষা প্রাণী।

এত বড় প্রাণীও যে মানুষের পোষা হতে পারে তা দেখে বিস্মিত হলো আকা। লোকটি লাফ দিয়ে সেই প্রাণীর উপর উঠে বসে। ওখান থেকে নিচের নদী দেখা যায়। শিশুরা ছুটোছুটি করছে। লোকটির চোখ পড়ে সেই গ্রাম। দূর থেকে আকা দেখে তাদের গ্রামটি দেখে সেই নতুন লোকটির মুখ দিয়ে অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ করে। আকা বিস্ফারিত চোখে দেখে পেছনের মাঠ থেকে ছুটে আসছে ঐ রকম চেহারার অনেক লোক। তারা সবাই ঐ রকম প্রাণীর পিঠের উপর বসা। হাতে ধরা বল্লম। পুরো দলটি ছুটে যেতে থাকে আকাদের গ্রামের দিকে। খটখট শব্দ করে ধুলো উড়িয়ে।

আকার তখন মনে হয় গুণীনের কথা। নতুন একদল আসছে ওদের আক্রমণ করতে। বিনাশ করতে।

একটা বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকে আকা। এখান থেকে সব দেখা যাচ্ছে। আকা আতঙ্কিত চোখে দেখে কেমন করে দলটি ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের গ্রামের ওপর। আর্তচিৎকার। ছুটোছুটি। নতুন দলটি বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে মারছে সবাইকে। ছেলে-বুড়ো কেউ বাদ যাচ্ছে না। গ্রামের কেউ কেউ পালিয়ে ছুটে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নতুন দলের লোকেরা সেই প্রাণীকে নিয়েই নামে নদীতে। তারপর ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করতে থাকে। পানি নিচে ওদের মাথা ঠেসে চেপে ধরে। নদীর পানি রক্তে লাল হয়ে যায়। ঘরগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এক নিষ্ঠুর আক্রোশে ওদের গ্রামটিকে তছনছ করতে থাকে। সমস্ত মাঠ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লাশ। এমন করে হত্যা করছে ওদের? যেনো হিংস্র বাজপাখি নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে ছোট পাখির নরম বুক। ওর বাবাকে দেখে। একটা পা দিয়েই কোনোমতে ছুটে আসছে। বুনো পশুর সাথে

কতবার লড়াই করেছে। মানুষকে কেন ভয় পাবে? কিন্তু এ মানুষ যে বুনো পশুর চাইতেও ভয়ঙ্কর। ওর বাবার দুহাতে ধরা বিশাল একটি পথর। সেটা ছুঁড়ে মারে মারার আগেই অস্ত্রের এক কোপে শল্লকীর মাথাটি ঘাড় থেকে ছিটকে যায়। আর সহ্য করতে পারে না আকা। অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। কয়েকটা ঘাসফড়িং ওর মুখের উপর বিনবিন করে উড়তে থাকে।

বিকেলের রোদ যখন ফুরিয়ে যাচ্ছে তখন জ্ঞান ফিরে আসে আকার। পায়ের কাছ দিয়ে একটা গিরগিটি পালায়। ধীরে ধীরে নেমে আসে আকা। সেই দলটি চলে গেছে।

এই কি ওদের গ্রাম! একটা লোকও বেঁচে নেই। সবাইকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে। গুণীনের আগুনের পোড়া শরীর বড় গাছের নিচে। দলপতি ভল্ল ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে আছে। সবচাইতে কষ্ট হয় শিশুদের লাশ দেখলে। শকুনের পাল নেমে এসে ছিঁড়ে খাচ্ছে। রক্তের গন্ধে বন থেকে এসেছে নেকড়ের পাল।

আকাকে দেখে ওরা গর্জন করে ওঠে। একটা নেকড়ে মুখে হাড় নিয়েই ছুটে আসতে চায়। নেকড়ের চোখ জ্বলছে ধকধক। আর সামনে এগুতে সাহাস পায় না আকা। এই তো ওদের ঘরটা। ভেঙে দুমড়ে আছে। ওর মার লাশটা কই? আকুল হয়ে তাকায় আকা। বুক ঠেলে কান্না উঠে আসছে। মাগো, আমি তোর আকা। একবার আমার সামনে আয়। তোর ঘাম চিকচিক মুখটাকে দেখি।

হু হু করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। যেন কাকুই বুড়ি কাঁদছে। মাথার ভেতরটা দপদপ করছে আকার। কুরু পড়ে আছে উপুড় হয়ে। একটা শকুন ঝুপ করে নেমে এসে কুরুর পেটে ঠোকর দেয়। আকার তখন মনে হয় এই কুরু কত দিন বন থেকে রাশি রাশি ফুল নিয়ে এসেছে। গ্রামের সবাইকে ফুল দিত কুরু। পাশের গাছটা থেকে হলুদ ফুল তুলে সেটা ছুঁড়ে দেয় কুরুর রক্তমাখা শরীরের ওপর। সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। মাথার উপর দিয়ে পতপত করে উড়ে যায় কয়েকটা পেঁচা। গুণীন বলেছিল, এবার চারদিকের গাছের ডালে বসত করেছে পেঁচার ঝাঁক। হলুদমণি পাখিরা চলে গেছে উড়ে। ঘোর অমঙ্গল লাগবে। নেকড়ের দল গর্জন করছে। এখন ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে হয়ত। তারপর তাকেও ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। না, এত সহজে মরবে না আকা।

কালো চিতাকে এখনো হত্যা করা হয়নি। আর সেই হত্যাকারী দলটি কোথায় গেছে তা খুঁজে বের করতেই হবে।

দাঁতে দাঁত ঘষে আকা। একটা বল্লম তুলে নেয়। কেমন থমথম করছে চারদিক। আকা চলে যায় দূর পাহাড়ের দিকে। শল্লকীও প্রথম দিন বাজপাখি নিয়ে এমনি করে গিয়েছিল।

পায়ের নিচে শুকনো পাতা মচমচ করে। আকার মনে এখন যেন কোনো ভয় নেই। বনের ভেতরে প্রবেশ করে সে। এই বনেই তার বাবাকে আহত করেছিল কালো চিতা। জোনাকি জ্বলছে মিটমিট করে। আকা এগিয়ে যায়। সামনের গাছের ডালে চোখ পড়ে আকার। চারপাশ কেমন স্তম্ভ হয়ে আছে। গাছের পাতা একদম নড়ছে না। ও দুটো কি? পাতার ভেতরে অন্ধকারে দুটুকুরো আগুন যেন জ্বলজ্বল করছে। ওটাই তাহলে কালো চিতার চোখ। সাবধানে বল্লমটা বাগিয়ে ধরে আকা। চাপা গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ে কলো চিতা। আকা কৌশলে বল্লমটা ধরে রাখে। চিতা উড়ে এসে সেই বল্লমে গেঁথে যায়। চিৎকার করে ওঠে কালো চিতা। আকা ওর কোমরে গোঁজা কুড়ালটা টেনে বের করে তারপর অন্ধ আক্রোশে কোপাতে থাকে কারো চিতাকে।

তুই আমার বাবার পা ছিঁড়ে নিয়েছিস। আমি আজ তোকে ফালা ফালা করব। আমার বাবাকে শেষ করেছিস তুই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কালো চিতা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। চাঁদের ম্লান আলো পাতার ফাঁক দিয়ে নেমে এসেছে। রক্ত মাখামাখি হয়ে আকাকে এখন বীভৎস দেখাচ্ছে। গাছের পাতা যেন ফিসফিস করে বলে, যারা তোমাদের গ্রামের সবাইকে হত্যা করল তাদের কি করলি?

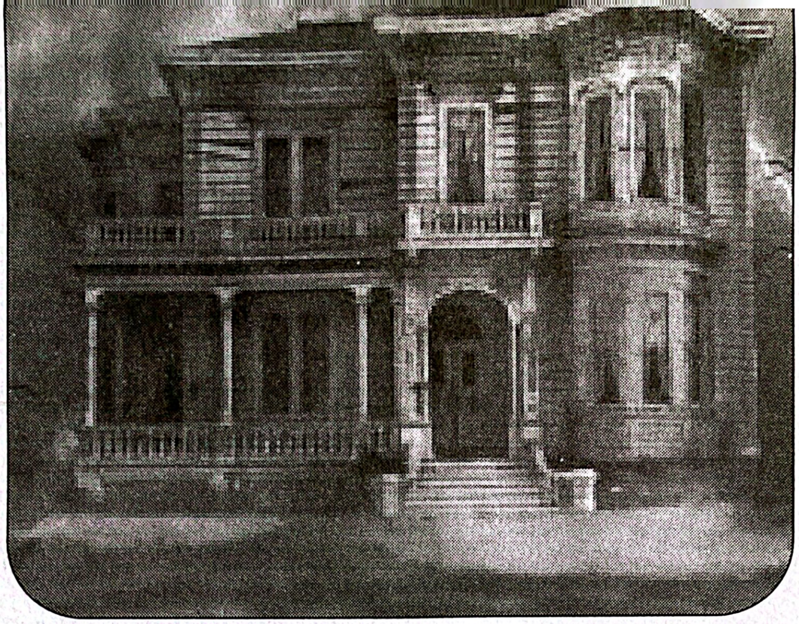
এক কালো চিতাকে শেষ করলেই কি চলবে?

ঝট করে উঠে যায় আকা। ওর মনে হয় হত্যাকারী দলটি নদী পার হয়ে গেছে। আবার ছুটতে থাকে আকা। কাঁটা ঝোপে ওর শরীর ছিলে যায়। সামনেই চিকচিক করছে নদী। আকা ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীতে। তারপর সাঁতরে ওপারে গিয়ে ওঠে। সামনে ঘাসভরা মাঠ। ছুটতে থাকে আকা। এক সময় দেখে গাছের নিচে সেই প্রাণীগুলো বাঁধা। এবার সাবধান হয়ে যায় আকা। ওরা তাহলে এখানেই আছে।

আকা প্রথমে চুপিসারে গিয়ে ঐ প্রাণীগুলোর বাঁধন খুলে দেয়। মাঠের দিকে চলে যায় প্রাণীগুলো। পা টিপেটিপে এগুতে থাকে আকা। সামনেই দীঘল ঘাসবন। ঘাস সরাতেই দেখে ভেতরের খোলা জায়গাটয় সার দিয়ে ঘুমিয়ে আছে সেই লোকগুলো। চারদিকে শুকনো ঘাসের বন দিয়ে ঘেরা। আকার চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। প্রতিশোধ নিতে হবে। দুটো পাথর ঘষে সেই ঘাসবনে আগুন ধরিয়ে দেয়। শুকনো ঘাসে আগুন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। দেখতে দেখতে আগুন চারদিকে ছড়িয়ে যায়। ভেতরের লোকগুলো আর বেরিয়ে আসতে পারে না। ঘাসবনটা খুব বড়। রাতের আকাশ লাল হয়ে গেছে। ভেতরের ঘুমন্ত লোকগুলো পুড়ে মরবে।

আকা এখন মুক্ত। আবার বনের ভেতর হাঁটতে থাকে সে। নদী পার হয়ে সাঁতরে। রাতের অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। ওই তো ওদের পোড়া গ্রাম। একটা গাছের নিচে বসে আকা। সামনেই একটা কংকাল। নেকড়ে আর শকুনের দল সব মাংশ খুবলে খেয়ে ফেলেছে। কংকালটার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে আকা। একটা পা নেই কংকালটার।

আকা তখন সেই কংকালটা জড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে থাকে, ও বাবা, বাবাগো!



নীলডুংরির আতঙ্ক

ঘুম ভাঙতেই পিকু দেখল চোখের সামনে রোদের সোনালি ফিতে ভেন্টিলেটারের ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতরে নেমে এসেছে। তার মাঝে চড়ুইদের খয়েরি পালক আলতো করে ভেসে ভেসে নামছে। চেক দেশের একটি রঙিন ছবির কথা মনে হলো। কিশোর নায়ক শীতের এক কুয়াশা মাখা নদীর পাড় দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। দূরে হাওয়া কল। একটি খামারবাড়ির গোলাঘর থেকে কয়েকটি পাখি উড়াল দিয়ে রোদের ভেতরে মিলিয়ে গেল। শুধু তাদের খসে যাওয়া কিছু নরম পালক ভাসতে লাগল। দৃশ্যটা পিকুর কাছে ভালো লেগেছিল। বহু লোক পাখি ভালোবাসে। একবার এইরকম একটি লোকের খোঁজ পেয়েছিল পিকু।

কয়েক বছর আগের কথা। তখন তার শখ বুনো পাখিদের ডিম সংগ্রহ করার। বাংলাদেশের বহু জঙ্গলে গেছে ডিম কুড়োবার জন্য। পাতার নিচে, গাছের খোঁড়লে, ঘাসের ঝোপে লুকিয়ে থাকে ডিম। সেগুলো খুঁজে খুঁজে বের করতে হয়। কাঠের বাক্সে তুলোর ভেতরে রাখতে হয় সেসব ডিম। দেখতে খুব ভালো লাগে।

আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা। পাহাড় ছুঁয়ে সাপের মতো সারিয়াডি শহর পর্যন্ত চলে গেছে রাস্তা। পিকুদের জিপটা সাঁ সাঁ করে চলছিল। ওর মেজদা চালাচ্ছেন। পিকুরা যাচ্ছে সারিয়াডির মেলা দেখতে। সন্ধেবেলায় আদিবাসীদের পাহাড়ি নাচ হবার কথা। দুপাশে ঘন জঙ্গল। হঠাৎ করে ছোট বোন টুকু বলল, দেখ দেখ, একটা লোক কী যেন করছে।

পিকু সামনে তাকিয়ে দেখে একটা মাঝ বয়েসী লোক রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে গাড়িটা থামাবার জন্য হাত তুলে আছে।

মেজদা বিরক্ত মুখে বললেন, ধুত্তরি, এ আবার কে?

গাড়িটা থামতেই সেই লোকটা ছুটে এলো। তালিমারা লম্বা একটা কোট গায়ে। মাথায় পুরনো রঙচটা একটি হ্যাট। মুখভর্তি খোঁচাখোঁচা দাড়ি। কিন্তু লোকটার চোখগুলো ভীষণ মায়াবী। টলটলে। এক্ষুনি যেন কেঁদে ফেলবে, এমনি একটা ভাব। ছুটে এসে কেমন করুণ গলায় বলল, আপনাদের কাছে স্যার রক্ত বন্ধ করার কোনো ওষুধ আছে?

রীতিমতো অবাক হবার পালা। মেজদা জিজ্ঞেস করলেন, কেন কী দরকার?

স্যার, একটা খরগোশ, মানে একটা খরগোশ খুব আঘাত পেয়েছে। অনেক রক্ত পড়েছে ওটার পা থেকে। আমি খরগোশটাকে ওখানে রেখে এসেছি স্যার। একটু ওষুধ লাগাতে পারলে হয়তো বাঁচাতে পারতাম।

পিকু অবাক হয়ে লোকটার কথা শুনছিল। পাগল নয়তো আবার। মেজদা বলল, দেখুন, আমাদের কাছে তো ও ধরনের কোনো ওষুধ নেই।

লোকটা একটু মিইয়ে গিয়ে বলল, ও, তা স্যার আপনাদের বিরক্ত করলাম। কিছু মনে করবেন না। দেখি কোনো ঘাসের রস লাগিয়ে খরগোশটার রক্ত পড়া বন্ধ করতে পারি কিনা।

বলে লোকটা ত্রস্তপদে জঙ্গলের ভেতরে মিলিয়ে গেল।

মেজদা আবার জিপ চালাতে লাগলেন। দূরে আবছা কুয়াশার মতো চোখে পড়ছে সারিয়াড়ি শহর।

রেস্ট হাউসে উঠল পিকুরা। কাঠের বারান্দা। ছোট ছোট বাক্সে নানারকম অর্কিড ঝুলছে। ধরে সরল গাছের সারি। বাতাসে সেসব গাছের শুকনো পাতা ঝরে রেস্ট হাউসের সামনের লাল কাঁকর ছাওয়া একচিলতে পথটাকে ভরে রেখেছে। সবাই হইহই করে মেলা দেখতে চলে গেল।

পিকু একলা সারিয়াড়ি শহরটা ঘুরে দেখার জন্য বের হলো। কিছুদূর যেতেই হঠাৎ দেখে সেই লোকটা বাস থেকে নামছে। হাতে দুটো বড় বড় খাঁচা। নানা রকমের পাখি ভর্তি তাতে। পিকু অবাক হয়ে দেখল, কোনো পাখিটার ডানা ভাঙা, কোনোটার পা মুচড়ে গেছে। গত রাতে ভীষণ ঝড় হয়েছিল। পাখিগুলোর এমন দশা সেই ঝড়ের জন্য হয়েছে। কিন্তু ওই আজগুবি লোকটা এসব পাখি নিয়ে কী করছে?

পিকু কেমন কৌতূহলী হয়ে তার পেছনে পথচলা শুরু করল। একজন লোক তাকে দেখে চেঁচিয়ে বলল, এই যে ঝগড়ু, এ মরা পাখিগুলোকে জঙ্গল থেকে কুড়িয়ে এনেছ নাকি?

ঝগড়ু নামের সেই লোকটা মাথার রঙচটা হ্যাটটাকে খুলে বলল, মরা পাখি মানে! সব বেঁচে আছে। দেখেছ, ঝড়ের জন্য সারারাত কী কষ্টে ছিল ওরা। আহা, এই হলুদ পাখিটার একটা ঠ্যাং বুঝি ভেঙেই গেছে।

তা যাচ্ছ কোথায়?

ওই পিলচু বুড়ির কাছে যাচ্ছি। বুড়ি পাহাড়ি লতা ছেঁচে ভারি অদ্ভুত একটা ওষুধ বানাতে পারে। ওই ওষুধ একবার লাগালেই পাখিগুলো একদম সেরে যাবে। আবার এই পাখিগুলো আকাশে উড়বে।

বলতে বলতে লোকটার চোখ দুটো চকচকিয়ে উঠল। পিকুর মনে হলো লোকটা আকাশ দেখছে। অপরাজিতার মতো নীল আকাশ। সে আকাশে অনেক পাখি ডানায় রোদ মেখে উড়ছে। সোনার কুচির মতো উড়ছে।

পাখিদের বুঝি খুব ভালোবাসে লোকটা। পিকু তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, এই যে ঝগড়ু, তোমার খরগোশটার রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে তো।

লোকটা অবাক হয়ে বলল, তা স্যার আপনি কী করে জানলেন। ও, আপনি বুঝি সেই জিপটায় ছিলেন। সেরেছে স্যার। বেচারার খুব কষ্ট হচ্ছিল। জানেন, পশুপাখিদের দুঃখ আমি আবার এক্কেবারে সইতে পারি না। ওরা তো কোনো কষ্টের কথা আমাদের বলতে পারে না।

তোমার মায়া লাগে?

লাগবে না মানে? হাজারবার লাগবে স্যার। কিন্তু কী আর বলব, মানুষের দিলও আজকাল ওদের জন্য গলে না। জানেন স্যার, আমার কেবলি মনে হয়, যুদ্ধ হলে এই জঙ্গলে বোমা পড়লে সব পশুপাখিগুলো মারা পড়বে।

কাকের ডানার মতন সন্ধে নেমেছে তখন সারিয়াডিতে। সরল গাছের পাতা ছুঁয়ে সাঁ সাঁ বাতাস বইছে। পিকু ঝগড়ু নামের সেই লোকটার মুখ দেখতে পাচ্ছিল না অন্ধকারে। শুধু তার বিষাদমাখা কণ্ঠ কানে আসছে। লোকটা যুদ্ধের কথা ভেবে ভয় পাচ্ছে। যুদ্ধে পশুপাখিরা মারা পড়বে বলে আতংকিত হচ্ছে। আশ্চর্য!

আবার চোখে কম দেখে। বেশি রাত হলে অসুবিধে হয়।

নিরিবিলি রাস্তাটা দিয়ে সামনের দিকে চলে গেল ঝগড়ু নামের লোকটা। দুহাতে খাঁচা ভর্তি আহত পাখিদের নিয়ে। ঝগড়ু নামের লোকটা অরণ্যে পড়ে থাকা পাখি দেখতে চায় আর নীল আকাশে, ঝকঝকে রোদে, উজ্জ্বল আলোর বন্যায় হারিয়ে যাওয়া পাখিদের দেখতে ভালোবাসে।

দিন কয়েক পর পিকু খবরের কাগজ পড়ছিল। পাহাড়ের ঢল নেমে আসাতে সারিয়াডির জঙ্গলে পানি নেমেছে। অনেক গাছ তলিয়ে গেছে সেই পানিতে। পিকু যেন ঢাকায় বসে দেখতে পেল সেই একহাঁটু পানির ভেতর ছপছপ শব্দ তুলে মধ্যবয়সী একটি লোক টলটলে চোখ মেলে শতচ্ছিন্ন কোটটা তুলে পাখিদের কোনো কষ্ট হচ্ছে কিনা দেখছে।

এই ধরনের লোকের কথা পিকু সহজেই ভুলতে পারে না।

পিকু বিছানায় শুয়ে শুয়ে বাগানের গাঁদা ফুলগুলো দেখছে। কী উজ্জ্বল রঙ! এই রকম অনেক কিছু তার ভালো লাগে। সেদিন বাড়ির কাজের ছেলেটা বাজার থেকে ফিরে থলিটা উপুড় করে ধরতেই ভেতর থেকে কয়েকটা পাকা টমেটো বেরিয়ে এলো। তার সাথে পাবদা মাছ। টুকটুকে লাল টমেটোর পাশাপাশি পাবদা মাছের রুপোলি চকচকে শরীর দেখতে চাকার লাগল তার কাছে। একটি রঙিন ছবির পাতা যেন। পিকুদের ড্রইং টিচার বিখ্যাত শিল্পীদের অনেক ঝলমলে ছবি দেখে বুঝিয়েছেন রঙ কী করে মানুষকে অন্য এক পৃথিবীর সন্ধান দেয়।

তিনি এক শিল্পীর কথা বলেছিলেন। ভ্যানগঁগ নাম তার। থাকতেন ফরাসি দেশে। শহরের ধোঁয়াটে পরিবেশ তার কাছে একদম ভালো লাগত না। পাঁশুটে রঙের দেয়াল। রাস্তায় তরকারির খোসা। লোকজনের গিজগিজে ভিড়। একদিন হুট করে তিনি তাই চলে গেলেন পলিনেশিয়ার এক ঘন সবুজ দ্বীপে। নাম তাহিতি। তিতিরোয়া দ্বীপের পাশে। তাহিতি। কী মিষ্টি নাম! গিটারের সুরেলা টুংটাং ধ্বনি যেন! সেই দ্বীপে অনেক ছবি আঁকলেন গগ।

গাছপালা, পাখি, শস্যক্ষেতের ছবি। উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করতেন। হলুদ রঙের জন্য ডিমের কুসুম মিশিয়ে দিতেন। ভ্যানগঁগের একটি ছবি দেখেছিল পিকু। সূর্যমুখী ফুলের ক্ষেত। রাশি রাশি সূর্যমুখী ফুল।

শীতের নরম রোদে বিছানায় শুয়ে এসব এলোমেলো ভাবতে পিকুর ভালো লাগে। টেবিলের ওপর খাসা ছড়ানো একটি কমলা। রান্নাঘর থেকে ডিম ভাজা গন্ধ আসছে। জানালার পাশে সাইকেল থামার শব্দ হয়। হকার লোকটা নিপুণ ভঙ্গিতে কাগজটা ছুঁড়ে দেয় ভেতরের দিকে। পিকুর চোখ পড়ে একটা খবরের দিকে। শিশু ডাইনোসরের সন্ধান লাভ। মঙ্গোলিয়াতে এক অভিযান চালানোর সময় মার্কিন বিজ্ঞানীরা কবুতরের মতো ছোট আকারের শিশু ডাইনোসরের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছে। সেটা এতই ছোট ছিল যে, তাদের বিশালাকার বাপমায়ের পা ফেলার সামান্যতম ভুলের জন্য বাচ্চা গুঁড়িয়ে যাবে ভয়ে তাদের খাওয়াতে পর্যন্ত পারত না।

পিকু একবার কবুতরের আকারের ডাইনোসরের মূর্তিটি মনে মনে কল্পনা করে নিলো। এ রকম ছোট ডাইনোসরের কথা আর জানা যায়নি।

পর্দা সরিযে আম্মা ঢোকেন। প্লেটে নাশতা।

কিরে, এখনও ঘুম থেকে উঠিসনি। বেলা কম হয়েছে। নীলডুংরি থেকে কাল চিঠি এসেছে। তোর মেজকাকু তোকে সেখানে যেতে লিখেছে।

নীলডুংরি। যেন অনেক দূরের কোনো শহর। নামটা শুনেই বুকের ভেতরটা কেমন ঝনঝন করে ওঠে। মনে হয় নীলডুংরি নামের শহরে অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে। কেন এমন মনে হয়, পিকু তা বলতে পারবে না। সে তক্ষুনি ঠিক করে ফেলে তাকে রাতের ট্রেনেই নীলডুংরি যেতে হবে।

ট্রেনটা ব্রিজে উঠতেই কেমন শব্দ হলো গুমগুম। ঘড়ি দেখল পিকু। রাত তিনটে। দূরে জোনাকির মতো মিটিমিটি করছে নীলডুংরি স্টেশনের আলো। খোলা জানালা দিয়ে হু হু করে বাতাস আসছে। শীতের আমেজ লাগছে বাতাসে। এতক্ষণ হাইতি দ্বীপের রহস্যময় সবুজ পাথরের মূর্তি পাচারের একটি জমজমাট কাহিনি পড়ছিল। রাতের ট্রেন জার্নিতে এ ধরনের বই পড়তে বেশ লাগে।

স্টেশনে পিকুর মেজকাকু দাঁড়িয়েছিলেন। নীলডুংরিতে কয়েক বছর ধরে রাবার চাষের চেষ্টা চলছে। বেশ কটি রাবার বাগান তৈরি করা হয়েছে এখানে। মেজকাকু তারই একটির ম্যানেজার।

মালয়েশিয়াতে চার বছর চাকরি করেছেন। ছিলেন সুলু দ্বীপে। তিনি যখন যান তখন কোনো বাঙালি এত গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেনি। দুরন্ত সাহস ছিল তার। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় সাইকেলে করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অনেকগুলো দেশ ঘুরেছিলেন। কম্বোডিয়ার গহীন অরণ্যে আছে প্রাচীন এক নগরী। নাম আঙ্কোরভাট। সেই আঙ্কোরভাটের একটি মন্দিরের সামনে সাইকেলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মেজকাকু এ রকম একটি ছবি আম্মার পুরনো অ্যালবামে দেখেছে পিকু। ছবিটা কেমন খয়েরি হয়ে এসেছে। তার সংগ্রহে সুলু দ্বীপের কয়েকটি পুরনো পুঁথি আছে। তালপাতার পুঁথি।

মেজকাকুর সাথে গল্প করতে পিকুর ভালো লাগে। পৃথিবীর যত রহস্যময় জিনিসের প্রতি তার ঝোঁক। রহস্যের ছোঁয়া লাগা যত খবর বের হয় পত্রিকায় তার কাছে সেসবের কাটিং থাকে। যত্ন করে রাখা। পিকুর খুব কৌতূহল এ তালপাতার পুঁথিগুলো সম্পর্কে। সুলু দ্বীপের মান্দিউন গ্রামের এক বৃদ্ধ মৃত্যুর সময় তাকে ওই পুঁথিগুলো দিয়েছিল। ওতে নাকি প্রাচীনকালের কয়েকটি অভিযান কাহিনি লেখা আছে। বিভিন্ন দ্বীপে যাত্রা। কেমন করে পাওয়া গেল মশলার দ্বীপের খোঁজ। এলাচ ফুল তুলতে গিয়ে দুই জাতির মাঝে কেমন করে বেঁধেছিল লড়াই সেইসব কাহিনি। মেজকাকু খুব যত্ন করে কালো ভেলভেটে মুড়ে পুঁথিগুলো রেখে দিয়েছেন। মাঝে মাঝে বর্ষার রাতে, বাইরে যখন ঝমঝম বৃষ্টি, যখন কারেন্ট চলে যায় তখন মোমবাতি জ্বালিয়ে পুঁথির কাহিনিগুলো বলতেন মেজকাকু। মোমবাতির আলোতে ঘরের সবটা অন্ধকার দূর হতো না। থোকা থোকা অন্ধকার ঝুলে থাকত। পিকুর যেন মনে হতো, কাটের আলমারির পেছনে দাঁড়িয়ে আছে মান্দিউন গ্রামের সেই বুড়ো। মেজকাকুর গল্প শুনতে শুনতে তাই সে মাঝে মাঝে আলমারির দিকে তাকাত।

ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া পাতাগুলো যেন তুলে ধরতেন মেজকাকু। প্রাচীনকালে এ দেশ থেকে কত লোক বাণিজ্য করতে গেছে মশলার দ্বীপে। ডিঙি ভেসেছে দুরন্ত সমুদ্রে। পালতোলা জাহাজ। সাথে করে নিয়ে গেছে মসলিন, কাছিমের খোল, হরিণের চামড়া। তেজপাতা, লবঙ্গ, জায়ফল আর আদা।

নীলডুংরি স্টেশনে ঘষা কাঁচের বাতিলগুলো ঘিরে পোকার দল ঝিনঝিন করছে। কাঁকরের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গেলে শব্দ হয়। একটি লোক শুকনো পাতায় আগুন জ্বালিয়ে মৃত খরগোশ ঝলসাচ্ছে। পোড়া মাংশের গন্ধ। তিনটে কুকুর ঘুরঘুর করছে। মেজকাকু বললেন, এইসব দেহাতি লোকরা এখানে কুলির কাজ করে। জঙ্গল থেকে খরগোশ ধরে খায়। বুনোগাছের এক রকম শেখড় মেশায় তাতে। আমি লাওসের কোনো কোনো পাহাড়ি গ্রামে এভাবে খরগোশ খেতে দেখেছি।

আগুনে শুকনো পাতা ছুঁড়ে দিতে দিতে লোকটি একবার তাকাল পিকুর দিকে। ঘোলাটে চোখ। এভাবে মাঝরাতে নীলডুংরির সাথে পিকুর পরিচয়।

সকালে ঘুম ভাঙল চকচকে রোদে। জানালার বাইরে পাহাড় দেখা যায়। পিকুর সেই গানটার কথা মনে হলো। আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ওই। অজস্র পাখির ডাক। বাগানের কোণায় একটা কাঠবাদামের গাছ। মেজকাকু রেডিওতে খবর শুনছেন। বাবুর্চি টেবিলে নাশতা সাজাচ্ছে। পিকু বিছানায় উপুড় হয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমার নতুন খবরের কী কী কাটিং জমল।

মেলা। বাক বাকুম পায়রা, মাথায় দিয়ে টায়রা। টায়রা পরা সাপের কথা কখনও শুনেছিস?

না তো।

মেজুকাকা দেরাজ থেকে একটা সবুজ ফাইল বের করেন। কয়েকটা পাতা উল্টে পড়তে থাকেন, খবরটা পাঠিয়েছে রয়টার। ব্যাংককের উত্তরে পিং নদীর নিকটে গ্রামে তালগাছের মতো উঁচু দুটো ভয়ংকর জীব পানির নিচে থেকে উঠে আসে। কারণ একজন জেলে তাদের কয়েকটি ডিম চুরি করেছিল।

একজন জেলে মাছ ধরতে গিয়ে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত তরমুজের আকারে বড় বড় অদ্ভুত ডিম দেখে সেগুলো নিয়ে আসে। ডিমগুলো ভাঙলে তা থেকে ভীষণ কটুগন্ধ বের হয়।

সেই রাতে গ্রামবাসী পিং নদীর থেকে কান্নার শব্দ শুনে জেগে ওঠে। নদীর তীরে গিয়ে তারা দেখে তালগাছের মতো উঁচু মাথায় টায়রা পরা দুটি সাপ নদীবক্ষ থেকে উঠে আসছে। জন্তু দুটির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গ্রামবাসীরা নদীর ধারে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে।

মেজকাকু ফাইলটি বন্ধ করেন। পিকু ভাবে স্কটল্যান্ডের এক লোকের সেই বিশাল রহস্যময় জন্তুটির কথা। পত্রিকায় যার খবর ছাপা হয়ে এক সময় তোলপাড় হয়েছিল। নরওয়ের এক দুঃসাহসী সাংবাদিক সেই লেকে গিয়ে টেলিলেন্সের সাহায্যে প্রাণীটির গলার একটি ছবি তুলেছিল। ডাইনোসরের মতো আকার।

পিকু, জলছি এসো। নাশতা রেডি।

গরম পরোটার সাথে কাজু বাদামের হালুয়া। গ্লাস ভর্তি কমলা আর মুসাম্বির রস। বাটি ভরা মোষের দই।

কমলার রসে চুমুক দিতে দিতে মেজকাকু বলেন, হংকংয়ের কোনো কোনো এলাকার লোকজন ভোরবেলায় এমনি করে প্রাণীদের তাজা রক্ত খায়।

মানে! পিকু একটু বিস্মিত। কসাইখানায় ভোরবেলাতে প্রাণীদের যখন জবাই করা হয় তখন সেখানেই টাটকা রক্ত কিনতে পাওয়া যায়।

কথাটা শুনেই শরীরটা গুলিয়ে ওঠে পিকুর। তাড়াতাড়ি টক দই খেতে থাকে।

পাহাড়ি শহর নীলডুংরি জেগে উঠছে। সামনে রাস্তার ওপাশে ছোট বাজার দেখা যায়। মেজকাকু রাবার বাগানে চলে যেতেই বাংলোবাড়িটা নিঝুম হয়ে এলো। শুধু ভেন্টিলেটারের ফাঁক দিয়ে চড়ুইদের আসা-যাওয়ার শব্দ। খড়কুটো মুখে নিয়ে ফিরছে। এখন বুঝি তাদের বাসা বোনার সময়।

পিকু দেখে টেবিলে মেজকাকুর সেই সবুজ ফাইলটা। বেশ কয়েকটি খবর। দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিভেন্স নামে একুশ বছরের এক যুবক চব্বিশটি বিষধর সাপের সাথে একটি খাঁচায় একনাগাড়ের পঞ্চাশ দিন কাটিয়ে এক রের্ড করেছে। স্টিভেন্সের সাথে খাঁচায় ছিল ছটি কালো মাম্বা, দুটি মিসরীয় গোখরা, দুটি বুম্বালং সাপ।

বুম্বালং সাপ। নতুন এক নাম জানতে পারল পিকু। ফাইলটা বন্ধ করে বারান্দায় এলো। কাঠবাদাম গাছের পাতা ঝিরঝির করছে। মেজকাকুকে বলতে হবে এবার কাজু বাদামের চাষ শুরু করার জন্য। এখানকার মাটিতে ভালো কাজু বাদাম হবে। নতুন নতুন কাজ শুরু করতে মেজকাকুর খুব উৎসাহ। কোনোমতে একবার খেপিয়ে দিলেই হলো।

বারান্দা থেকে বাগানে নেমে এলো পিকু। কয়েকটা মাঠচড়াই ঘাসের ভেতরে পোকা খুঁটছে। আপনমনে হাঁটতে হাঁটতে পেছনের বাগানে গিয়ে ফুলগাছগুলো দেখতে লাগল। বেশির ভাগ পাহাড়ি ফুল। এক কোণায় লাল টিনের একটা ঘর। ওদিকে তাকাতেই মনে হলো একটা কদাকার মুখ যেন সাঁৎ করে সরে গেল। মনে কেমন করে উঠল পিকুর। বাবুর্চিকে ডেকে জিজ্ঞেস করতেই জানাল, ও ঘরটায় মালী থাকে। কদিন থেকে তার জ্বর।

পিকু সেই ঘরের কাছে গেল। ঘরটার ভেতরে আবছা অন্ধকার। মালী একটি চাটাইতে শুয়ে আছে। তার হাতের অনেকটা অংশে দগদগে ঘা। বাবুর্চি বলল, কদিন আগে কিসের কামড় খেয়ে এই অবস্থা। মালী বিড়বিড় করছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে পিকু সেই কদাকার মুখটাকে আর দেখতে পেল না। মালীর কপালে হাত দিয়ে দেখে সাংঘাতিক জ্বর। শরীর যেন পুড়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি মালিকে মিশন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করা হলো। ডাক্তার গম্ভীর মুখে বললেন, শরীরে পচন ধরেছে। কোনো বিষাক্ত প্রাণী কামড়িয়েছে।

বিছানায় শুয়ে আছে মালী। পিকুর হঠাৎ মনে হলো সে যেন বিড়বিড় করে কী বলছে। কাছে যেতেই শুনল মালী বলছে, এই কাঠবেড়ালি, বাদাম খাবি? বাদাম?

পিকু বুঝলো মালী প্রলাপ বকছে। সেদিন সন্ধেবেলাতেই মালী মারা গেল। লাশটা ওর আত্মীয়দের কাছে দিয়ে পিকু আর মেজকাকু ফিরে আসছিল। রাস্তায় তেমন লোকজন নেই। হঠাৎ একটা আর্তচিৎকার। টর্চ জ্বালতেই দেখল একজন দেহাতী লোক মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। তার পায়ের গোড়ালির কাছে থেকে রক্ত পড়ছে ঝরঝর করে। একগোছা মাংস যেন সেখান থেকে খুবলে নিয়েছে। পিকু টর্চের একচিলতে আলোতে যেন দেখল একটা ছোট্ট প্রাণীর লেজ সাঁৎ করে সরে গেল। লোকটিকে তাড়াতাড়ি ওরা মিশন হাসপাতালে নিয়ে যায়। ডাক্তার রোগী দেখে খুব গম্ভীর। কোনো বিষাক্ত প্রাণী এ রকম আক্রমণ চালাচ্ছে নীলডুংরির বুকে।

সমস্ত শহরে সেই আতংক ছড়িয়ে যায়। আতংকের একটি শীতল স্রোত যেন চারদিকে বইতে থাকে। পরপর আরও কয়েকজন মানুষ সেই প্রাণীর থাবাতে আহত হয়। একজন জানায়, প্রাণীটি দেখতে খুব ছোট। সন্ধের পর সমস্ত নীলডুংরি শহরটা চাপা আতংকে যেন থমথম করতে থাকে।

রাতের খাবার টেবিলে মেজকাকুকে গম্ভীর দেখায়। তার বাগানের একটি কর্মচারী আহত হয়েছে। কেমন মুষড়ে আছে পিকু। শহর থেকে বেড়াতে এসেছে। কোথায় হইচই করে সময় কাটাবে। তার মাঝে এই বিপত্তি। পিকুকে একটু চাঙ্গা করার চেষ্টা করে মেজকাকু।

নতুন খবর জান?

কি?

তিন কোটি বছর আগে বানর জাতীয় এক প্রাণীর চোয়ালের ফসিল পাওয়া গেছে।

কোথায়?

মিশরের কাছাকাছি সাহারা মরুভূমির একটি অঞ্চলে। বিজ্ঞানীরা এই প্রাণীদের নাম দিয়েছেন অ্যাগিপটোপিথেকাস। সেই ফসিলের উপর ভিত্তি করে নর্থ ক্যালোরিনার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা ওই প্রাণীর একটি ছবি এঁকেছেন।

জানালা দিয়ে দেখা যায় সামনের ঝোপে জোনাক জ্বলছে।

দুদিনের মাঝে নীলডুংরির আটকজন লোক সেই রহস্যময় প্রাণীর আক্রমণে মারা গেল। ছোট্ট শহরের একটাই মিশন হাসপাতাল। সব রোগীকেই সেখানে যেতে হয়। পিকু একজন বৃদ্ধ লোককে দেখত সবসময় রোগীদের খোঁজ নিচ্ছে। কাশফুলের মতো একমাথা এলোমেলো চুল। সোনালি ফ্রেমের পুরু লেন্সের চশমা। মেজকাকু পরিচয় করিয়ে দিলেন একদিন। মি. ভাটিন্দর। একজন নামকরা প্রাণী বিজ্ঞানী। নীলডুংরির এক ধরনের দুস্প্রাপ্য পাখির উপর গবেষণা করতে ইউনেস্কোর বৃত্তি নিয়ে এসেছেন। ভদ্রলোকের বাড়ি মরিশাস। শহরের শেষ মাথায় এক ছোট্ট বাড়িতে থাকেন। পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরেছেন। কথা বলেন খুব আস্তে। চশমা খুললে চোখ দুটোকে খুব উদাস দেখায়। পিকু কৌতূহলী হয়।

মি. ভাটিন্দর, পৃথিবীতে কী ধরনের দুস্প্রাপ্য প্রাণী আছে?

অনেক আছে। মানুষ তো সব মেরে মেরে সাফ করে দিচ্ছে। সাইবেরিয়ার সিলভার ফকসয়ের কথাই ধরুন। ওদের পশম অত্যন্ত মসৃণ। রুপোলি রঙ। সারা ইউরোপ আমেরিকায় ওর পশমের খুব কদর। এক শ্রেণীর উপজাতীয় মানুষ ওদের নির্বিচারে হত্যা করেছিল। এখন আইন করে থামানো হয়েছে।

আমাদের এখানে কোন কোন প্রাণীর সন্ধান পেলেন?

সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হলো গোলডেন ক্যাটস বা সোনালি বেড়াল। এক ধরনের নিশাচর বানর নাম স্লো লরিস। ছাইরঙের নেকড়ে।

আশ্চর্য।

এক রকমের বানর আছে যাদের কোনো লেজ নেই। ওদের বলে হুওলক। খুব তাড়াতাড়ি অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। মিশমি মোনাল জাতের বন মোরগও দুস্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে।

আমার মেজকাকুর ফাইলে কাঠবেড়ালির মতো দেখতে ছোট্ট এক প্রাণীর ছবি দেখেছি। চিনচিলা নাম।

একটু যেন চমকে যায় মি. ভাটিন্দর।

আপনাদের এখানে কিন্তু চিনচিলার চাষ হতে পারে। মরিশাসে পারি-নি। এদের আদি বাস দক্ষিণ আমেরিকা। অদ্ভুত এই প্রাণীর এক একটির দাম দেড় থেকে দুহাজার ডলারের মতো। এদের ফার খুব মোলায়েম।

নামটি কেমন চিনচিলা।

চেহারা ইঁদুরের মতো। তবে কাঠবেড়ালির সাথে মিল বেশি। উজ্জ্বল কালো চোখ। লম্বা ঝাড়ওয়ালা লেজ। সামনের চেয়ে পেছনের দুটি পা লম্বা। খুব পরিছন্ন। গায়ে কোনো পোকামাকড় নেই। নাকের দুপাশে অদ্ভুত ধরনের গোঁফ। বিচিত্র ওদের কণ্ঠস্বর। কখনও বাঁশির মতো। কখনও হেঁচকি তোলার মতো শব্দ।

আপনি দেখছি অনেক জানেন।

সারা জীবন তো এই করেই কাটালাম। চিনচিলার আরও এক বৈশিষ্ট্য আছে। সারাদিন এরা ঘুমিয়ে কাটায়। যত দাপাদাপি রাতের দিকে। পথ চলে গোঁয়ের সাহায্যে। আন্দিজ পাহাড়ে এক সময় খুব দেখা যেত। পেরু, চিলি আর বলিভিয়ার উঁচু উঁচু পাহাড়ের ওপর। ওখানকার আদিবাসী ইনকারা এদের ফার দিয়ে উৎসবের পোশাকআশাক তৈরি করত।

সামনের রাস্তা দিয়ে কয়েকজন লোক ঝাঁকা ভর্তি তরকারি নিয়ে বাজারে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে মি. ভাটিন্দর বললেন, এখানকার তরকারিগুলোর স্বাদ খুব পানসে। এরা যদি অন্য সবজির সাথে মিশিয়ে সংকর জাতের কিছু তরকারি করত। রাশিয়াতে মিচুরিন নামে এক বিজ্ঞানী বিভিন্ন সংকর ফল তৈরি করেছিলেন। আমার ইচ্ছে আছে

শালগমের সাথে গাজরের মিশ্রণে নতুন এক তরকারি করার। এখানকার মাটিতে সেটা ভালো হবে।

শুধুই ফল নিয়ে গবেষণা করছেন মি. ভাটিন্দর।

মানে! আপনি কী বলতে চাইছেন?

হঠাৎ যেন উত্তেজিত হয়ে গেলেন তিনি। পিকু দেখল তার চোখ দুটো ধকধক করে জ্বলছে। যেন চিতাবাঘ। নাকের দুপাশ ফুলে উঠেছে। এই কথা শুনে মি. ভাটিন্দর এতটা রেগে যাবেন, ভাবতেই পারেনি পিকু। ভাটিন্দরের চিৎকারে হাসপাতালের অন্য লোকজন ওর দিকে তাকাচ্ছিল।

সে রাতে পিকু বিছানায় শুয়ে আছে। চোখের সামনে ভাসছে ভাটিন্দরের চোখ দুটো।

লোকটা অমন হিংস্র হয়ে উঠলো কেন?

লোকটা কী রকম অস্বাভাবিক। শংকর ফল তৈরির স্বপ্ন দেখছে। পিকুর হঠাৎ মনে পড়ল ভাটিন্দরের হাতে একটি বেতের ঝুড়ি দেখেছিল। সেখানটায় ছোট্ট একটা প্রাণীর লেজ দেখা যাচ্ছিল। পিকুর মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে। নীলডুংরির রহস্য বুঝি মিশে আছে ভাটিন্দরের মাঝে। পিকু দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। ভাটিন্দরের বাড়িতে একটা অভিযান চালাতে হবে। অনেক বইতে সে পড়েছে। এমনি করে গোয়েন্দারা অভিযান চালায়। লোকটার আচরণ রীতিমতো রহস্যজনক!

টর্চের আলো নিকষ অন্ধকারকে চিরে চিরে যাচ্ছে। মিশন স্কুলটা বাঁয়ে ফেলে ঢালু রাস্তা। ঝাউগাছের সারি। কয়েকটা ছাড়া ছাড়া বাড়ি। দুটো রাবার বাগান। তারপর ভাটিন্দরের বাড়ি। এত রাতেও সে বাড়িতে আলো জ্বলছে।

পিকু বাড়ির পেছন দিকে দিয়ে ঢুকল। কাঁটাগাছের বেড়া সরিয়ে। হাত পায়ের বেশ কিছু অংশ ছড়ে গেল। খুব সাবধানে একটা ঘরের কাছে এসে দাঁড়ায় পিকু। জানালার ফুটো দিয়ে ভেতরটা দেখা যায়। উঁকি দিতেই দেখে খাঁচা ভর্তি অনেকগুলো কাঠবেড়ালি। কিচকিচ করছে। এক কোণায় তিনটে বড় খাঁচা। তিনটার ভেতরেই নেকড়ে। পাশের ঘরটার কাছে গেল পিকু। টেবিলের সামনে ঝুঁকে কাজ করছেন ভাটিন্দর। টেবিলে একটা কাঠবেড়ালি বাঁধা। তার শরীরে ইনজেকশন করছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাঠবেড়ালিটা হিংস্র হয়ে উঠল। ঘরের কোণায় একটি

মুরগি রাখা ছিল। কাঠবেড়ালিটা মুরগির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল।

ভাটিন্দরের চোখ সেদিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল হয়ে যায়। পিকু নীলডুংরির আতংক সেই হিংস্র প্রাণীটিকে আবিষ্কার করল। সাবধানে সরে এলো ও বাড়ি থেকে।

পরদিন সকালে মেজকাকুকে নিয়ে থানায় গিয়ে সব বুঝিয়ে বলল। কিছুক্ষণের মাঝেই গ্রেফতার করা হলো মি. ভাটিন্দরকে। তার ডাইরিতেই সব লেখা ছিল। এক প্রাণীর জীবকোষকে অন্য প্রাণীর মাঝে সঞ্চারিত করে স্বভাবের কোনো পরিবর্তন হয় কিনা তা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। নেকড়ে জীবকোষ কাঠবেড়ালিকে করে তুলেছিল হিংস্র। মিশন স্কুলের বড় ডাক্তার বললেন, মি. ভাটিন্দর মানসিকভাবে সুস্থ নন।

পিকু তার গবেষণার খাতাটি দেখছিল। বহু তথ্য। পাখির ছবি। নানা রকমের স্কেচ। গবেষণাটি শেষ হলে একটি বিরাট কাজ হতো। ভাটিন্দরকে জেলা শহরের জেলে চালান দেওয়া হয়েছে।

পাহাড়ি শহর নীলডুংরির আতংক সেই প্রাণীর আর আক্রমণের খবর পাওয়া যায়নি।



কঙ্ক

বিন্না ঘাসের ঝোপের পাশ দিয়ে সাঁৎ করে চলে গেল জলডোরা সাপটা। ঝোপের ভিতরে থিকথিকে অন্ধকার। ভেজা মাটির উপর সাপের ডিমগুলো চকচক করছে। উত্তরের নদীর দিকে থেকে ভয়ার্ত ভাবে ছুটে আসছে কঙ্ক। তার সমস্ত শরীরে ঘামের স্রোত কুলকুল করে বইছে। একটি বন্য বরাহ তাকে তাড়া করছে।

কঙ্ক গিয়েছিল পাহাড়ে এলাচ ফুল তুলতে। ওদের গ্রাম থেকে মশলা বোঝাই নৌকো যাবে সুবর্ণ দ্বীপে। গ্রামের লোকজন তাই বিভিন্ন এলাকা থেকে মশলা সংগ্রহ করছিল। সুবর্ণ দ্বীপে এবার বিরাট মেলা হবে। সমতট, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, বরেন্দ্রের লোকজন আসবে।

এই পাহাড়ের পাদদেশে জঙ্গলের ভেতরে হঠাৎ করে এলাচ গাছের সন্ধান পেয়েছিল কঙ্ক। খুব চাহিদা এই সুগন্ধী দানাগুলোর। নগরীর অভিজাত লোকেরা এলাচ চূর্ণ মিশ্রিত পানীয় খেতে খুব পছন্দ করে। সাথে বুনো তিতির কিংবা ময়ূরের ঝলসান মাংশ। শিকারিরা ফাঁদ পেতে এ সব পাখি ধরে এনে বিক্রি করে।

আকাশে তখনো ফিকে অন্ধকার জমে আছে। কঙ্ক নদীর পাড় দিয়ে হেঁটে চলে এসেছে এলাচের জন্যে। শামুকের খোলে তার পা কেটে গেছে। গ্রামের অন্য লোকেরা এই গাছগুলোর সন্ধান পায়নি।

কঙ্কের মনে আনন্দ। সে যেন ভোরের ফুরফুরে বাতাসের ভেতরে পাখি হয়ে উড়ে যাচ্ছে। ধনপতি বণিক তাকে আশ্বাস দিয়েছে। প্রচুর এলাচ সংগ্রহ করতে পারলে তাকে এবার সুবর্ণ দ্বীপে নিয়ে যাবে। কত দিনের শখ তার। দুরন্ত নীল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে যাবে। মাথার উপর চক্কর দেবে গাঙচিলের দল। অভিজ্ঞ নাবিকেরা তাকে বলবে দূরের রহস্যময় দ্বীপসমূহের কথা। যেখানে শামুকের রঙের মতো বিশাল পাখি দেখা যায়। যে পাখিদের বাসায় হঠাৎ করে পাওয়া যায় নীলকান্ত মণি।

মাথার উপর লতাপাতার ঠাসবুনোট। জঙ্গলে কোনো শব্দ নেই। মাথা নিচু করে এলাচ তুলছিল কঙ্ক। হঠাৎ ডালপালা ভাঙ্গার শব্দ। চমকে তাকিয়ে দেখে দূরের ঝোপের ভেতরে একটি বন্য বরাহ তার দিকে তাকিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে। এক্ষুনি ছুটে আসবে। বরাহ আগুনের দিকে লাল চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। তাদের গ্রামের কয়েক জন নিহত হয়েছে আক্রমণে। তাদের ছেঁড়াখোঁড়া শবদেহ দেখে আতংকিত হয়েছিল সে।

কঙ্ক এলাচগুলো ফেলে ছুটতে লাগল। হিংস্র বরাহ তাকে পেলে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেলবে।

কঙ্ক বুদ্ধি করে সাপের মতো এঁকেবেঁকে ছুটতে লাগল। পেছনে হিংস্র বরাহ। নিরিবিলি জঙ্গলটা যেনো ঝনঝন করে উঠল। কয়েকটা কাঠবেড়ালী গাছের খোঁড়লে লুকিয়ে গেল।

আর ছুটতে পারছে না কঙ্ক। পা ভারি হয়ে আসছে। একটা গাছের লতায় হঠাৎ করে জড়িয়ে গেল। পেছন থেকে বরাহটা তাকে আঘাত করল। পৃথিবীটা যেন দুলে উঠল। কঙ্ক অনুভব করল তার পাঁজরের নিচে কেউ যেন হাঁড় দিয়ে তৈরি একটি ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। গলগল করে রক্তের স্রোত নামছে। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল কঙ্ক। চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে আসছে। হঠাৎ একটা আর্তচিৎকার করে বারাহটা পাশেই লুটিয়ে পড়ল। জ্ঞান হারাবার আগে মুহূর্তে কঙ্ক দেখল তীরবিদ্ধ হয়ে ছটফট করছে বরাহ। কে ছুঁড়ল তীর?

তীর ছুড়েছিল জীবক। এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। শল্যচিকিৎসক হিশেবে তার খ্যাতি বহু দেশে ছড়িয়ে গেছে। তাকে প্রায়ই জঙ্গলে আসতে হয় পশু সংগ্রহের জন্যে। বিভিন্ন জানোয়ার দেহ ব্যবচ্ছেদ করে তিনি শরীরের ভেতরের রহস্যকে আবিষ্কার করেন। আজও তিনি এসেছিলেন পশু সংগ্রহের জন্যে। একটি ঢিবির উপরে তিনি

দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ দেখলেন একটি কিশোরকে তাড়া করছে বন্য বরাহ। ছেলেটি মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। সাথে সাথে তীর ছুড়ে তিনি বরাহটিকে হত্যা করলেন।

প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে ছেলেটির। সবুজ ঘাস লাল হয়ে গেছে। জীবক তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে তুলে নিলেন। এক্ষুনি তার চিকিৎসার প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি তিনি ছুটতে লাগলেন। ছেলেটি ক্রমশ নেতিয়ে আসছে। জীবকের গেরুয়া পোশাক কঙ্কের রক্তে সপসপ করছে।

না, ছেলেটিকে বোধ হয় নগরী পর্যন্ত নেয়া যাবে না। জীবকের অভিজ্ঞ চোখ বুঝে ফেলল ছেলেটির জীবন প্রদীপ নিভে আসছে। তার চোখের সামনে একটি কিশোর এমন অসহায়ের মতো মৃত্যুবরণ করবে? যে জীবকের শল্যচিকিৎসার প্রশংসা পুঁথিতে লিপিবদ্ধ হয়ে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে গেছে। স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ যাকে করেছেন আশীর্বাদ। তার হাতের উপর করুণভাবে মৃত্যু ঘটবে এই ছেলেটির?

জীবক ছেলেটিকে একটি গাছের ছায়ায় শুইয়ে দিলেন। আকাশ তখন সোনালি রোদের ঢেউ চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। জীবক তার পেটিকা থেকে একটি ছুরি বের করলেন। ছেলেটির কোমরের কাছটা ক্ষতবিক্ষত।

জীবক খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। ঝিনঝিন করে ফড়িং উড়ছে। তার শল্যচিকিৎসার সরঞ্জাম রয়েছে গৃহে। এই নির্জন অরণ্যে তিনি কেমন করে কিশোরটির প্রাণ রক্ষা করবেন? ঘামছেন জীবক। তার বুকের ভেতরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে।

কিশোর পাঁজরের কাছের রক্তনালিগুলো ছিঁড়ে গেছে। ছেলেটিকে বাঁচাতে হলে নতুন রক্তনালি সংযোজন করতে হবে।

মাথার উপর দিয়ে একটি শকুন উড়ে গেল। বনে হরিণের নরোম মাংশের লোভে থাবা তুলে ঘুরছে হলুদ ডোরাকাটা বাঘ। এখানে পায়ে পায়ে মৃত্যু। নীরব জঙ্গলে আতংকের ছায়া। নিহত বরাহটির উপর নিশ্চয়ই ঝাঁপিয়ে পড়বে। হঠাৎ কি মনে হওয়াতে চট করে উঠে দাঁড়ালেন জীবক। ছুটে গেলেন তিনি নিহত বরাহের কাছে। তারপর নিপুণ হাতে ছুরি চালিয়ে চিরে ফেললেন প্রাণীটিকে। ধূসর চামড়ার নিচে লাল মাংশ। ফুলের পাঁপড়ি যেমন করে উন্মোচিত হয় তেমনি করে তিনি বরাহের শরীরের ভেতরের মাংশ উন্মোচন করতে লাগলেন। অভিজ্ঞ চোখের সামনে ফুটে উঠল রক্তনালীর এক বিচিত্র জগত। এখনো উষ্ণতা রয়েছে

প্রাণীটির দেহে। স্নায়ুতন্ত্রীগুলো সজীবতা হারায়নি। জীবক নিপুণ ভাবে কেটে নিলেন কিছু জটিল গন্থি। তার চোখ এখন শান্ত। কিশোরের ছিঁড়ে যাওয়া গ্রন্থিগুলোতে তিনি এই বরাহের রক্তনালির গ্রন্থি সংযোজন করবেন। কিছু হলুদমণি মাথার উপর চক্কর দিয়ে উড়ছে। গাছের পাতা নড়ছে না। জীবক সমস্ত মন ঢেলে সেই গাছের নিচে কঙ্কের আহত অংশের ছিন্ন হয়ে যাওয়া তন্ত্রীগুলোতে বরাহের তন্ত্রী সংযোজন করতে লাগলেন।

জীবককে দেখে এখন মনে হচ্ছে একজন কবির মতো। ভোরে কবিরা যেমন শুদ্ধ মন নিয়ে বাতায়ন পাশে বসে তালপাতায় লিখতে থাকে মানুষের কল্যাণের পথে এগিয়ে যাওয়ার কথা, তেমনি করে যেন ঝুঁকে শ্রম দিচ্ছেন জীবক। তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে জীবক এই ছিন্ন তন্ত্রী জোড়া লাগাচ্ছেন। শৈশবে তার পিতা তাকে কবি হতে বলেছিলেন। কবিরা মানুষের জন্য সুন্দর এবং কল্যাণময় পৃথিবীর কথা বলেন। একটি তীরবিদ্ধ তিতির তাকে শল্যচিকিৎসক হতে অনুপ্রাণিত করেছিল। তার চোখের সামনে তিতিরটি ছটফট করে মারা যায়। তিতিরের বুকের একটুখানি রক্ত জীবকের হাতে লেগেছিল। বহু দিন পর্যন্ত রক্তের সেই গন্ধ পেয়েছেন জীবক। চন্দনচূর্ণ দিয়ে ধৌত করেও সে গন্ধ দূর হয়নি।

মানুষের শরীরের ভেতরের রহস্য আবিষ্কার করেছেন জীবক। শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে কবিতা লিখলেন না। শরীরের ভেতরে কোথাও ছন্দপতন ঘটলে তাকে নিখুঁতভাবে সাজিয়ে তোলার ভার নিলেন।

সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। তন্ত্রী সংযোজন এইমাত্র শেষ করলেন জীবক ছেলেটি চোখ বুজে আছে। রক্তপাত বন্ধ হয়েছে। উত্তরের পাহাড় থেকে বাতাস আছে। বৃষ্টিভেজা বাতাস। ছেলেটির মুখ একটু একটু নড়ছে। আকুল হয়ে তাকিয়ে রইলেন জীবক। ছেলেটির মাঝে আবার সজীবতা ফিরে আসছে।

এই নিষ্পাপ ছেলেটির কল্যাণ হোক। পৃথিবীর কোনো মলিনতা যেন তাকে স্পর্শ করতে না পারে। সে যেন ভোরের শুভ্র আলোর মতো হৃদয়বান হয়। তার দ্বারা মানুষের মঙ্গল সাধিত হবে। যেমন করে আলো ফসলের চারাকে সমৃদ্ধ করে তার দ্বারা দুঃখী মানুষের উপকার হবে।

তিনি মনে মনে প্রার্থনা করলেন। ছেলেটি চোখ মেলেছে।

তুমি কে?

আমি... আমি... কঙ্ক...

কিশোরটির উত্তর শুনে জীবক স্মিত হাসলেন। মাটি রক্তে ভেজা। তার উপর দিয়ে কিছু কীটপতঙ্গ হেঁটে যাচ্ছে। জীবন কি সুন্দর!

বরাহের আক্রমণে নিহত এই ছেলেটির শবদেহকে এতোক্ষণে হয়তো বনের পশুরা ছিন্নভিন্ন করে ফেলত। এখন কঙ্ক সজীব হবে। রক্ত প্রবাহিত হবে তার শিরা উপশিরায়।

ছেলেটি নদীকে বয়ে যেতে দেখবে। পাখিকে দেখবে উড়তে। কুঁড়িকে দেখবে ফুল হতে। গাছের ছায়ায় ছায়ায় হেঁটে যাবে নিজের আশ্রয়ে।

জীবকের জীবনে অনেক দুঃখ। কাউকে সে সব দুঃখের কথা বলা যায় না। এই ছেলেটির মুখের শব্দ শুনে জীবনে সমস্ত দুঃখ ভুলে গেলেন জীবক। উজ্জ্বল আলার ভেতরে তাকে খুব পবিত্র লাগছে।

সেই ঘটনার পাঁচ বৎসর পরের কথা। সমতট অঞ্চলে এক হিংস্র ডাকাত আতংকের সৃষ্টি করে। তার নিষ্ঠুরতার কাহিনি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে গিয়েছিল। বন্য বরাহের মতো স্বভাব ছিল সেই যুবক ডাকাতের।

ইতিহাসের আতংক সৃষ্টিকারী এই যুবকের নাম কঙ্ক!



তিসিমুখির চিলের বাসা

ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, গল্পটা কোত্থেকে শুরু করব।

তকতকে সবুজ ঘাসে ছাওয়া তিসিমুখির মাঠে যখন একদিন বিকেলে গিয়ে সেই অবাক করা কথাটা শুনেছিলাম সেখান থেকে ফিরে আসার পর মাঝরাতে আমাদের বাড়িতে এসে কান্নাজুড়ে দিয়েছিলেন অন্তুর মা, অন্তুকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না বলে।

তিসিমুখির মাঠে খুব কম লোকেই যেত। শহরের একদম শেষপ্রান্তে, রেনউইক সাহেবের পোড়ো বাংলোবাড়িটা পেরিয়ে মানকচু ভরা কেমন জঙ্গুলে জায়গাটাকেও ছাড়িয়ে আরো দূরে সেই মাঠ।

সন্ধে হতেই সেখানে কেমন হু হু বাতাস বইতে থাকে। কারো চাপা কান্নার মতো। বুড়ো বটগাছটার মাথা থেকে হঠাৎ হঠাৎ করে পাখিরা ডেকে ওঠে কেমন ভুতুড়ে সুরে। লোকে বলে, তিসিমুখির মাঠে রেনউইক সাহেবের শাদা ভূত ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে।

বাড়ির সবাই আমাকে বলত, খবরদার, আর যেখানেই যাস, ওই তিসিমুখির মাঠে কিন্তু কখনো যাবি না।

তখনও কত আজগুবি কথা শুনতাম। আমাদের বাড়ির বুড়ি ঝিটা বলত কংস নদীর বুকে পুল বানাতে নাকি কচি ছেলেদের বলি দিতে হয়। তাই ছেলেধরারা ঘুরে বেড়ায় চারদিকে।

এটুকুতেই ভয় পাই আমি। একটু গা ছমছম করা ব্যাপার ঘটলেই আমার চিলেকোঠার ঘরে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। আমার কোনোদিন ইচ্ছে হয়নি তিসিমুখির মাঠে যেতে। কিন্তু অন্তু, অন্তুর পাল্লাতে পড়েই সব কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল। এলোমেলো হয়ে গেল। সে আমার কাছে এসে শুধু বলে, ভীতু ছেলে দুধ খেয়ে ঘুমোও গে।

আমি বলি, দ্যাখ অন্তু, আমাকে বেশি রাগাবি না কিন্তু।

অন্তু ভেংচি কেটে বলে, একশোবার রাগাব। হাজারবার রাগাব। আমাদের সাথে তিসিমুখির মাঠে খেলতে না গেলে বোকারাম হাঁদারাম বলব। কই আমাদের কিছু হয়? ঘরে বসে শুধু ছোট বোনের সাথে লুডু খেলা। ধুরো!

এই, ওই পাজি ছোঁড়াটার সাথে কী অত কথারে? যত্তসব গেছো ছেলেদের সাথে বুঝি তোমার দিনকে দিন ভাব হচ্ছে? ইস্টুপিড কোথাকার!

অন্তু বড়দাকে একটা ভেংচি কেটে পাঁচিল টপকে পালায়।

আমার মনে হয়, আমাদের বাসার লোকগুলো একদম ভালো না। কোথাও বেরুতে দিতে এক্কেবারেই চায় না।

একদিন স্কুল থেকে ফিরছি নিরিবিলি ক্রিট রোড দিয়ে। দেখি অন্তুত ডাঁশা পেয়ারা চিবুতে চিবুতে আসছে। ওর হাতে ধরা একটা ঝলমলে বই। কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করি, কি বইরে অন্তু?

মুখটা কুঁচকে কেমন তাচ্ছিল্যভরা হাসি হেসে ও বলে, ও তোদের মতো গুডবয়দের পড়তে নেই। যাদব চক্রবর্তীর গণিত বই খুঁজে দেখগে কোথাও পাস কিনা।

কিন্তু আমার ভীষণ ইচ্ছে ওই বইটাকে একটু দেখার জন্য।

বল না ভাই অন্তু, কী বই ওটা? তোকে না একগাদা জলছবি দেব।

ধুৎস, হাতটাকে পিছনে নিয়ে অন্তু বলে, তোর বড়দাটা বড্ড ইয়ে। একদিন দেব রাস্তায় আচ্ছা করে ঠুঁসে।

বল না ভাই, কী বই ওটা, প্লিজ!

আচ্ছা জ্বালারে দেখছি এ ছেলে, নে দ্যাখ বলে অন্তু বইসুদ্ধ হাতটা আমার চোখের সামনে তুলে ধরে।

জাফরানি রোদ্দুর তখন যাই যাই। নিরিবিলি ক্রিট রোডে ছায়া ঘন হয়ে আসছে। আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ওঠে বইটি। মিসমীদের কবচ। কী অদ্ভুত নাম! আর কী অদ্ভুত ছবি।

আমাকে ভাই বইটা পড়তে দিবি?

কভি নেহি।

মাত্তর একদিনের জন্য।

এক শর্তে দিতে পারি।

কী? আমি আগ্রহভরা গলায় জিজ্ঞেস করি।

আমাদের সাথে তিসিমুখির মাঠে যেতে হবে।

আর তখনই হঠাৎ করে চুপসে যাই আমি। চোখের সামনে ভেসে ওঠে বাড়ির সবার গম্ভীর মুখগুলো। বড়দার চোখ পাকানো।

কি ভাবছিস, যাবি?

চোখের সামনে আধো আধো অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে বইটি। মিসমীদের কবচ। আমি বলে বসি, যাব, কাল বিকেলেই যাব, বইটা দে।

এইতো কথার মতো কথা। পিঠে চাপড়ে দেয় অন্তু।

পরদিন বিকেলেই ওদের সাথে লুকিয়ে আমার তিসিমুখির মাঠে যাই। রেনউইক সাহেবের পোড়ো থমথমে বাংলোবাড়ি। মানকচুর ঘন ঝোপ পেরিয়ে, দুরুদুরু বুকে। আর সেখানেই সেই অবাক করা লোকটার সাথে দেখা। সেই অবাক করা কথা শোনা।

কেমন নিঝুম তিসিমুখির মাঠ। চারপাশ খাঁ খাঁ করছে। যেন কোথাও শব্দ নেই কারো। শুধু হু হু বাতাস। অন্তু, আমি ও পাড়ার আরো কজনা হেঁটে যাচ্ছি। অন্তুত বলল, আজ একদম ওই দূরের গাছগুলোর কাছে অব্দি যাব।

আমি বললাম, নারে, আমার কেমন জানি ভয় ভয় করছে। চল অন্তু, ফিরে যাই বেলা থাকতে।

ধ্যুস, এই দুধ খাওয়া খোকাবাবুকে নিয়ে আর পারা গেল না। কিগো খোকাবাবু, আরো বই আছে আমার কাছে-তিব্বত ফেরত তান্ত্রিক, ডাকাত কাবলীর জঙ্গলে পড়বে না ওসব? এত ভয় পেলে কী আর চলে!

বলে আমাকে প্রায় টেনে নিয়ে চলে ওরা। বিকেল তখন ফুরিয়ে আসছে। আবছা অন্ধকার পাতলা চাদরের মতো ছড়িয়ে পড়ছে মাঠজুড়ে।

আর ঠিক সেই সময়ই অন্ধকার ফুঁড়ে আমাদের সামনে সেই লম্বা লোকটা যেন কোত্থেকে এসে হাজির।

পাকানো দড়ির মতো শরীর। চোখগুলো কেমন জ্বলজ্বল করছে। আমাদের দেখেই কেমন ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলে উঠল, কি, এখন তোমরা কী করছ?

আমি তখন রীতিমতো ঘামতে শুরু করছি। আমার সমস্ত শরীরটা জবজবে হয়ে এলো। মনে হলো চারদিকের বাতাস কে যেন হঠাৎ করে শুষে নিয়েছে। পাশের পাকুড় গাছটা থেকে কয়েকটা রাতজাগা পাখি পতপত করে ডানা মেলে তাল তাল অন্ধকারের টুকরোর মতো চলে গেল। আমাদের মধ্যে অন্তুটাই যা সাহসী। ভয় পাবার বা ঘাবড়ে যাবার মতো ছেলে সে একদম নয়। আমরা কেউ অন্তুকে কোনোদিন ভয় পেতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আর আমাদের এই ছোট্ট শহরের সব্বাই অন্তুকে একডাকে বলে ডানপিটে।

সেই অন্তু, যে একবার অমাবস্যার ঘুটঘুট্টি অন্ধকারের মাঝে রেনউইক সাহেবের থমথমে বাংলোবাড়ি থেকে বাজি ধরে একটা পোড়া কাঠ তুলে এনেছিল।

সেই অন্তু জিজ্ঞেস করল, আপনি কে? আপনাকে তো কখনও এর আগে দেখিনি!

হোঃ হোঃ করে কেমন অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল সেই লোকটা।

বেশ কথা জানো দেখছি। আমি এখানে এসেছি গত পরশু। এসেছি একটা খুব জরুরি কাজে। তোমরা আমাকে বলতে পার এই তিসিমুখির মাঠে চিলের বাসা কটা হবে?

প্রশ্নটা শুনে আমার পা কাঁপতে লাগল। দেখলাম অন্তুও কেমন অবাক হয়ে গেছে ও ধরনের কথা শুনে। এমন কথা শুনলে কে না অবাক হয়।

তিসিমুখির মাঠের উত্তর-দক্ষিণে অনেকগুলো গাছে চিলের বাসা রয়েছে।

কি, বলতে পারো? অন্ধকারের ভেতর থেকে সেই ফ্যাসফ্যাসে গলাটা আমাদের কানের উপর আছড়ে পড়ল।

তা একশো, দেড়শো হবে। জবাব দেয় অন্তু।

একশো দেড়শো। তা বেশ ঝামেলা হলো দেখছি। সবগুলো যে আমাকে ভেঙে খুঁজতে হবে। কেমন যেন চিন্তিত মনে হলো লোকটাকে।

কি, কী খুঁজতে হবে আপনাকে চিলের বাসা ভেঙে?

সেই রুপোর কৌটোটা। যেটার মাঝে গড় মন্দারনের লুকানো গুপ্তধনের হদিস রয়েছে।

বটপাকুড়ের পাতাগুলো বাতাসে ছমছম শব্দ তুলে কাঁপছে। লোকটার কথা শুনে আমাদের সবার মুখই একদম হাঁ। গাঙচিলের বাসা। রুপোর কৌটো! আর তার মাঝে রয়েছে গড় মন্দারনের গুপ্তধনের হদিস!

শুনে সেই আবছা সন্ধেবেলায় তিসিমুখির মাঠের হু হু বাতাসের মাঝে বসে আমাদের মনে হলো আমরা যেন গড় মন্দারনে লুকানোর সিঁড়ি দিয়ে পাতালের দিকে নেমে চলেছি।

বলুন, আসলে কী হয়েছে?

শুনতে চাও তোমরা? শোনো তবে বলি।

তকতকে সবুজ ঘাসে ছাওয়া তিসিরমুখির মাঠে তখন ঝুপঝুপ করে বসে পড়েছি আমরা। বাড়ি যাবার কথা তখন কারো মনেই আসছে না। সেই অবাক করা লম্বা মতো লোকটাও বসে পড়ল আমাদের সামনে। আর কেমন ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলা শুরু করল এক গা শিরশির করা কাহিনি।

বুঝলে, ওই যে গড় মন্দারন রয়েছে, সেখানে আছে রাজা সূর্য সিংয়ের গুপ্তধন। কোথায় কোন স্থানে মাটির নিচে এক গুপ্তঘরে রয়েছে সেসব জিনিস, তা আঁকা ছিল এক ম্যাপে, আর সেই ম্যাপটা ছিল এক রুপোর কৌটোতে। অনেক হাত বদল হয়ে আমাদের বংশের এক পূর্বপুরুষের কাছে ছিল সেই কৌটোটা। একদিন তিনি নদীর ধারে বসেছিলেন। তার হাতে ছিল সেই কৌটো। এমন সময় একটা চিল হঠাৎ করে ছোঁ মেরে সেটা নিয়ে উড়ে গেল এই তিসিমুখির মাঠের দিকে। বুঝছ নিয়ে হয়তো তার বাসাতে রেখে দিলো। ওই এক স্বভাব দেখবে চিলেদের নানা জিনিস নিয়ে বোঝাই করেছে বাসা।

সেটা আর খোঁজা হয়নি? অন্তু জিজ্ঞেস করে।

খোঁজা হয়নি মানে! অনেকবার খোঁজা হয়েছে এরপর। কিন্তু কৌটোটা আর পাওয়া যয়নি। কতদিন কেটে গেছে! আমাদের বংশের লোকরাও এখান থেকে দূরে চলে গিয়েছে। সবাই ভুলে যেতে বসেছে ওই কৌটোর কথা। কিন্তু আমি ভুলিনি। আমাকে বারবার মনে করিয়ে দিয়েছে আমার বুড়ো মা। আমার বিশ্বাস, এই তিসিমুখির মাঠের কোনো চিলের বাসাতেই হয়তো এখনও অযত্নে পড়ে আছে সেই কৌটোটা। যার ভেতর গড় মন্দরানের লুকানো গুপ্তধনের হদিস লোকচক্ষুর আড়ালে গোটানো অবস্থায় রয়ে গিয়েছে। সেই কৌটোর জন্যই আমার এখানে আসা, বুঝলে।

অদ্ভুত মনে হচ্ছিল সমস্ত কিছুকে। বলছে কী লোকটা! অন্তু বলল, সত্যি বলছেন? আমার খুব উৎসাহ এসব ব্যাপারে। আপনি কোথায় উঠেছেন? আমি দেখা করব আপনার সাথে।

তুমি আমাকে সাহায্য করবে? লোকটা জিজ্ঞেস করল অন্তুকে।

আমার কাছে এসব কথা ভালো লাগছিল না। আমি বললাম, চল, আমরা বাড়ি ফিরে যাই।

বলে আমরা হাঁটা শুরু করলাম।

অন্তু খানিকক্ষণ সেই লোকটার সাথে দাঁড়িয়ে কী যেন বলল। তারপর দৌড়ে এসে আমাদের সাথে চলতে লাগল।

বাড়িতে এসব কথা একদম বলবিনে, বুঝলি? এসব কথা বলতে নেই। যা ভীতু না বাড়ির লোকগুলো। শুনে নির্ঘাৎ হৈচৈ শুরু করবে। চিলের বাসায় লুকানো রুপোর কৌটো! গড় মন্দারনের গুপ্তধন! বলতে বলতে অন্তুর চোখ দুটো কেমন জ্বলজ্বল করে উঠল।

তিসিমুখির মাঠে তখন ভীষণ বাতাস বইছে। সরসর করছে গাছের পাতা। কোথায় জানি একটা শুকনো বাচ্চা চাপা কান্নার মতো কঁকিয়ে কঁকিয়ে উঠল। আর আমার শরীরটা কেমন কাঁটা দিয়ে উঠল।

সেদিন মাঝরাতে আমাদের বাড়িতে এসে অন্তুর মামা কান্নাভেজা গলায় বললেন, অন্তুকে নাকি কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।

মাইল কয়েক দূরের চন্দনা স্টেশনের টিকিট বাবুর কাছে পরে জানা গিয়েছিল, সেদিন শেষরাতে লম্বামতো একটি লোক একটা ভারি বস্তা নিয়ে উত্তর দিকে চলে গিয়েছে।

ও বস্তাতে কী ছিল? আমাদের ছোট্ট শহরের সেই ডানপিটে ছেলে অন্তু! আর, আর ওই লোকটা ছিল কে?

বাড়ির চাকরানিটা যে বলে, কংস নদীর পুল এখনও তৈরি হয়নি।



সে দিন রাতে

ঝিমঝিম করছে দুপুর। চারদিকে সোনারঙের রোদ। সামনের পামগাছে বসে একটা চিল অনেকক্ষণ ধরে ডাকছে। দুপুরটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে সেই ডাকে। অনেক দূরে একটা ফেরিঅলা বিচিত্র সুরে ডেকে যাচ্ছে। আমি তখন চিলেকোঠার এক কোণায় ভাঙা ইজিচেয়ারে বসে রোমাঞ্চ লহরী সিরিজের একশ উনচল্লিশ নম্বর বই 'উড়ন্ত বিমানে দুরন্ত ডাকাতি'র ষষ্ঠ অধ্যায় রুদ্ধশ্বাসে পড়ছি। আমার এখন স্নায়ু টানটান অবস্থা।

উফ, লেখক কী ভয়ংকর দুর্দান্ত সব বর্ণনা দিয়েছেন। পড়তে পড়তে শরীরের লোমকূপের গোড়া শিরশির করছে। কয়েকটা চিংড়ি মাছ যেন শরীরের ওপর দাঁড়া নেড়ে হেঁটে যাচ্ছে। চুলের ডগা চিড়বিড় করছে। একেই বলে লোমহর্ষক লেখনী। পাঠককে বুনো ঘোড়ার মতো দাবড়ে বেড়াচ্ছে লেখক। গোয়েন্দাকে এক জব্বর ল্যাং মেরে কুপোকাৎ করে ফেলেছে দস্যু সর্দার ফান্টুরাম। যার এক চোখ কালো কাঁচে ঢাকা। জাম্বো বিমান চলেছে হাইতুরু দ্বীপের উপর দিয়ে। বুক আমার দুরুদুরু করছে। না জানি কী হয়। সাসপেন্স, রোমাঞ্চ, থ্রিল। দস্যু ফান্টুরামের প্রচণ্ড সাহস। আকাশের বুকে দারুণ একটা নাটক জমে উঠেছে। একটা ডেঁয়ো পিঁপড়ে বাঁ গোড়ালিতে কুটুস করে কামড় দিলো। আর সময় পেলো না কামড়ানো। হঠাৎ আমার মাথায় ঠকাস ঠকাস করে দুটো চাঁটি পড়ল।

ডাবলু ভাই জুলজুল করে তাকিয়ে আছে। আমি খুব রেগে যাই। আমার চোখ টকটকে লাল হয়ে যায়।

এটা কী হলো?

কোনটা?

সোজা বাংলায় চাঁটি। যা তোমার প্রাপ্য।

কেন? কেন? আমি কী একটা তবলা?

না তুমি একটা ক্যাবলা।

ডাবলু ভাই, খুব খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু। ইনসাল্ট করা আমি একদম সহ্য করতে পারি না।

আরে চাঁটি খেয়ে অত চটিস কেন?

নাহ্ দাঁত দেখিয়ে টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন হয়ে হাসব আর কি?

কি পড়ছিলি এমন বুঁদ হয়ে?

ডাবলু ভাই ছোঁ মেরে বইটা তুলে নিলেন। প্রচ্ছদে ক্যাটকেটে হলুদ রঙে দস্যু ফান্টুরামের ঘুঁষি বাগানো ছবি।

ও, এইসব ফিচকেমির বই পড়া হচ্ছে। এসব পড়ে কুংফু কারাতে শেখা হচ্ছে। পাড়ায় পাড়ায় ড্রাগন সেন্টার মার্কা ক্লাব গড়ে উঠছে। মার্শাল আর্টের চলছে পাঁয়তারা। কী যে হলো এই সমাজের! কই গেল ফাইন আর্ট। চারুকলা।

বলে নাকটা একটু কুঁচকালেন। একটা লেকচার দেয়ার পাঁয়তারা কষছেন। আমি দৃশ্যটা কল্পনা করেই আঁতকে উঠি। চোখের সামনে বিমানের ভেতর হুটোপুটি। যা সব কঠিন কঠিন বাক্য উগরে দেবেন লেকচারে। যেমন অবক্ষয়, মূল্যবোধের সংকট, আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব, অপসংস্কৃতির দাপট ইত্যাদি। শব্দগুলোর আমার কাছে জ্যামিতির উপপাদ্যের চাইতেও কঠিন। আমি কাতর গলায় মিনতি করি,

ডাবলু ভাই, আর যাই কর এখন কিন্তু বক্তৃতা দিও না প্লিজ।

আমি বইটার দিকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকি।

তোর মতো একটা বেল্লিকের কাছে মূল্যবান কথা বলতে যাব কোন দুঃখে রে? তবে একটা কথা সাফ বলে দিচ্ছি। আমি এ পাড়ার সব বখাটে আর ডেঁপোদের ভালো পথে নিয়ে আসব। এসব খুন খারাপির বই পড়ার বিরুদ্ধে ঘরে ঘরে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলব। অভিভাবকরা আমার সাথে থাকবে। এর একটাই দাওয়াই আছে।

সেটা কি?

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করি। মনে মনে ভাবছি, বিমান বোধ হয় এতক্ষণে হাইতুরু থেকে হাওয়াই চলে গেছে।

ডাবলু ভাই একটু উদাস হলেন। ঝকঝকে নীল আকাশের দিকে তাকালেন। পেঁজা মেঘ ভেসে যাচ্ছে।

বুঝলি, এখন চাই সঙ্গীতের বিকাশ। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রচার। মার্গীয় সঙ্গীতের বিস্তার।

এই রকম সব কথা শুনে আমার মাথাটা কেমন ভোঁ ভোঁ করতে থাকে।

শোন, আমি ঠিক করেছি এই পাড়ায় শিগগিরই একটা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জলসার আয়োজন করব।

কে আসবে তোমার এই জলসাতে? কে দেবে পদধূলি?

ডাবলু ভাই আমার দিকে অবাক চোখে তাকাল।

ওমা, তাও জান না ইস্টুপিড? কে আসছেন এখানে?

আমি মাথা চুলকাতে লাগলাম। ডাবলু ভাই মিটিমিটি হাসছেন।

ওস্তাদ গুল্লু খাঁ। লক্ষ্ণৌর মশহুর এক ওস্তাদ। ওই হলদে চারতলা বাড়িটার ওপরতলা অলরেডি ভাড়া নিয়েছেন। পরশু দিনই এসে পড়বেন। ওস্তাদজীর এক সাগরেদের কাছে সব খবর পেয়েছি।

বলে ডাবলু ভাই এক কানে হাত দিয়ে একটা ওস্তাদী ভঙ্গি করে হেঁড়ে গলায় ধুম তা তা না না করে ডাক ছাড়লেন। কার্নিশ থেকে হাফ ডজন কাক তখন দারুণ ভয় পেয়ে ডানা ঝাপটে পালাল।

তুমি থামো তো ডাবলু ভাই। আমার এমনিতেই হার্টের দোষ। বুক ধড়ফড় করছে।

ইস, আমি গাইলেই বুক ধড়ফড়। আর এইসব ঢুসঢাস টিসুম কাহিনিগুলো পড়লে কিছুই হয় না। এই জন্যই জাতির এই দুর্গতি। শোন, আমি কোনো বাঁধা মানব না। আমি মানি নাকো কোনো আইন...। এই বখাটেদের পাড়াটিকে আমাকে শুদ্ধ করে তুলতে হবে। এটা আমাদের দায়িত্ব।

ও।

তাই ঠিক করেছি আগামী পরশুদিনই এক জলসার আয়োজন করব। ওস্তাদ গুল্লু খাঁ এলেই তাকে সোজা জলসায় নিয়ে আসব। গলায় ফুলের মালা দেব।

চমৎকার।

ওস্তাদজী তখন বুঝতে পারবেন তিনি কেমন লাগসই এক জায়গায় তশরিফ এনেছেন।

এ পাড়ার লোকেরা শুদ্ধ সঙ্গীতের রীতিমতো সমঝদার। বল তো, আমার প্ল্যানটা কেমন?

তোফা, ডাবলু ভাই তোফা।

ব্যস, হাতে মাত্র একদিন সময়। কাল থেকেই কাজে লেগে যাও ঝটপট। পাড়ার দুর্নাম ঘোঁচাবার এটাই হলো গিয়ে মোক্ষম সময়।

পরদিন থেকে ডাবলু ভাই কয়েকজন উৎসাহী শিষ্য জুটিয়ে কাজ শুরু করলেন। প্রচণ্ড উৎসাহ তার। বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে বোঝাচ্ছেন। দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার সাঁটলেন। ওস্তাদ গুল্লু খাঁর জন্য বাছা বাছা সব বিশেষণ।

পাড়ার বুড়ো তমিজদ্দিন দেহলভী সাহেব লাহোরের একটি ছবিতে একবার তবলা বাজিয়েছিলেন। এখন শুকনো মরিচের আর মুরগির ব্যবসা করেন। ডাবলু ভাইয়ের লম্ফঝম্ফ দেখে এক টিপ নস্যি নাকে দিয়ে বললেন,

ইয়ে, আমি কিন্তু তোমাদের জলসাতে তবলা বাজাব। গুল্লু খাঁর চোখ তখন ছানাবড়া হয়ে যাবে।

সে কী দেহলভী সাহেব! আপনি তো চাইনিজ হোটেলে শুধু মুরগি সাপ্লাই দেন। তবলা বাজালেন মানে?

আরে বেয়াকুবের দল। এটা আমার আসল আদল না। তখন আমাকে চিনত বটে লাহোরের রইস আদমীরা। আমার তবলার বোলে কী বলব অনেক ওস্তাদের ঘাম ছুটে যেত।

ডাবলু ভাই আমাদের দিকে বিজয়ীর মতো তাকিয়ে বললেন,

দেখলি, দেখলি, কত প্রতিভা আমাদের এই পাহাড়ে লুকিয়ে আছে। ওদের চিনতে হলে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কে জানতো এই মুরগিঅলার এমন গুণ!

প্যান্ডেল খাটানো হয়েছে। অনুষ্ঠান শুরু হবে রাতে। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। দুপুরের দিকে হলুদ চারতলা বাড়িটির সামনে একটি গাড়ি এসে থামল। ডাবলু ভাই দূর থেকে দেখে বললেন,

আহা, ওস্তাদজী এসে গেছেন। মোচ দেখেছিস। একেবারে বড়ে গোলাম আলী খাঁর মতো। ওস্তাদজী একটু বিশ্রাম নিন। আমরা খানিকপর যাব।

কিছুক্ষণ পর আমরা ওই বাড়ির চারতলায় গিয়ে হাজির। দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লাম।

কে? কৌন?

ভেতর থেকে বাজখাঁই গলা শোনা গেল। একটা কুচকুচে কালো বেড়াল তড়াক করে পালাল। আমি ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠি। ওস্তাদজীর কণ্ঠ এমন পিলে চমকানো!

দড়াম করে দরজা খুলে গেল। বিশাল মোচ দেখা যাচ্ছে। মাথায় জড়িদার টুপি। ভদ্রলোকের হাতে একগ্লাস শরবত। ভুরভুর করে গন্ধ আসছে। বাদাম বাটা শরবত।

কি চাই? কেয়া মাংতা?

ডাবলু ভাই সাহস করে এগুলেন।

জনাব, আপনি এ পাড়াতে তশরিফ এনেছেন। এতে আমরা ধন্য হয়ে গেছি। গর্বে আমাদের বুকের ছাতি ফুলে গেছে। আজ আমাদের জন্য খুব খুশির দিন। আমরা চাই আজ আপনাদের সাথে সকলের পরিচয় করিয়ে দিতে।

জরুর। জরুর। তাহলে তো খুব ভালো হয়।

বা, ওস্তাদজী এত সহজে রাজি হয়ে যাচ্ছেন। ডাবলু ভাই একটু হেসে বললেন,

সেই জন্যই আজ রাত আটটায় আপনাকে আমরা এক সংবর্ধনা দেব। সব আয়োজন করা আছে।

তা আমাকে কী করতে হবে?

কিচ্ছু না। আপনাকে এসে ঠিক সময়ে আমরা নিয়ে যাব। অনুষ্ঠানে আপনি আপনার গুণপনা একটু দেখাবেন। সবাই তখন মুগ্ধ হয়ে যাবে।

ঠিক আছে, আমি রেডি থাকব।

প্রচুর লোক হয়েছে অনুষ্ঠানে। কয়েকজন যুবক পাংক সেজে ঘুরঘুর করছে। ডাবলু ভাই নাকটা কুঁচকে বললেন,

এরাই বুঝি বারোটা বাজাবে। আবার না মৃগী রোগীর মতো ব্রেক ড্যান্স শুরু করে দেয়।

আমরা সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠি,

কক্খনও না। অপসংস্কৃতি রুখতে হবে। ওস্তাদ গুল্লু খাঁ জিন্দাবাদ।

রাত আটটা। পাড়ার ছেলেরা ওস্তাদজীকে প্রায় চ্যাংদোলা করে নিয়ে এসেছে। ওরা গিয়ে দেখে ওস্তাদজী হালুম করে টেবিল থেকে খাবার তুলে খাচ্ছে। চারদিকে ছড়ানো মোগলাই খাবার। খোশবুতে মউ মউ করছে। আচকানে রেজালার ঝোলের দাগ। ওস্তাদজী মুরগি মোসাল্লেম দুহাতে আঁকড়ে আয়েস করে চিবুচ্ছিলেন। পাড়ার ছেলেদের চোখ ছানাবড়া। কোনো গায়ককে এভাবে কখনও খেতে দেখেনি তারা। ডাবলু ভাইয়ের মুখে বিজয়ীর হাসি। গলা কাঁপিয়ে নাকি সুরে লম্বা এক বক্তৃতা দিলেন ডাবলু ভাই।

এবার শুরু হচ্ছে ওস্তাদজীর আসর।

ডাবলু ভাই ওস্তাদজীকে টেনে স্টেজে তুললেন। চারদিকে প্রচণ্ড করতালি। ওস্তাদজী উঠেই এক হুঙ্কার ছাড়লেন–

ইসব তলবা হারমনী হটাও।

মানে?

ডাম্বল নিয়ে আসো।

ডাম্বল!

ওস্তাদজী আচকান খুলে ফেললেন। পাজামাও খুলে ফেললেন। পরনে লাল ল্যাংগোট। তেল চকচকে শরীর। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে পেশি ফোলাতে লাগলেন। শরীরের নানা কায়দা দেখাতে লাগলেন।

আও, কে আমার সাথে কুস্তি লড়বে?

আমরা হতভম্ব। ডাবলু কোনোমতে বললেন,

এসব হচ্ছে কি? থামান। আপনি গান গাইবেন না? উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত?

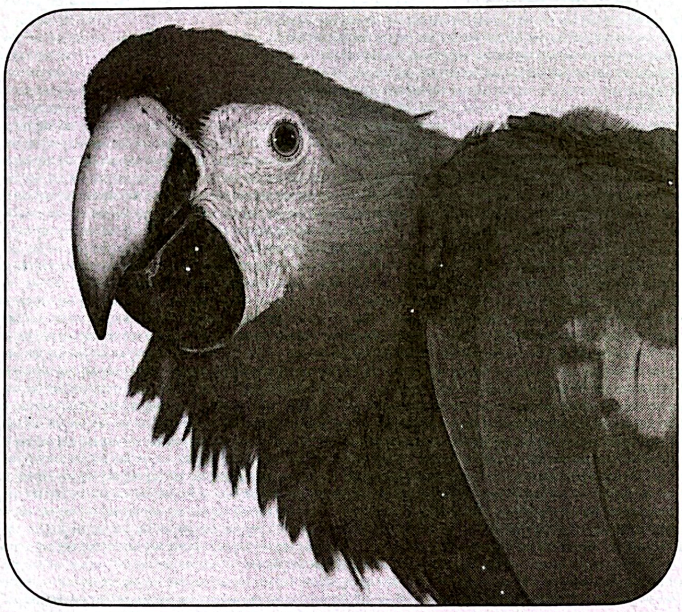
কেন? ও তো গায় গুল্লু খাঁ।

তা আপনি কে?

কাল্লু খাঁ হুংকার ছেড়ে স্টেজে লাফাতে ঝাঁপাতে লাগলেন। তাকিয়ে দেখি পাংক যুবকরা ততক্ষণে উঠে পড়েছে। তারাও শরীর কাঁপিয়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে নাচ শুরু করেছে। পচা ডিম, ভুসভুসে টমেটো দুরন্ত গতিতে ছুটে আসতে লাগল। ডাবলু ভাই শুধু একবার বললেন,

কুইক, পালা!

আমরা সবাই তখন চোঁ চোঁ দৌড় দিয়ে সামনের নালা ডিঙালাম।



শাদা কাকাতুয়া

নিজেকে অন্যদের চাইতে এখন আলাদা মনে হয় অন্তর। অনেকদিনের শখ ছিল জিনিসটার জন্য। একটি ঝকঝকে ক্যামেরা। পিন্টুর মেজকাকু বেলজিয়াম থেকে আসার সময় একটি পোলারয়েড ক্যামেরা এনে দিয়েছিল। তাই দিয়ে সট সট করে রঙিন ছবি তোলে পিন্টু। খুব দেমাক তার। ঢাকার বলদা বাগানে যেদিন সেঞ্চুরি ফুলটি ফুটল সেদিন পিন্টুকে অনুরোধ করেছিল অন্ত। ফুলটির ছবি তোলার জন্য। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে ছবিতে বন্দী করে রাখা উচিত। ব্যাপারটিকে মোটেই পাত্তা দেয়নি পিন্টু। ঠোঁট ঠেকিয়ে বলেছে, ফুঃ ওসব ফুল-টুলের ছবি তোলার কোনো ইচ্ছে নেই। কোথায় কারাতে প্রতিযোগিতা হচ্ছে বল।

তখন থেকেই মনের ভেতরে জিদ অন্তর। তার একটি ক্যামেরা চাই। তখন আর কারো কাছে অবরোধ করতে হবে না। মনের মতো ছবি তোলা যাবে। নিজের কাছে যা ভালো লাগে সেসবের ছবি। অন্তর বেশি শখ পশুপাখির ছবি তোলা। ওর দাদু বনে-জঙ্গলে ঘুরে এক সময় অনেক ছবি তুলেছে। বক্স ক্যামেরার ছবি। পুরনো দিনের বাক্সে ছবিগুলো আছে। কেমন খয়েরি রঙের। সুন্দরবনের বালুর চরে রোদ পোহাচ্ছে কুমির। কুমিরের হাঁ করা মুখের ভেতরে বসে ময়লা পরিষ্কার করছে পাখি। বুনো মহিষের ঝাঁক কাদা পানিতে শরীর ডুবিয়ে আছে। ঈগলের বাসার দিকে

উঠছে সাপ। এইসব ছবি। তখনকার দিনে অনেক কষ্ট করে ছবিগুলো তুলেছিলেন অন্তুর দাদা। কাজ করতেন বৃটিশদের চা বাগানে।

জন্মদিনে তাই আশাহি পেনটাক্স ক্যামেরাটি পেয়ে অন্তুর বুকের ভেতরে আনন্দের স্রোত কুলকুল করে বয়ে গেল। প্রথমেই ভাবল চিড়িয়াখানায় গিয়ে কিছু ছবি তুলবে। ওর এক পত্রবন্ধু আছে সিডনিতে। বাংলাদেশের পশুপাখির কিছু ছবি চেয়েছে। সিডনি থেকে পাঠিয়েছে দুষ্প্রাপ্য কালো রাজহাঁসের ছবি।

দিনটা কেমন মেঘলা। আলো কম। চিড়িয়াখানায় লোকজনের খুব ভিড় নেই। অন্তু দেখল পাখিদের খাঁচার সামনে একজন বুড়োমতো লোক দাঁড়িয়ে ছবি আঁকছে। সারস আর ধনেশ পাখির ছবি। বাঃ, চমৎকার আঁকে তো লোকটি। অন্তু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে। লোকটি আড়চোখে দেখে নেয় তাকে। তারপর আপনমনেই বলে, দেখে এসো গে, কুমির দুটো ডিম পেড়েছে। এই প্রথম এখানে কুমির ডিম পাড়ল। যাও না, ওগুলোর ছবি তোল। ছোটদের কোনো পত্রিকায় ছবিসহ খবরটা পাঠিয়ে দাও।

কাকে বলছে কথাগুলো লোকটা? আশেপাশে তাকায় অন্তু। কেউ তো কোথাও নেই। তাকেই বলছে নাকি! সামনের ডালে বসা কয়েকটা টিয়ে ডেকে উড়াল দিলো। যেন সবুজ কলাপাতার টুকরো ভাসছে বাতাসে। সারস পাখির ডানা আঁকতে আঁকতে বলল লোকটি,

তোমাকেই বলছি। ঝটপট কুমিরের ডিমের ছবি তোল। কোনো কোনো দেশে খুব কুমিরের চাষ চলছে। রীতিমতো খামার করা হয়েছে। লাভজনক ব্যবসা। কুমিরের চামড়া দিয়ে কত কী হয়।

অন্তু যেন লোকটির কথায় গল্পের গন্ধ পায়।

আপনি দাঁড়ান। আমি ডিমের ছবি তুলে আনছি। এসে কথা বলব।

ঘোলাপানিতে কুমিরটা চুপচাপ শুয়ে আছে। এক পাশে কয়েকটা মাছ। অন্তু ছবি তোলে। কী যে বলছিল লোকটা। কুমিরের নাকি চাষ হয়। ধ্যাৎ, কুমির কী হাঁস-মুরগির মতো যে চাষ হবে!

আকাশে আরো মেঘ জমেছে। ভিজে বাতাস বইছে। কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল। অন্তু দেখে ছবি আঁকার কাগজ গুটিয়ে সেই শিল্পীবুড়ো ঝুঁকে এগিয়ে আসছেন।

কি, তুললে ছবি? আগে আমি খুব ছবি তুলতাম। এখন আঁকি। পাবলাখালি বনে আর সুন্দরবনের হিরণ পয়েন্টে গিয়েছিলাম ছবি আঁকার জন্য। এই দেখো না, নতুন কিছু পশুপাখির ছবি।

বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে সেই বৃদ্ধলোক অন্তুকে কয়েকটা ছবি দেখায়। হাতির ছবি আছে অনেকগুলো।

আমি সেবার খেদা দেখতে গিয়েছিলাম পার্বত্য চট্টগ্রামে। কী করে পোষমানা হাতি দিয়ে বুনো হাতি ধরা হয়।

আপনি এত হাতির ছবি এঁকেছেন কেন?

বৃদ্ধের মুখের কোণায় হাসি দেখা যায়।

আমার এক প্রিয় সাবজেক্ট হলো হাতি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার হাতিদের নিয়ে একটা বড় প্রবন্ধ রেখার কাজ শুরু করেছি। জাভা দ্বীপে গিয়েছিলাম ম্যামথের ফসিলের ছবি তুলতে।

ম্যামথ!

হাতির পূর্বপুরুষ। ওদের খোঁজ পাওয়া নিয়ে ইন্টারেস্টিং গল্প আছে।

কী রকম?

গল্পের হদিস পেয়ে গেছে অন্তু। গাছের গোঁড়ায় বাঁধানো বেদীতে বসে পড়েন ভদ্রলোক।

বসো বসো। ঝাল বাদাম খেতে খেতে গল্প করা যাবে।

বুড়ো সেলোফেনের প্যাকেট থেকে একমুঠো বাদাম বের করে দেয়। লবণ মাখানো।

ম্যামথের কথা শুনবে? আজকালকার ছেলেমেয়েরা একদম এসব কথা শুনতে চায় না। খালি কুংফু আর কারাতে। তোমার বেশ ঝোঁক আছে দেখছি। বুঝলে, আজ থেকে আশি বছর আগে সাইবেরিয়ার বেরোজোভজা নদীর পাড় ধরে এক লোক হেঁটে যাচ্ছিল। একটি হরিণকে সে খানিক আগে তীর ছুঁড়ে আহত করেছে। ওটাকে ধরাই উদ্দেশ্য। নির্জন নদীর পাড় দিয়ে ছুটতে ছুটতে এক সময় চমকে গেল লোকটি। বিরাট এক হাতির মাথা বরফের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। মাথার নিচে বিরাট দুটি বাঁকানো দাঁত।

লোকটি টপটপ করে কিছু বাদাম মুখের ভেতর পুরে দেয়।

জায়গাটি ছিল সুমেরু বৃত্ত থেকে সোয়াশো মাইল ভেতরে। লোকটি খবর দিলো বিজ্ঞানী মহলে। খবর পাওয়া মাত্র ছুটলেন বিজ্ঞানীরা। সেই

হাতির মাথা দেখে তারা অবাক। কী বিরাট মাথা। গায়ে পুরু চামড়া। চামড়ার ওপর ভেড়ার মতো লোমের আচ্ছাদন। কত হাজার হাজার বছর ধরে তুষারের ভেতর চাপা পড়ে আছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার জন্য মাংস তখনও নষ্ট হয়নি। অবলুপ্ত সেই প্রাণীর নাম দেয়া হলো বেরোজোভজা ম্যামথ।

ঠিক সে সময় অদ্ভুত সুরে একটা পাখি ডেকে উঠল। সামনের মাঠে একটি হরিণছানা তার মায়ের শরীরের সাথে ঘেঁষে রয়েছে। অন্তু ওর দিকে বাদাম ছুঁড়ে দেয়। সন্ধে হয়ে আসছে। চিড়িয়াখানা একদম নির্জন হয়ে এসেছে। একজন কর্মচারী বালতি ভরে লাল মাংস নিয়ে যাচ্ছিল। অন্তুর মনে হলো বুড়োর দিকে তাকিয়ে কর্মচারীটি যেন মুচকি হাসল। ব্যাপারটা চোখ এড়াল না তার। বুড়ো এবার উঠে পড়েছে।

এবার যাওয়া যাক। আমি প্রায়ই আসি এখানে। আমাকে খুঁজলেই পাবে।

ছোটদের একটি পত্রিকায় কুমিরের ডিমের ছবি পাঠিয়েছিল অন্তু। চমৎকারভাবে সেটা ছাপা হলো। একদিন সেই পত্রিকার সম্পাদকের কাছ থেকে চিঠি এসে হাজির। সম্পাদক তার সাথে দেখা করতে চান।

এক বিকেলে পত্রিকার অফিসে গিয়ে সম্পাদকের সাথে দেখা করল অন্তু। উৎসাহী ভদ্রলোক। অনেকগুলো চিঠি দেখালেন। কুমিরের ডিমের ছবি ছাপা হওয়াতে বিভিন্ন এলাকা থেকে কিশোর কিশোরীরা লিখে পাঠিয়েছে। সম্পাদক এবার তাকে একটি প্রস্তাব দিলেন। পত্রিকাতে তিনি জীবজগতের বিচিত্র খবরে উপর একটি নিয়মিত বিভাগ খুলতে চান। আর বিভাগটি সম্পাদনা করতে হবে অন্তুকে। এর জন্য পারিশ্রমিক দেয়া হবে। প্রস্তাবটিতে রাজি হয়ে গেল সে। চমৎকার হবে। হারিয়ে যাওয়া বন্য প্রাণীদের কথা লিখতে হবে। ঘড়িয়াল, লজ্জাবতী বানর, বনরুই আর উড়ন্ত কাঠবেড়ালির কাহিনি। দেশ থেকে খুব তাড়াতাড়ি অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এগুলো।

এরপর কয়েকদিন লাইব্রেরিতে ঘোরাঘুরি। এনসাইক্লোপেডিয়া ঘাঁটা। পুরনো বইয়ের দোকান থেকে ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফির সেট কিনে আনা। নিজেকে একজন বিভাগীয় সম্পাদক ভাবছে অন্তু। সেই বুড়ো লোকটার সাথে দেখা করতে হবে। অনেক কিছু জানে। নতুন কিছু খবর দিতে পারবে হয়তো।

চিড়িয়াখানার কৃষ্ণচূড়া গাছগুলোকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে অন্তু। উট আনা হয়েছে একটা। ছোট ছেলেমেয়েরা তাই ভিড় করে দেখছে। ওখান দিয়ে আসার সময় শুনলো ছোট্ট একটি মেয়ে বেণী দুলিয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করছে, ভাইয়া এটাই কী মরুভূমির জাহাজ?

দূর থেকেই দেখতে পেল অন্তু। পাকুড় গাছের ডালপালার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে। সেই বুড়ো লোকটা লেকের পাশে বসে রাজহাঁসের দিকে কী যেন ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে।

ওকে দেখেই চিৎকার করে ডাকল, শোন, ওই কুমিরে ডিম ফুটে কিন্তু ছানা বেরুবে না। ডিম নষ্ট হয়ে গেছে। তুমি এই খবরটা দিয়ে দিও। এরা কী আর যত্ন করে ডিম রাখতে পারে? এমনিভাবে কত পশুপাখির যে জন্ম হচ্ছে না। পৃথিবীর আলো বাতাসের মুখ দেখতে পাচ্ছে না।

ডিম নষ্ট হয় কী করে? অন্তুর কৌতূহল।

হবে না কেন? মানুষ রোজ রোজ তার চারপাশের প্রকৃতিকে বিষিয়ে তুলছে। পরিবেশ দিচ্ছে নষ্ট করে। নদীতে ফেলছে রাসায়নিক আবর্জনা। তাই টুপ টুপ করে মাছ যাচ্ছে মরে। সেদিন একটা ছবি দেখলাম। দারুণ বিষয়বস্তু। মানুষের গুলিতে আহত ঈগল পাখির পায়ে অস্ত্রোপচার। জানো তো, ঈগল বাসা বাঁধে খুব উঁচুতে। লোকচক্ষুর আড়ালে। সেই গোপন আস্তানায় হানা দিয়ে সাহসী প্রাণিবিজ্ঞানী সংগ্রহ করেছে ডিম। গবেষণাগারে দেখা গেল বিষাক্ত কীটনাশক ভর্তি পরিবেশের জন্য ঈগলের ডিমের খোসা পাতলা হয়ে যাচ্ছে। ডিম থেকে প্রায়ই বাচ্চা হচ্ছে না।

অন্তু কথাগুলো নোট করে নেয়। আগামী সংখ্যায় ডিমের উপর লিখবে। অন্তু সাথে করে নোনতা কাজুবাদামের প্যাকেট নিয়ে গিয়েছিল। বুড়োকে কিছু খেতে দেয়।

লেকের পানিতে তখন হাঁসদের ঝুটোপুটি। তীরে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েক প্রকারের বক। লোকটা জানে বটে। সব যেন মুখস্থ। লোকটির কাছ থেকে আরো কিছু জেনে নিতে হবে। তার বিভাগটা তাহলে দারুণ জমে যাবে।

কয়েকটা পাখি উড়ে গিয়ে পানিতে ঝুপ ঝুপ করে নামে। স্নাইপ নাকি?

এই চিড়িয়াখানাতে যাযাবর পাখিদের থাকার জন্য বন্দোবস্ত করা উচিত। এই অঞ্চলের লেকগুলো ওদের খুব পছন্দ। জুন জুলাই মাস

থেকে পাখিগুলো আসা শুরু করবে। তারা বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে। আবার ডিসেম্বরের দিকে ছানাপোনা নিয়ে উধাও হয়ে যায়। মজার ব্যাপার হলো, ঠিক ঠিক পথ চিনে আসতে পারে এসব পাখি। এদের গায়ে পিচকারী দিয়ে রঙ ছিটিয়ে দেখা গেছে, পরের সিজনে রঙমাখা পাখি ঠিক একই জায়গায় ফিরে এসেছে।

হঠাৎ পেছনের দিকে ঝোপে চেঁচামেচি শোনা যায়। কে যেন বকাবকি করছে। অন্তু শোনার চেষ্টা করে। একজন গম্ভীর গলায় বলছে,

কি আশ্চর্য, খাঁচা থেকে পাখিগুলো গেল কোথায়? এরকম চুরি চলতে থাকলে তো তোমাদের কারো চাকরি থাকবে না।

অন্তু দেখে সেদিনের দেখা সেই কর্মচারীটিকে বকছেন এক কাঁচাপাকা চুলের ভদ্রলোক। বোধহয় চিড়িয়াখানার কোনো অফিসার হবেন।

বুড়োর কাছ থেকে বিদায় নিল অন্তু। চিড়িয়াখানার উপর রিপোর্ট করতে হবে। বোঝা গেল, এখান থেকে পাখি চুরি যাচ্ছে। অফিসার ভদ্রলোককে সরাসরি জিজ্ঞেস করলে কিছু বলবেন না। গোপনে খবর বের করতে হবে। অন্তু জানে, সাংবাদিকেরা অনেক সময় গোয়েন্দার মতো কাজ করে খবর বের করে।

অন্তু দেখল হাতির জন্য কলাগাছ নিয়ে যাচ্ছে একটি ছেলে। ওকে ডাক দেয়।

কি নাম তোমরা?

টুকালি।

কি কর এখানে?

জানোয়ারদের খাবার দেই।

ওই লোকটি কে?

আঙুল দিয়ে কাঁচাপাকা চুলের লোকটিকে দেখায়।

বড়সাব।

কাকে যেন একটু আগে বকাবকি করছিল?

সাবদুল মিয়ারে। সাবদুল মিয়ার কাজ খাঁচার পাখিদের খাবার দেওয়া। ওইখানে থেইকা নাকি পাখি চুরি গেছে।

অন্তু দূর থেকে দেখে বৃদ্ধশিল্পী ছবির কাগজ ঝোলাতে ভরে চলে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে টুকালি বলে,

ওই বুড়োর লগে দেহি সাবদুল মিয়ার খুব খাতির।

অন্তুর বড় ভাই এসেছে জার্মানি থেকে। তাকে দেখাল ছোটদের পত্রিকাটির কয়েকটি সংখ্যা। যেখানে সে নিয়মিত পশুপাখিদের উপর লিখছে। বড় ভাই দেখে তো মহাখুশি।

আজই তোকে সানির কাছে নিয়ে যাব। আমার বন্ধু। এখন চিড়িয়াখাতে ভালো পোস্টে আছে। গত বছর জার্মানিতে বন্যপ্রাণীর উপর এক সেমিনারে যোগ দিতে বার্লিনে গিয়েছিল। তোর যখন এত ইন্টারেস্ট। ওর কাছে মেলা সাহায্য পাবি।

দুদিন পর বড় ভাইয়ের সাথে চিড়িয়াখানায় গেল অন্তু। মি. আসলামের কোয়ার্টার চিড়িয়াখানার ভেতরেই। তারই ডাক নাম সানি। চমৎকার একটি বাড়ি। গাছপালায় ঘেরা। অন্তু দেখেই চিনতে পারে তাকে। সেই কাঁচাপাকা চুলের ভদ্রলোক।

বড় ভাইকে দেখে উচ্ছ্বসিত তিনি। ছেলেবেলার বন্ধু। গেন্ডারিয়ার ধুপখোলার মাঠে কদ্দিন ফুটবল খেলে বাড়ি ফিরেছেন। ঢাকায় একবার বন্যা হয়েছিল। রাস্তায় নৌকো। সেই সব গল্প। অন্তু জিজ্ঞেস করে,

আপনাদের এখানে কী কী রেয়ার বার্ডস আছে?

খুব বেশি নেই। কাসালং থেকে বেশ কিছু শাদা কাকাতুয়া এনেছিলাম। বিদেশে খুব চাহিদা ওদের। কিন্তু...

কিন্তু কি?

না, কিছু না।

আপনি কিছু লুকাতে চাইছেন সানি ভাই। বলুন, শাদা কাকাতুয়াগুলো চুরি গেছে?

একটু যেন চমকে উঠলেন ভদ্রলোক।

তুমি কী করে জানলে? খুব দুস্প্রাপ্য পাখি এগুলো। কিভাবে যে চুরি গেল। আমরা খবর পেয়েছি, দুস্প্রাপ্য পাখি চোরাচালানের একটি দল এদিকে সক্রিয়। ইউরোপ, আমেরিকার চিড়িয়াখানাতে খুব চাহিদা এসব পাখির। ওরা অনেক দাম দেয়। তা আজকাল এখান থেকে এসব চুরি যাচ্ছে বলে আমাদের ধারণা।

এরপর কয়েকদিন অন্তুকে খুব ব্যস্ত দেখা গেল। ছোটদের পত্রিকাটি থেকে একজন সৌখিন প্রাণিবিজ্ঞানী হিসেবে সে বৃদ্ধ শিল্পীর সাক্ষাৎকার নেয়ার কথা। প্রথমটায় একদম রাজি হয়নি বুড়ো।

দুর, আমার আবার কিসের ইন্টারভিউ! লোকে হাসবে।

অন্তু নাছোড়বান্দা।

ঠিক আছে, যাবার আগে আমি সাক্ষাৎকার দেব।

আমার মেয়ে থাকে কেনিয়া। সামনের শনিবার যাব।

মি. ইসলামকে একদিন ফোন করেছিল অন্তু। আরো কিছু শাদা কাকাতুয়া চুরি গেছে।

বৃদ্ধ শিল্পীর সাক্ষাৎকার নেবার স্থান হলো চিড়িয়াখানার লেকের ধার।

বাসাতে খুব ঝামেলা। ওখানে ঠিক মন খুলে আমি কথা বলতে পারব না। তার চাইতে এই খোলা পরিবেশে বেশ কথা বলতে পারব।

গাছের ছায়ার নিচে সবুজ ঘাসের উপর বসে অনেক কথা বললেন বৃদ্ধ শিল্পী। কিভাবে ছেলেবেলায় একটি আহত বককে সেবা করে বাঁচিয়ে তোলেন। গুলি বিঁধে বকটি ডানা ভেঙে ঝোপের ভেতর পড়েছিল। কেমন টলটলে চোখ। ধপধপে শাদা ডানায় রক্তের লাল ছিটে। তার খুব কষ্ট লেগেছিল। এই বকটিকে সুস্থ করতে হবে। তারপর থেকে পশুপাখিদের প্রতি ঝোঁক। ঝড়ের রাতে খুব ছটফট করতে থাকেন তিনি। তার মনে হয়, জঙ্গলের পাখিরা আহত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। ডানা গেছে মুচড়ে। কুষি কুষি ছানাগুলো ভিজে চুপসে গেছে। ভেঙেছে অনেক ডিম। মাটিতে থিকথিক করছে হলুদ কুসুম। ওরা আর কোনোদিন পাখি হতে পারবে না।

অন্তু এক সময় আশ্চর্য হয়ে দেখে, বৃদ্ধের চোখের কোণা কথা বলতে বলতে ভিজে গেছে।

তখন গাছের পাতা ঝিরঝির করে কাঁপিয়ে বাতাস বয়ে যায়। লেকের বুকে যাযাবর হাঁসের ছায়া। কোন দূরের মানস সরোবরের বুক থেকে এসেছে এই পাখিরা। যেখানে বিশাল পদ্মবন।

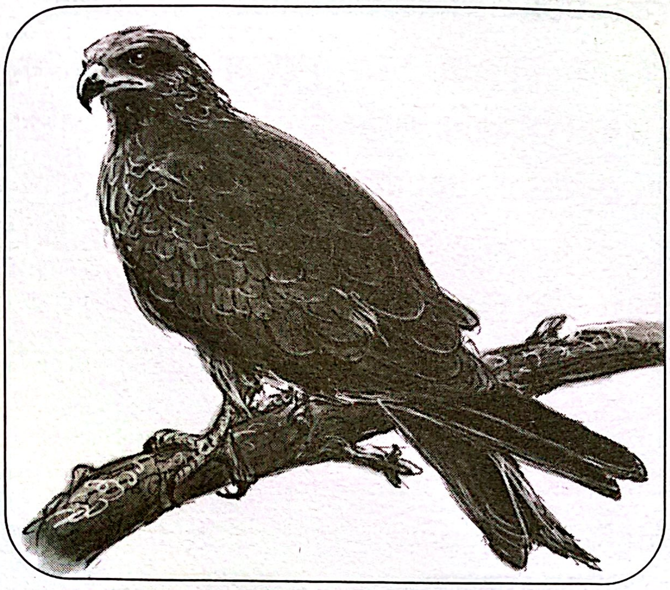
মাথার উপর দিয়ে ডানা মেলে উড়ে যায় দূরাগত পাখি। এইরকম পরিবেশে মন কেমন উদাস হয়ে যায়। বুকের ভেতরটা কেমন হু হু করে ওঠে।

শনিবার রাতের এয়ারপোর্ট। মি. ইসলাম, অন্তু কয়েকজন পুলিশসহ পুলিশ অফিসার এক কোণায় দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ পরেই সেই বৃদ্ধ শিল্পীকে দেখা গেল। সাথে একটি বড় সুটকেস। অন্তু বলল, এক্ষুনি ওকে এ্যারেস্ট করুন।

সুটকেসের ভেতরে রহস্য। সুটকেসের নিচে রয়েছে একটি খোপ। তার মাঝে পঞ্চাশটি শাদা কাকাতুয়া। ক্লোরোফর্ম দিয়ে পাখিগুলোকে অজ্ঞান করে রাখা হয়েছে।

বিদেশে এইসব দুষ্প্রাপ্য পাখি পাচারের দায়ে গ্রেফতার করা হলো বৃদ্ধ লোকটিকে। অন্তু জানায়, চিড়িয়াখানার কর্মচারী সারদুলও এর সাথে জড়িত। মর্ফিয়া ইনজেকশন দিয়ে শাদা কাকাতুয়াদের প্রথম নিস্তেজ করত সারদুল। তারপর গোপনে শিল্পীর ছবি আঁকার সরঞ্জামপূর্ণ ঝোলাতে ভরে দিত। এভাবে একটি দল এই মারাত্মক কাজের পরিকল্পনা করেছে।

ছোটদের পত্রিকাটি এবার বাংলাদেশের বিরল পশুপাখিদের উপর একটি বিশেষ সংখ্যা বের করবে। সেই সংখ্যা সম্পাদনার ভার দেয়া হয়েছে অন্তুকে।



সোনার চিল

হঠাৎ করে ঝমঝমিয়ে বিষ্টি নামল। দৌড়ে এক বারান্দায় উঠলাম। এতক্ষণে লাল রোদে তেতে ছিল সবকিছু। বিষ্টির ছাঁটে বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ল্যাম্পপোস্টে দুটো দাঁড়কাক বসে ঝিমুচ্ছে। আকাশটা কী ভীষণ কালো হয়ে গেল। লোকজন সব হুট করে কোথায় যে গেল। পুরো গলিটাকে কেমন রহস্যময় দেখাচ্ছে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল, হ্যামিলনের বংশীবাদক একটু আগে বুঝি এখান দিয়ে গেছে। আকাশটাকে মনে হচ্ছে তিমি মাছের পেট। বিদ্যুতের বল্লম যেন তার গায়ে গেঁথে যাচ্ছে। একটা ছবিতে দেখেছিলাম, দুরন্তর সমুদ্রে শাদা তিমির ছটফটানি। হারপুন উড়ে গেল সাঁৎ করে। তিমিকে টেনে তোলা হলো জাহাজে। তারপর ধারালো যন্ত্রে ওটাকে কাটা হলো। মানুষের দরকার তিমির চর্বি। বিষ্টির ছাঁটে ভিজতে ভিজতে সেই গলির এক পুরনো বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার তিমি শিকারের কথা মনে হচ্ছিল।

বিষ্টির বেগ আস্তে আস্তে বাড়ছে। সামনের দোতলা বাড়ির একটি জানালার কপাট খুলে যাচ্ছে বারবার। একটি ছোট্ট মেয়ে সেটাকে আটকাবার চেষ্টা করছে। আমি দেয়ালের দিকে ঘেঁষে রইলাম। একজন লোক পাশে জবুথবু হয়ে বসে আছে।

জানালার কাছে একজন চশমা পরা মাঝবয়েসী লোককে দেখা গেল।

ভিজে যাবেন, ঘরে এসে বসুন।

আমি ইতিউতি তাকিয়ে ঘরে ঢুকলাম। পুরানো ঘর। দেয়ালে হরিণের শিং। একটা মেহগনি কাঠের বিশাল পালং একপাশে। আজকাল এ ধরনের পালং দেখতে পাওয়া যায় না। আমি ওটাকে লক্ষ্য করছিলাম। কালো কাঠের বুকে চমৎকার সাপ, ফুল আর পাখির নকশা। সাপ আর পাখির চোখে লাল পুঁতি বসানো। আবছা অন্ধকারে ঝকঝক করছে।

কোত্থেকে কিনলেন এ পালং? আমি আর কৌতূহল দমিয়ে রাখতে পারলাম না।

চিতিডোরা গ্রামের জোতদারের বাড়ি থেকে। নদীর ওপারে গ্রাম। জোতদারের বিরাট খামার আছে। সেখানে অনেক পুরনো জিনিশপত্র নিলামে বিক্রি হয়েছে কিছুদিন আগে। কাচের বাসনের বিরাট সেট ছিল।

আমার চোখের সামনে একটা পুরানো বাড়ি যেন ভেসে উঠল। অশ্বত্থের কচি চারা কার্নিশে ঝিরঝির করে দুলছে। দেয়ালের কোণে সাপের খোলস। ঘর ভর্তি পুরানো আমলের জিনিশ গদাগাদি করে রাখা। নিলাম হচ্ছে।

কদ্দূর হবে গ্রামটা?

মাইল বারো তেরো হবে। খাল গেছে পাশ দিয়ে। নৌকোয় যেতে পারবেন।

গেলে কী পাব?

সবকিছুই বিক্রি হয়ে গেছে। তবু গিয়ে দেখেন। দেখেছিলাম এক আলমারি বইপত্র আছে।

আমি ভেতরে ভেতরে উৎসাহিত হয়ে উঠি। পুরানো বইপত্রের প্রতি আমার খুব ঝোঁক। অনেক দিন সদরঘাটের ফুটপাতে উবু হয়ে বসে ছেঁড়া চটের উপর বই খুঁজেছি।

কদিন পর এক ডিঙি নৌকো করে চিতিডোরা গ্রামের দিকে রওয়ানা দেই। দুপাশে ধানী জমি। ছোট ছোট কুঁড়েঘর। কলাবাগানে পাতার ফাঁকে দাঁড়িয়ে আছে ডুরে শাড়ি পরা গ্রামের মেয়ে। কাশবনের ডগা কাঁপিয়ে ধান কইরি পাখি মাঝে মাঝে উড়াল দিচ্ছে। আকাশ কী নীল। আমি ছইয়ের ভেতর শুয়ে থাকি। ছিপছিপে সুপুরি গাছের সারি চলে গেছে একটানা।

দুপুরের দিকে বেশ খিদে পায়। আমি কিছু কলা কিনেছিলাম। মাঝি বলে সাব, ভাত খাবেন? সামনের হাটে কদম বেপারীর দোকান। ভালো তরকারি পাওয়া যায়।

একটা বিরাট কড়ুই গাছের ছায়ায় কদম বেপারীর ছাপড়া। কয়েকটা বেঞ্চি। গরম লাল চালের ফেনা ফেনা ভাত। সাথে পাঙ্গাশ মাছ। দগদগে লাল ঝোল। কচি বেগুন দিয়ে রান্না। খেতে বেশ লাগে।

আবার তরতরিয়ে চলে নৌকো। একটা ছোট ছেলে পাট ক্ষেত থেকে বেরিয়ে ছুটতে থাকে। একটা বুড়ি কয়েকটা হাঁসকে তাড়া করে নিয়ে যায়।

হুই যে চিতিডোরা গাঁও। মাঝি আঙুল দিয়ে দেখায়। সন্ধের আবছা অন্ধকারে গ্রামটিকে কালচে দেখায়। কিছু খড়ের ঘর থেকে রান্নার ধোঁয়া উঠছে। জোতদার বাড়ির ঘাটে এসে নৌকো থামে।

বাড়িটা বেশ পুরানো। শনঘাসের জঙ্গল পেছনে। সরদসর করছে। একটা মানুষ সমান উঁচু সেই জঙ্গল। ঝুরঝুরে হয়ে গেছে বাড়িটা। গেটে বকুল গাছের নিচে মার্বেল পাথরের ভাঙা মূর্তি।

কোণের ঘরটায় টিমটিমে আলো জ্বলছে। আমাকে দেখেই ফর্সা এক বৃদ্ধ বেরিয়ে আসে। তোবড়ানো গাল। লোকটার চোখে এক ধরনের নির্বিকার ভাব।

কি চাই?

আপনাদের এখানে শুনেছি কিছু পুরানো বই বিক্রি হবে। সেগুলো কিনতে এসেছি।

ও, তা এত রাতে!

শহর থেকে আসতে বেশ দেরি হয়ে গেল। অবশ্য রওয়ানা দিয়েছিলাম একটু দেরিতে।

সবই বিক্রি হয়ে গেছে এ বাড়ির। শুধু কিছু বইপত্তর আছে। ওগুলো কাউকে নিতে দেখলাম না। তা থাকবেন কোথায়?

দেখুন, যদি আজকের রাতটা এখানেই থাকতে দিতেন। কাল দিনের বেলা বইপত্র দেখে যা কিনবার কিনে নিয়ে চলে যাব।

তা থাকতে পারেন। নিচের ঘরেই বইয়ের আলমারি। আপনি সেখানেই থাকুন। এ বাড়িতে আমি ছাড়া আর কোনো লোক নেই।

আর সবাই কোথায় গেল?

বড্ড অভিশপ্ত বাড়ি এটা। কয়েকবারই আগুন লেগেছে। কর্তা তো পুড়ে মারা গেছে অনেক আগেই। সবাই জিনিশপত্র বেচে চলে যাচ্ছে।

হঠাৎ একটা শকুন উড়ে গেল পতপত শব্দে। আমার গাটা কেমন যেন ছমছম করে উঠল। ঝোপেঝাড়ে জোনাক জ্বলছে মিটমিট করে। অন্ধকারে লোকটার মুখ ভালো করে দেখতে পারছি না।

আসুন, দরজাটা খুলে দেই। রাতে খাবেন কি?

আমার কাছে কিছু ফলটল আছে। ওই খেয়েই থাকব।

একটু দাঁড়ান। একটা বাতি নিয়ে আসছি।

লোকটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন লাগছে আমার কাছে। খেয়ালের বশে শহর থেকে এদ্দূর হুট করে চলে এসেছি। বাড়িটা কেমন থমথমে অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে।

দূর থেকে একটা বাতি দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে। এবার একটু সাহস পেলাম।

আসুন, আমার সাথে।

লম্বা বরান্দা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি লোকটার পিছুপিছু। কোণের ঘরের বড় তালাটা খুলে দিলো লোকটা। দরজা খুলতেই ভ্যাঁপসা একটা গন্ধ। বাতিটি উঁচু করে ধরতেই কয়েকটা চামচিকে ফরফর করে উড়ে গেল। জমাট অন্ধকার বাতির আলোতে কেটে যাচ্ছে। ঘরের এক কোণে আলমারি ভর্তি বই। আমার চোখ খুশিতে চকচক করে উঠল।

আপনি রাতে বইপত্রগুলো ঘেঁটে দেখুন। বাতি রইল। ওদিকে একটা চৌকি আছে। ঘুমুতে পারবেন। দরজা ভালো করে বন্ধ করে দেবেন। অন্য কোনো ঘরে যাবেন না। সাপখোপ থাকতে পারে।

লোকটা আবার হঠাৎ অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ঘরটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমার হঠাৎ মনে হলো এই পৃথিবীতে কোথাও কোনো শব্দ নেই। আমি যেন একাকী। আলমারির নিচ থেকে কয়েকটা ইঁদুর চিকচিক করে পালাল।

আমার সামনে এক আলমারি ভর্তি পুরানো দিনের বই। উত্তেজনায় আমার বুক দুলছে। দরজাটা বন্ধ করে আমি বাতি হাতে আলমারির কাছে যাই। দেয়ালে আমার ছায়াটা কেমন বড় হয়ে কাঁপতে থাকে। মরককো

চামড়ায় বাঁধানো অনেক বই। সোনার জলে নাম লেখা। বিভিন্ন ধরনের বই। আমি বইগুলো ঘাটতে থাকি। হঠাৎ একটা বাঁধানো খাতার দিকে আমার চোখ যায়। পেছনের তাকে রাখা। খুলতেই কেমন মিষ্টি একটা গন্ধ। সবুজ কালিতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা একজনের ডাইরি।

কার ডাইরি! নাম নেই। তারিখ দেখে বুঝি প্রায় সোয়া শ বছর আগের। বাতির আলোতে পড়তে বসি ডাইরিটা। কেমন নেশার মতো পেয়ে যায় আমাকে। অদ্ভুত অদ্ভুত কথা লেখা ডাইরিতে। এক জায়গায় কী করে পাখিদের মমি বানিয়ে রাখতে হয় তার বিবরণ। পাখিদের মাথা থেকে মগজ বের করে আনতে কী রকম যন্ত্র লাগে, তার একটা নকশা আছে ডাইরির কোণে। যিনি লিখছেন তার অনেক আজগুবি শখ ছিল। বিদেশ থেকে কত রকমের অর্কিডের বীজ আনিয়েছেন তার তালিকা আছে। কিভাবে শ্যামদেশ থেকে একটা বিড়াল এনেছেন, তার চমৎকার বর্ণনা, বিড়ালটি খুব কালো। দেখতেও বেশ বড় আকারের। শ্যামদেশের বিড়ালের সুনাম শুনে এটাকে অনেক দাম দিয়ে কিনে এনেছিল। বিড়ালটি আমার খুব পোষা হয়ে গেছে।

এক জায়গায় লেখা, আশ্চর্য, আমার প্রিয় বিড়ালটিকে কারা যেন মেরে ফেলেছে। ছাদের কোণে কাল সকালে তাকে মরা পেলাম। গলায় ফাঁস লাগিয়ে বিড়ালটিকে মারা হয়েছে।

সেই রাতে পড়তে পড়তে আমার শরীর কেমন শিরশির করে উঠল। মনে হলো আলমারির উপরে একটা কালো বিড়ালের চোখ বুঝি জ্বলজ্বল করছে। দুর, আমি ভয় পেলাম নাকি! ডাইরির পাতা উল্টে চলি, আমি সম্পূর্ণ সোনা দিয়ে একটা চিল বানিয়েছি। সবারই লোভ ওটার উপর। ওটাকে লুকিয়ে রেখেছি উত্তরের কোণের ঘরের দেয়ালের ভেতর ফাঁপা জায়গায়। দেয়ালের উপর আমার কালো বিড়ালের একখানা ফটোগ্রাফ টাঙানো। ওটাই নিশানা। কারো সাধ্য নেই, সোনার চিলকে খুঁজে বের করে।

আমি আর পড়তে পারি না। সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করে ওঠে। সোনার এক চিল উত্তরের কোণের ঘরে লুকিয়ে আছে। এ কোনো রহস্যের মুখোমুখি হলাম আমি! চিতিডোরা গ্রামে পুরানো বই কিনতে এসে সোনার চিলের খোঁজ পেলাম।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকি। বুকের কাঁপুনিটা একটু কমতেই বাতিটা হাতে করে আস্তে আস্তে দরজা খুলি। কী নিঃসাড় চারদিক। আচ্ছন্নের মতো চলছি আমি। তাই হয়তো ভয় লাগছে না। আশেপাশের গাছপালাগুলো কালচে দেখাচ্ছে। হু হু করে বাতাস বাইছে।

ঘাড়ের কাছে কার যেন গরম নিঃশ্বাস পড়ল। চমকে তাকাই। দুর, কেউ নেই। বারান্দায় ঝোলানো কাঠের ছোট বাক্সে অর্কিডের ঝাড়। আমার সেই ডাইরির কথা মনে হয়। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আনা বিভিন্ন ধরনের ক্যাকটাসের ক্যাটালগ রয়েছে। লোকটার শখ ছিল বলতে হবে।

আমাকে টানছে সোনার চিল। দেয়ারের ফাঁপা অন্ধকারে যা এতদিন জ্বলজ্বল করছে। এটাই হবে উত্তরের কোণের ঘর। কপাট নেই। ঝুলকালিতে ঘরটা ভরা। আমি ভেতরে প্রবেশ করি। কিছু কাঠের জিনিস এদিক সেদিক ছড়িয়ে আছে। আমার চোখ স্থির হয় পশ্চিমের দেয়ালে। কোণায় একটি কালো বিড়ালের বাঁধানো ছবি ঝুলছে। দারুণ উত্তেজনায় আমি অস্থির হয়ে যাই। কপালে বিন্দু বিন্দু করে ঘাম জমে। ডাইরির বর্ণনার সাথে সব মিলে যাচ্ছে।

এখন একটা শাবল দরকার। আজ রাতেই যা কিছু করতে হবে। পুরানো ক্ষয়ে যাওয়া জানালা থেকে একটা লোহার শিক টেনে তুলি। দূরের পুকুরটা চোখের পড়ে। ফ্যাকাশে আলোতে কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে। বড় মাছের ঘাঁই মারার শব্দ শোনা যায়।

বাতিটা এক কোণে রাখি। ফটোগ্রাফের কালো বিড়ালটা কী জীবন্ত! যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওটাকে আস্তে করে নামাই। কী ভারি ছবিটা। শিক দিয়ে দেয়ালটা ঠুকি। গুম গুম শব্দ হয়। সোনার চিল লুকিয়ে আছে এখানে।

আমি দেয়াল ভাঙতে থাকি। কিছুক্ষণের মাঝেই একটা ইট খসে যায়। চুনাবালি ঝুরঝুর করে পড়তে থাকে।

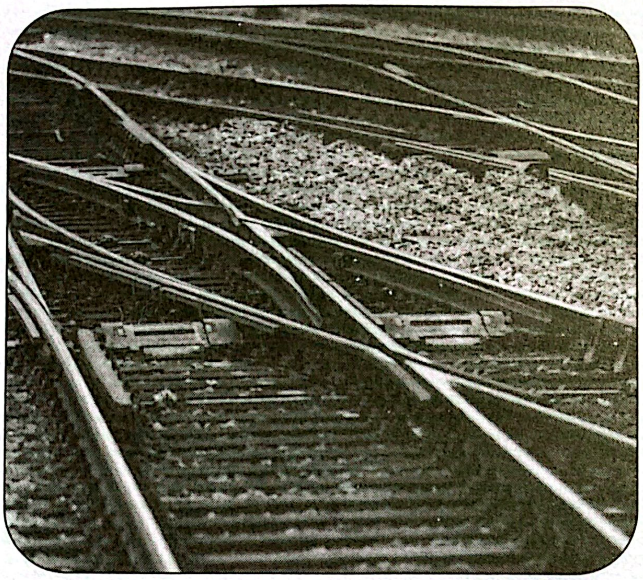
একটা ইট খসতেই বাকিগুলো সহজেই হাত দিয়ে সরাতে থাকি। আমি তখন সোনার চিলের জন্য উদগ্রীব। ভেতরে ফাঁপা অন্ধকার। আমি মুখটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিই। ওকি! দুটো চোখ যেন জ্বলজ্বল করছে। তারপর ফ্যাঁস করে শব্দ। আমি ভীষণ চমকে উঠি। সাঁৎ করে মুখটা

সরিয়ে আনি। বাতির কম্পিত আলোতে দেখি একটা কুচকুচে কালো জন্তু ভয়ংকরভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ডাইরির কথা মনে হয়। প্রাণীটি চাপা গর্জন করে আমার উপর ঝাঁপ দেয়।

আমি ভয়ার্ত চিৎকার করে দৌড়তে থাকি। জানোয়ারটা আমার ঘাড়ের কাছে থাবা বসায়। খুব জ্বালা করতে থাকে আমার শরীর। শনঘাসের জঙ্গল রাতের বাতাসে তখন সাঁ সাঁ করে দুলছে। আমি মাঠের দিকে ছুটতে থাকি। কিছু দূর এগিয়েই অজ্ঞান হয়ে যাই।

পরদিন চিতিডোরা গ্রামের হাটের ডিসপেনসারিতে আমার জ্ঞান ফেরে। গ্রামের লোকেরা আমাকে মাঠ থেকে তুলে এনেছিল। শনঘাসের জঙ্গলের ভেতর এক কালো শেয়াল থাকে। কিছুদিন থেকে নাকি শেয়ালটা পাগলা হয়ে যায়। জঙ্গল থেকে শেয়াল আস্তানা নেয় জোতদার বাড়ির ভাঙা ঘরগুলোতে। সন্ধের পর তাই ওদিক দিয়ে কেউ হাঁটে না।

আমার শুধু মনে হচ্ছিল সেই সোনার চিলের কথা। ডিসপেনসারির বেঞ্চিতে শুয়ে লোকদের টুকরো টুকরো কথা কানে আসে। রাধাচূড়া গাছটা থোকা থোকা ফুল নিয়ে ঝিরঝির করছে। ভিজে মেঘের দুপুর। আকাশের দিকে তাকাই। একটা সোনালি ডানার চিল করুণ সুরে ডেকে ডেকে উড়ে যায়।



পাশিঘাট পেরিয়ে

কে জানত এমন মাঝরাতে হঠাৎ করে ট্রেন থেমে পড়বে অজানা, অচেনা কোনো স্টেশনে। ঘন শালবনের মাঝে। ঘুম ঘুম চোখে কাচের শার্সির বাইরে দেখব বাতাসের রাশি রাশি শালপাতা ঝরে পড়ছে। আর কে জানত, সে সময় দরজা খুলে হুট করে ঢুকবে সেই শুকনো লম্বা লোকটা। যার চোখগুলো দেখতে অবাক রকমের সবুজ আর গা ছমছম করা গলায় যে কথা বলে।

কে জানত পাশিঘাট নামের সেই পাহাড়ি, ছোট্ট, নিরিবিলি এক স্টেশনে আমাকে নামতে হবে সেই লোকটার সাথে পাভাস পাখির জন্য।

গোড়া থেকেই শুরু করা যাক। চিঠি পেয়েছিলাম ধানবাদের এক বন্ধুর কাছ থেকে। বেড়াতে যেতে লিখেছে সে। রাতের সমুদ্র সাঁতারে আমাদের ট্রেনটা ছুটে চলছিল। কামরায় মৃদু নরম আলো। সবাই ঢুলছে। আর হঠাৎ করে একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে পড়ল ট্রেনটা। বাইরে চেয়ে দেখি ঘন শালবন সেটা। বাতাসে কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ। শালকুঁড়ির গন্ধ। মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিলাম এমনভাবে ট্রেনটা থেমে পড়ার জন্য। আর সেই সময়ই দরজা খুলে একটা দমকা বাতাসের সাথে সেই লোকটার প্রবেশ। যার চোখগুলো দুটো সবুজ পাথরের মতো জ্বলজ্বল করছে। আর এসে সে ধপ করে বসে পড়ল আমারই পাশে। কালো রঙচটা একটা কোট গায়ে। হাতে একটা কাপড়ের ব্যাগ। ব্যাগটা রাখতেই একটা তীব্র মিষ্টি গন্ধ তার ভেতর থেকে ভুরভুর করে এসে ছড়িয়ে পড়ল সারাটা কামরায়। বাইরের বাতাসে ভেসে আসা

শালকুঁড়িদের গন্ধের চাইতেও যা অনেক বেশি মিষ্টি আর তীব্র। সামনের বেঞ্চির গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকা মোটামতো লোকটা বলে উঠল, কি সাহেব, ব্যাগ ভর্তি আতর দিয়ে চলেছেন নাকি? খোশবুতে ঘরটা যে ভরে গেল।

সেই শুকনো লোকটা কেমন গা ছমছম করা গলায় বলে উঠল, ব্যাগে আছে ইকনু জাতিদের দেবতা লেন্টুস পাহাড়ের কালো হরিণের নাভি। তারই গন্ধ পাচ্ছেন। বলে মাথা নিচু করে চোখ বন্ধ করল।

সামনের বেঞ্চির মোটামতো লোকটা আজিব বাৎ বলে ঘুমিয়ে নাক ডাকতে শুরু করল। আর আমার কানের কাছে বিষ্টির শব্দের মতো শুধু বাজতে লাগল ইকনু জাতির রেন্টুস পাহাড়ের কালো হরিণ শব্দটি।

ট্রেনটা তখন আবার অন্ধকারের বুকে চিরে ছুটে চলেছে শালবনের মাঝ দিয়ে সামনের দিকে। আমি আর কৌতূহলকে দমিয়ে রাখতে পারছিলাম না। আমার খুব ইচ্ছে করতে লাগল সবুজ চোখের সেই লোকটাকে জিজ্ঞেস করি, ইকনু জাতি কারা? লেন্টুস পাহাড়ের কালো হরিণের নাভি কেন তার ব্যাগের মাঝে?

যেন আমার মনের সমস্ত কথা টের পেয়ে গেছেন এমনিভাবে সেই লোকটি বলে উঠল, কী খোকা, লেন্টুস পাহাড়ে কখনও গিয়েছ? যেখানে মিয়া, ফুল ফোটে থরে থরে। যেখানে তিনটে মাত্তর কালো হরিণ আছে। ইকনু জাতির লোকেরা যাদের দেবতা ভেবে পূর্ণিমার রাতে পুজো দেয়, পাভাস পাখির বাচ্চা কেটে তার রক্তে ভিজিয়ে ফেলে টুংলিং গুহার সামনের জায়গাটাকে।

কামরায় মৃদু আলো। কেমন রহস্যময় হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে। আর সবুজ চোখের লোকটা আমার পাশে বসে এসব আজগুবি, গা ছমছম করা কথাগুলো বলে চলল।

কি খোকা, গিয়েছ কখনও? নাকি সারাজীবন গলিতেই কাটিয়ে দিয়েছ?

আমি শুধু অস্ফুট গলায় বললাম, লেন্টুস পাহাড় কোথায়? কী হয় ওখানে?

এই দ্যাখ, লেন্টুস পাহাড়ের নামই শোননি তুমি। ভূগোলের বইতে যা ছাঁইপাশ লেখা আছে তাই বোকা ছেলেদের মতো মুখস্থ করেছ। শুধু এই জন্যই তোমাদের মতো ছেলেদের দিয়ে কিচ্ছুটি হয় না। ভূগোলের ওই শুকনো খসখসে বইয়ের বাইরেও একটা আলাদা জগৎ রয়েছে যে, কোনোদিন চোখ তুলে সে সব দেখেছ? দেখার চেষ্টা করেছ? যত্তোসব। বলে লোকটা আবার ঝিমুতে লাগল। আমি একটু ধাক্কা দিলাম সেই লোকটাকে।

ঘুমোলেন নাকি? বলুন না লেন্টুস পাহাড়ে কী হয়?

আরে, তুমি দেখছি আচ্ছা ত্যাঁদড় ছেলে। বেশি কথা বললে নাকের ভেতরে পাভাস পাখির পালক দিয়ে সুড়সুড়ি দিয়ে দেব, তখন মজাটা টের পাবে বুঝলে? এখন ঘুমোও। খানিক বাদে আসবে পাশিঘাট স্টেশন। আমি সেখানে যাচ্ছি পাভাস পাখির জন্য। যদি আমার সাথে যেতে চাও, তবে নেমে পড়ো। এখন আর বিরক্ত কর না বাপু। মেলা রাত হয়েছে।

বলে লোকটা আবার ঢুলতে লাগল। আর আমার মনে হলো, আমার চারপাশে যেন একটি কুয়াশার মতো জগত তৈরি হয়েছে। সেখানে আলো আঁধারির মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে ইকনু জাতির লোকেরা। সিয়ামি ফুলে ভরা লেন্টুস পাহাড়ের তিনটে কালো কুচকুচে হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর পাভাস পাখিদের তুলতুলে বাচ্চা কেটে রক্তে ভিজিয়ে দিচ্ছে কারা যেন টুংলিং নামের এক গুহার সামনে জায়গাটুকুকে। মাথাটা আমার কেমন যেন ঝিমঝিম করে উঠল।

ট্রেনের ঝাঁকুনি তখন কমে আসছে। বাইরে তাকিয়ে দেখি শালবন তখন ফিকে হয়ে আসছে। আর এক সময় ট্রেনটা থেমে গেল। অমনি তড়াক করে সবুজ চোখের সেই লোকটা উঠে বলল, পাশিঘাট এসে গেছে। পাভাস পাখিদের পাওয়া যাবে এখানে। চলো খোকা, নেমে পড়ি।

আমি কিছু না ভেবে, কেমন সম্মোহিতের মতো নেমে পড়লাম সেই লোকটার সাথে।

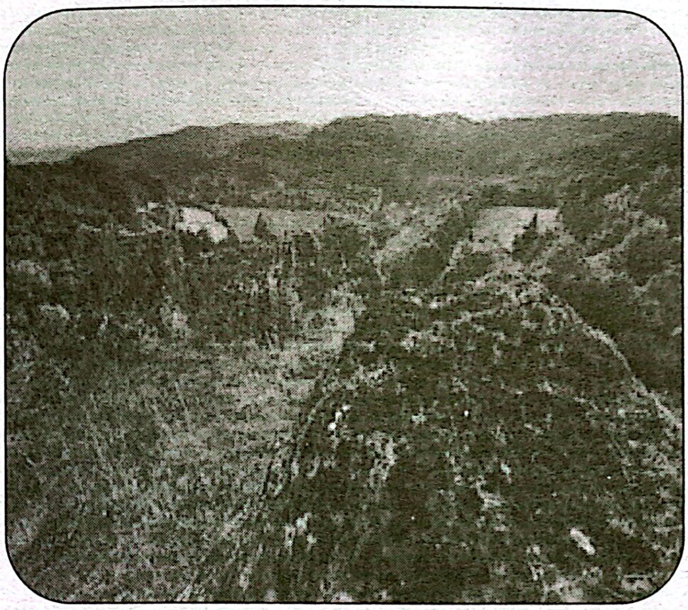
ছোট্ট নিরিবিলি স্টেশন পাশিঘাট তখন আবছা অন্ধকারে ডুবে আছে। আমার মনে হলো পাভাস পাখিরা দেখতে কেমন? লোকটা আমার একটা হাত ধরে হাঁটা শুরু করল।

চলো খোকা, এ জঙ্গলের গভীরেই থাকে পাভাস পাখিদের ঝাঁক।

আমরা দুজনে হেঁটে চলেছি। রাস্তায় লোক চলাচল একদম নেই। গ্যাস বাতিগুলো নিবু নিবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিচকিচ করে পাখিরা ডাকছে। লাল কাঁকরের আঁকাবাঁকা রাস্তা। হঠাৎ দেখি কোণার চায়ের দোকানটা থেকে দুজন পুলিশ উঠে এসে সেই লোকটাকে থামতে বলছে। পুলিশদের দেখে সবুজ চোখের অবাক করা লোকটা আমার হাত ছেড়ে দিয়ে দৌড়তে লাগল। কিন্তু পুলিশ দুটো কিছুক্ষণের মাঝেই দৌড়ে তাকে ধরে ফেলল।

আমি অবাক। পরে জানলাম লোকটা একজন ছেলেধরা। ট্রেন থেকে আজগুবি গল্প বলে ভুলিয়ে ভালিয়ে ছেলেদের নামিয়ে আনে। আরো দুবার নাকি এ জন্য শাস্তিও হয়েছিল তার।

কিন্তু আমার খারাপ লাগছিল এটা ভেবে যে, লেন্টুস পাহাড়ের কালো হরিণ তিনটাকে আর দেখতে পেলাম না।



সোনালি শহর

ভিজে মেঘের দুপুর। ছাদে দাঁড়িয়ে দেখছি নীল আকাশের চক্কর দিয়ে উড়ছে কয়েকটি চিল। সোনালি ডানার চিল। চিলেকোঠায় দাদুর আলমারির এক কোণায় আমি হঠাৎ করে সেদিন একটি চমৎকার বই পেয়ে গেলাম। বইটির নাম 'বাংলার পাখি'। পাখিদের নিয়ে বাংলা ভাষায় একটি লেখা প্রথম বই। লিখেছিলেন শান্তিনিকেতনের শিক্ষক জগদানন্দ রায়। যিনি ছেলেমেয়েদের প্রকৃতি চেনাতেন। তাদের নিয়ে যেতেন মাঠে, প্রান্তরে। চেনাতেন গাছপালা, লতাপাতা, পাখি। মাছ, ঝিনুক, গ্রহ-নক্ষত্র। কতোদিন আগেই তিনি এদেশের ছেলেমেয়েদের প্রকৃতির অজানা রহস্যের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে চেয়েছিলেন।

চিলেকোঠার ঘরে মৃদু আলো। আমি ঐ হলুদ বিবর্ণ হয়ে আসা বইটির পাতা উল্টে যাই। জগদানন্দ রায় কি মমতা নিয়ে লিখেছিলেন। মনে হয় তিনি যেন আমাদের পাখিদের ভালোবাসতে শেখাচ্ছেন। আকাশে তখনো উড়ছে শঙ্খচিলেরা। আমি দেখি শঙ্খচিল প্রসঙ্গে লিখেছেন, ইহাদের পেটের তলা, বুক, মাথা ও ঘাড় শাদা পালকে ঢাকা থাকে। শঙ্খের মতো শাদা পালক গায়ে আছে বলিয়াই বোধকরি ইহাদের নাম শঙ্খচিল হইয়াছে। কিন্তু ডানা দুখানি এবং শরীরের অন্য অংশ খয়েরি।

মাছই এদের প্রধান খাবার। তাই শীতকালে যখন খাল, বিল ও পুকুরের জল শুকিয়ে যায় তখনই এদেরকে জলাশয়ের ধারে গাছে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। তারপর গরম পড়িলে শঙ্খচিলদের প্রায়ই আর সন্ধান পাওয়া যায় না।'

আমি যেন দেখতে পাই কোনো গাছের মগডালে বসে থাকা শঙ্খচিল শীতের বিল থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাচ্ছে রুপোলি মাছ।

ভাবছি, খুব শিগগিরই পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা পাখি দেখার ক্লাব করব। এ ব্যাপারে সবচাইতে বেশি উৎসাহ যিনি দেবেন তিনি হলেন আমাদের সনুমামা। এ বাড়িতে যখনি আসেন তিনি বলেন,

তোদের কতোদিন ধরে বলছি একটা পাখি দেখার ক্লাব কর। পাখিদের ভালোবাসতে শেখ। এই যে শীতের সময় ঢাকার রাস্তায় দেদারসে বুনোহাঁস বিক্রি হচ্ছে এর বিরুদ্ধে কিছু হয়েছে? অথচ বুনোহাঁস ধরা রীতিমতো বেআইনি কাজ। কি নিষ্ঠুর ভাবে যে পাখিদের ঠ্যাং ঝুলিয়ে রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এরা সব ক্রিমিন্যাল।

সনুমামা এবার ফিরেছেন আমাজানের বর্ষা অরণ্য থেকে। গিয়েছিলেন আমাজানের উজানে। দুর্গম অঞ্চলে। আমরা তার কাছে আন্দিজের কথা শুনে দারুণভাবে আলোড়িত।

আকাশে তখনো কয়েকটা শঙ্কচিল চক্কর দিচ্ছে। হঠাৎ দেখলাম একটা চিল ডাইভ দেয়ার ভঙ্গিতে উড়ে আসছে। শঙ্খচিলটা উড়ন্ত একটা পাখিকে আঘাত করল। মনে হলো ঘাড়ের কাছটা কামড়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে এভাবে পাখিদের রাজ্যে আক্রমণ হয়। পাখিদের তীক্ষ্ণ ডাক শোনা যাচ্ছে। শিকারি পাখিরা বেশ হিংস্র হয়ে থাকে। বিজে মেঘের দুপুরটা পাখিদের লড়াইতে মুখরিত হয়ে উঠলো। আকাশে উড়ে পাখিদের পালক। কয়েকটা পালক উড়ে উড়ে আমাদের ছাদে এসে পড়ল। আমি আর তপু সেই পালকগুলো তুলে নিলাম। ধূসর বাদামি আর শাদা পালক।

সিঁড়িতে দুদ্দাড় শব্দ। সনুমামা আসছেন। গিয়েছিলেন জিনজিরার ডাঙ্গা প্রাসাদে ছবি তুলতে। সনুমামার পেছনে কলরব করে উঠে আসছে পাড়ার ছেলেমেয়েরা। গত কদিন থেকেই সনুমামা তাদের আন্দিজ পাহাড়ের গল্প শোনাবেন বলেছেন। কিন্তু সহজে কি আর সনুমামার গল্প বলার মুড আসে। বিন্তি তো তার জন্যে বিরাম বিভিন্ন ধরনের রান্না করেই

যাচ্ছে। আসলে কখন যে সনুমামা তার গল্পের ঝুলিটি খুলবেন তা কেউ বলতে পারে না। সনুমামা এখনো আমাদের কাছে রহস্যময় এক মানুষ।

আমি আর তপু পাখিদের পালকগুলো তুলে তুলে রাখছি। উত্তুরে বাতাসে পালক উড়ে যাচ্ছে। সনুমামা পেছনে এসে দাঁড়ালেন।

জিনজিরা প্রাসাদের কোনো রকমের চিহ্নই আজ খুঁজে পেলাম না। শুধু কয়েকটা ভাঙ্গা ইটের দেয়াল। আগাছায় ঢেকে আছে। আমরা ছোটবেলায় কি সুন্দর দেখেছিলাম প্রসাদাটাকে। না, এ দেশের লোকদের কোনো ঐতিহ্য প্রীতি নেই। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের স্মৃতিমাখা প্রাসাদ। তার খালা ঘসেটি বেগমকে যেখানে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। এটা তো সংরক্ষণ করা যেতে পারত।

সংরক্ষণ না আর কিছু। লোকে ইট তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

টোপন রাগতস্বরে বলে। সনুমামার সাথে টোপনও গিয়েছিল।

হঠাৎ সনুমামা তাকালেন তপুর হাতের দিকে।

তোর হাতে এসব কিরে?

পাখির পালক।

কোত্থেকে পেলি?

আকাশ থেকে পড়েছে।

ও, পাখিদের লড়াইয়ের ফল।

বিন্তি হঠাৎ তপুর হাত থেকে কয়েকটা পালক নিয়ে বাতাসে ভাসিয়ে দেয়। সেগুলো ফরফর করে উড়ে যায়। সেদিকে তাকিয়ে থেকে সনুমামা বললেন, এই পালকগুলোকে খুব সামান্য আর সাধারণ মনে হচ্ছে তোমাদের কাছে। অথচ এই পাখির পালকের জন্যেই সেবার আমরা সেই হতভাগ্য মেয়েটিকে খুঁজে পেলাম। আর ওকে পাওয়ার পরেই বিরাট এক ইতিহাসের অধ্যায় উন্মোচিত হলো। যে ইতিহাস ছিল অনেকটাই অজানা।

কাকে পেলে?

চারশো বছর আগে জন্ম নেয়া কিশোরী ইনকা মেয়েটিকে। পেলাম আন্দিজের উঁচু পাহাড়ে। এম্পাটোতে।

পাখির পালকের জন্যে পেলে?

মেয়েটির মমিতে লাগান ছিল পালকের মুকুট। ওটার জন্যেই ঐ ভয়ঙ্কর দুর্গম অঞ্চলে পাওয়া গেল মেয়েটিকে। আর সেই সাথে জানা গেল ইনকা সভ্যতার এক অজানা রহস্যময় অধ্যায়।

আমাদের বুঝতে বাকি রইল না সনুমামা এখন আন্দিজের পাহাড়ি পথে ঘুরছেন। গল্পের উৎসে যাবেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না। যা যা তার কাছে ভালো লাগে তাই করতে পারি আমরা। আমাদের প্রত্যেকের তুনে যা তীর রয়েছে তাই নিক্ষেপ করতে থাকি। যদি কোনো একটা লেগে যায়। আর তা হলেই সনুমামা প্রসন্নভাবে তার গল্পের টাইম মেশিনে আমাদের চড়তে দেবেন।

বিন্তি দৌড়ে নিচ থেকে গরম পাকৌড়া আর মাংশের পুর দেয়া সিংগাড়া নিয়ে আসে।

সবজান্তা টোপন জানায় মহাশূন্যের ব্যাঙাচির খবর। আমাজানের বর্ষা অরণ্যের সবুজ ব্যাঙের গল্প বলার পর সনুমামা টোপনকে ব্যাঙ সংক্রান্ত কোনো চমকপ্রদ এবং দারুণ খবর সংগ্রহ করে জানাতে বলেছিলেন। টোপন তাই জানাচ্ছে, মহাকাশ ফেরি এন্ডিএভার সাম্প্রতিক অভিযানে মহাশন্যের ভরহীন পরিবেশে ব্যাঙের ডিম ফুটে ব্যাঙাচির জন্ম হয়েছে। এর আগে মহাশূন্যে কীটপতঙ্গের চাইতে উন্নততর কোনো প্রাণীর ডিম ফোটানো সম্ভব হয়নি। এন্ডিএভারে পাঠানো হয়েছিল চারটি থাবাঅলা আফ্রিকান ব্যাঙ। হরমোন ইনজেকশন দিয়ে তাদের ডিম পাড়ানো হয়। ব্যাঙের ৬০০ ডিম কৃত্রিমভাবে নিষিক্ত করে ইনকিউবেটরে ঢুকিয়ে তা থেকে কয়েকটি ব্যাঙাচি ফোটানো হয়েছে। অভিযান শেষে ফিরে আসার পর মহাশূন্যে জন্মানো ব্যাঙাচিদের পৃথিবীর পরিবেশে বাড়তে দেয়া হয়। পূর্ণাঙ্গ এবং বড় হওয়ার পর ওদের ডিম থেকে বাচ্চা ফুটিয়ে দেখা হবে তারা স্বাভাবিক হয়েছে কিনা।

আমরা সবাই অবাক হয়ে টোপনের দিকে তাকিয়ে থাকি। ব্যাঙ সংক্রান্ত দারুণ তথ্য জানিয়েছে। রীতিমতো চাঞ্চল্যকর তথ্য। সনুমামার মুখ দেখে মনে হচ্ছে বেশ খুশি হয়েছেন। যাক, সনুমামাকে তাহলে গল্পের পরিবেশে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

সনুমামা এবার প্রশ্ন করেন,

আচ্ছা টোপন, খুব তো মহাশূন্যের ব্যাঙাচি হওয়ার খবর দিলে। কিন্তু জীববিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে এতো এতো জায়গা থাকতে ঐ সুদূর মহাশূন্যে কেন ব্যাঙের ডিম ফোটাতে গেলেন?

কারণ ভবিষ্যতে মানুষের দীর্ঘ সময় মহাকাশবাসের জন্যে এই পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সনুমামা টোপনের উত্তরে খুশি হয়েছেন। আমি তাকে দেখলাম দাদুর সংগ্রহ থেকে খুঁজে পাওয়া পুরানো বাংলা পাখি বইটি। সনুমামা সেই বই দেখে আবেগতাড়িত।

বোঝা যাচ্ছে সব মিলিয়ে পরিবেশ এখন গল্প বলার যথেষ্ট অনুকূলে।

সনুমামা আয়েস করে বসেছেন চিলেকোঠার পুরানো খাটটাতে। তাকে ঘিরে আমরা সবাই।

আসলে আন্দিজে গিয়েছিলাম আমাজনের উজানের খোঁজ নিতে। আমাদের দলের কজনের লক্ষ্য হলো আন্দিজের রহস্যময় সোনালি শহরের অনুসন্ধান।

সোনালি শহর মানে স্বর্ণশহর। এল ডোরাডো। সেই মধ্য যুগ থেকে যার খোঁজ চলছে। লোকে মনে করে এই স্বর্ণশহর লুকিয়ে আছে ব্রাজিলের সেই দুর্ভেদ্য জঙ্গলে মধ্যে।

ওপাশ থেকে টোপন বলে।

আমি তখন পেরুতে। এসেছি সেখানকার জাদুঘরের ইনকা প্রদর্শনী দেখতে। ইনকা সভ্যতার ওপর লেখার জন্যে আমি তখন এক প্রকাশকের সাথে চুক্তিবদ্ধ। ফলে যেখানেই ইনকা সভ্যতার কোনো চিহ্ন আছে বলে খোঁজ পাচ্ছি সেখানেই ছুটে যাচ্ছি।

ইনকা সভ্যতাটা আবার কি?

জিজ্ঞেস করে বিন্তি। সনুমামা কিন্তু এতোক্ষণে বেশ কটা ধোঁয়াওঠা সিংগাড়া খেয়ে নিয়েছেন।

বিন্তি, তোর হাতে দেখছি চমৎকার সিংগাড়া হয়।

আমি বলছি ইনকা সভ্যতাটা কি?

দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতমালার কোলে প্রায় পাঁচশো বছর আগে কুচুইয়া, আইমারা ও অন্যান্য কয়েকটি উপজাতি মিলে এক উন্নত সভ্যতার গড়ে তোলে। এই কুচুইয়া ভাষা গোষ্ঠীর একটি উপজাতি হলো গিয়ে ইনকা। তাদের সভ্যতা ছিল বেশ উন্নত। কোকোর চাষ করত। মধু সংগ্রহ করত। ভাস্কর্য, চিত্রকলায় দক্ষ ছিল। তাদের রাজধানীর নাম ছিল কুজকো। এদের সবচেয়ে বিখ্যাত রাজা সাপা নিজেকের সূর্যপুত্র বলে মনে করত। তার প্রজারাও তাকে দেবতা মনে করে পুজো করত। পশু পালন, ধাতুর কাজ, বয়নশিল্প, স্থাপত্যেও এরা উন্নত ছিল। ইনকাদের ছিল নিজস্ব চিত্রলেখা।

আমি রোজ যাই পেরুর জাদুঘরে। দোতলার পুরো অংশ জুড়ে চলছে ইনকা প্রদর্শনী। চমৎকার আলোর ব্যবস্থা। এমনভাবে প্রদর্শনীতে আলো দিয়েছে যাতে ইনকাদের বিভিন্ন মূর্তিগুলোকে রীতিমতো জীবন্ত বলে মনে হতো। দেয়াল জুড়ে ছবি। অবাক বিস্ময়ে আমি ইনকাদের বিভিন্ন নিদর্শন দেখি। নোট নেই। আমি প্রায়ই দেখতাম আমার মতো নোট নিচ্ছে এক বৃদ্ধ লোক। তামাটে রঙ। বয়সের ভারে নূয়ে যাওয়া শরীর। কিন্তু তার উৎসাহের যেন কোনো কমতি নেই। মনে হলো তিনিও ইনকাদের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহী। লোকটির প্রতি আমার কৌতূহল বাড়ে।

একদিন দুপুরে জাদুঘরের রেস্তোরাঁতে যেচে গিয়ে তার সাথে আলাপ করলাম।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক লিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক তাচাঙ্কো।

একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন তিনি। তার গবেষণার বিষয় ইনকাদের স্বর্ণশহর। যাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে এল ডোরাডো বলে।

কোথাও লুকিয়ে রয়েছে সোনালি শহর এল ডোরাডো? এর খোঁজে কতো অভিযান। রক্তপাত। সংঘর্ষ। মৃত্যু। তবু এল ডোরাডো মায়াবী হাতছানি দেয়।

ইনকাদের প্রতি আমার আগ্রহ দেখে মি. তাচাঙ্কো তার বাড়িতে আমাকে একদিন নিমন্ত্রণ করলেন। আমার ইচ্ছে তার কাছ থেকে স্বর্ণশহরের কাহিনী শোনা। এর জন্যে কতো ইতিহাস তন্নতন্ন করে ঘেঁটেছেন তাচাঙ্কো। যুবক বয়স থেকে তার এই আগ্রহ। বিভিন্ন বার দুর্গম বনে পাহাড়ে অভিযান করেছেন।

লিমার শহরতলীতে গাছপালায় ঘেরা তাচাঙ্কোর বাড়ি। স্টাডিকক্ষে প্রচুর বই। ছোট ছোট মূর্তি। তাচাঙ্কো আমাকে কফি দেন।

একটা বিশেষ ধরনের কফি। আমি এক পাহাড়ি গ্রাম থেকে সংগ্রহ করি।

কফি বোধ হয় আপনার প্রিয়।

এখানকার অধিবাসীরা কোকো পাতা চিবিয়ে খেয়ে শক্তি সংগ্রহ করে।

তুমি তো এসেছো এক প্রাচীন সভ্যতার দেশ থেকে। তোমাদের অঞ্চলের গঙ্গা সভ্যতা অনেক প্রাচীন। গ্রিক ও ল্যাতিন লেখকরা এর কথা বলেছেন 'গাঙ গাড়ি দাই্‌ পেরিপ্লুস ইরিথ্রাম নামে খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের

এক নাবিক তার বইতে গেঞ্জাসের কথা বলেছেন। বলা হয়েছে, নদীর তীরে খুব ব্যস্ত বন্দর। সেখানে কুশলী কারিগরেরা তৈরি করে অপূর্ব শাড়ি।

আমি তখন তাচাঙ্কোকে জানাই ঐ সূক্ষ্ম বস্ত্রের নাম মসলিন। যা ছিলো আমাদের দেশের গর্ব। তাচাঙ্কো যখনই কোনো প্রাচীন জনপদের কথা বলেন তখন তার কণ্ঠে আবেগ এসে ভর করে। তিনি যেন অতীতের সোনালি দিনগুলোর মাঝে হারিয়ে যেতে চাইছেন।

টলেমী লিখেছেন এই গেঞ্জেসের কথা। নদীর নাম, শহরের নাম এবং সেই অঞ্চলের নাম হলো গেঞ্জেস। দাই সেখানকার একটি রাজধানী। আরো একটি শহরের কথা উল্লেখ করেছেন। সেটির নাম তামলিটিস। তুমি এসেছ সেই প্রাচীন সভ্য জনপদের দেশ থেকে। কফির কাপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। ঘরের এক কোণায় জ্বলছে টেবিল ল্যাম্প। তাচাঙ্কো আমাকে রাতের খাবারের নিমন্ত্রণ করেছেন। ভদ্রলোক বিপত্নীক। দেয়ালে ঝুলছে কয়েকটা ইনকা চিত্রলিপি। আবছা আলোতে তাচাঙ্কোকে এখন কেমন রহস্যময় লাগছে।

কিন্তু তাচাঙ্কো শুধুমাত্র স্বর্ণশহরের প্রতিই এতোটা আগ্রহী কেন? তাকে তো লোভী মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। কৌচে বসে তাচাঙ্কো আমাকে শোনালেন ইনকাদের স্বর্ণশহরের কথা। এল ডোরাডোর কাহিনি।

ইনকাদের সোনার শহরের কথা অনেক আগেই মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। ইউরোপের বহু দেশে ছড়িয়ে গিয়েছিল এই রহস্যময় অতি মূল্যবান সম্পদে ভরা শহরটির কথা। বিশেষ করে স্পেনের আবিষ্কারকদের কাছ থেকে এ খবর বেশি ছড়ায়। ১৫২০ সালে হারমান কোর্টিস শাসক মন্টেজুমার কাছে থেকে যে মূল্যবান সামগ্রী উপহার হিশেবে পেয়েছিলেন তার বিবরণ শুনে স্পেনের লোকেরা বিস্মিত হলো।

গাড়ির চাকার সমান সূর্যের মতো একটি চাকতি। পুরোটা যার সোনার তৈরি। সূক্ষ্ম কারুকাজ করা বিশটি সোনার হাঁস। বহু রকমের জীবজন্তুর সোনার মূর্তি। বাঘ, সিংহ, হরিণ।

কোর্টিস ভাবছিলেন পাহাড়ের ওপারে রয়েছে সোনায় মোড়া শহর।

স্পেনের রাজা সোনা সংগ্রহের জন্যে পাঠালেন তার দুর্ধর্ষ সেনাপতি পিঁজারোকে। ১৭৩১ সালে। পিঁজারো দুর্গম পাহাড়, পর্বত অতিক্রম করে এলো। গেল পেরুর দক্ষিণ দিকে। এলো ইনকা সাম্রাজ্যের উত্তর সীমায়।

দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে তখন ইনকাদের বিশাল রাজত্ব। আন্দিজ পর্বতমালা আর দুর্গম আমাজন নদীর অববাহিকার ঘন জঙ্গলের মধ্যেও তারা তৈরি করে বড় বড় শহর।

ইনকা সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিলো দুটি। উত্তরের রাজধানী কুইটু। দক্ষিণের রাজধানী কুজকো।

ইনকরারা বিশ্বাস করত তারা সবাই সূর্যের সন্তান। বলত সূর্য কাঁদলে সোনা হয়। সোনার কোনোরকম আর্থিক মূল্য তাদের কাছে ছিলো না। তাদের মনে হতো সোনা হলো সূর্যের প্রতীক।

ইনকা সম্রাটেরা মারা গেলে তাদের দেহ সোনার সাজে সাজিয়ে মন্দিরে স্থাপন করা হতো। সেই দেশে শুধু সোনার ছড়াছড়ি।

পিঁজারো ছিলো দুর্দান্ত সাহসী। কূটকৌশলে দক্ষ। যখন পিঁজারো এলো ইনকা সাম্রাজ্যের তখন সূর্যের সন্তান সম্রাট আতাহুয়ালপা জানলেন তার আগমন বার্তা। তিনি তাদের অভ্যর্থনা করার জন্যে যাজকদের পাঠালেন।

পিঁজারো জানালো সে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিজেই আসবে রাজপ্রাসাদে।

ইনকা রাজপ্রাসাদের সামনে এলো দুঃসাহসী পিঁজারো। সাথে তার ঘোড়সয়ার সৈনিকেরা। তাদের ঘিরে রেখেছে তীর বল্লাম হাতে ইনকা সৈন্যরা।

পিঁজারো মনে মনে ফন্দি আঁটলো। আতাহুয়ালপাকে বন্দি করে জামিন স্বরূপ আটকে রাখবে।

আতাহুয়ালপার প্রাসাদ দামি জিনিশে ভরা। ঝকঝক করছে। সোনা দিয়ে মোড়ান অনেক জিনিশ।

হঠাৎ করে পিঁজারো ঘোষণা করল, ইনকারা বর্বর, অসভ্য। স্পেনের রাজা হলেন সবচাইতে শক্তিশালী। কাজেই এখন থেকে ইনকারা স্পেনের অধীনে থাকবে।

এই নাটকীয় ঘোষণার সাথে সাথে পিঁজারোর সৈনিকেরা ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো ইনকাদের মাঝে। ইনকা সৈন্যরা আত্মরক্ষার জন্যে একটুও সুযোগ পেলো না। মারা গেলো তিন হাজার ইনকা সৈন্য। বন্দি হলো আতাহুয়ালপা। লুটপাট শুরু হয়ে গেলো। ধূর্ত পিঁজারো আতাহুয়ালপাকে বন্দি করল একটি ৫৭ মিটার ঘরে। সেই ঘরের চারপাশে মাটি থেকে তিন মিটার উঁচু একটা লাইন টানা হলো। তারপর ইনকাদের বলা হলো সেই

ঘরে ঐ লাইন পর্যন্ত সোনা দিয়ে ভরে দিতে হবে। তবেই মুক্তি দেয়া হবে আতাহুয়ালপাকে।

দেবতা, শাসক আতাহুয়ালপা হলো সূর্যের বংশধর। তার প্রাণরক্ষার জন্যে রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে সোনা সংগ্রহ করা হতে লাগল। এভাবে প্রায় ৪ লক্ষ কিলোগ্রাম সোনা সংগ্রহ করা হয়েছিল।

পিঁজারো ছিলো নিষ্ঠুর। সে আতাহুয়ালপাকে মৃত্যুদণ্ড দিলো। পিঁজারো ভেবেছিলো আতাহুয়ালপাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারলে সোনা সংগ্রহ করা আরো সহজ হবে। কিন্তু ইনকারা যখন শুনলো আতাহুয়ালপাকে মেরে ফেলা হয়েছে তখন তারা সোনার জোগান দেয়া বন্ধ করে দিলো। লুকিয়ে রাখা হলো পাহাড়ি গুহার গভীরে। যাজকেরা সূর্য মন্দির থেকে সোনা নিয়ে রেখে দিলো আগ্নেয়াগিরির গিরিখাতে।

এই সোনা লুকিয়ে রাখা নিয়েই এরপর থেকে শুরু হলো কিংবদন্তী। নানা কাহিনি। সৃষ্ট হলো রহস্যভরা কাহিনি।

এমনি একটি কাহিনি আছে বিখ্যাত টিটিকাকা হ্রদ নিয়ে। পেরু আর বলিভিয়ার মাঝের অঞ্চলে হ্রদটি। ইনকারা বিশ্বাস করত, টিটিকাকা হ্রদের একটি দ্বীপে সূর্যদেবতা প্রথম ইনকা সৃষ্টি করে। সেখানে ছিলো একটি সোনার মন্দির। যার দেয়ালগুলো ছিলো সোনার পাতে মোড়ানো। ধর্ম যাজকেরা নৌকোয় করে টিটিকাকা হ্রদের মাঝে গিয়ে নৈবদ্য হিশেবে পাওয়া সোনার তাল নিক্ষেপ করতো।

একটি টিটিকাকা হ্রদে বহুবার সোনা সংগ্রহের জন্যে অভিযান হয়েছে।

ইনকাদের স্বর্ণশহর এল ডোরাডো তখন অভিযানকারীদের কাছে ছিলো এক স্বপ্নের হাতছানি।

১৫২৯ সালে ডালফিঙ্গার নামে এক জার্মান এল ডোরাডোর সন্ধানে যাত্রা শুরু করলেন। তিনি এসে পৌঁছালেন মারকাইবো হ্রদ পর্যন্ত। সেখানে তিনি শুনলেন এল ডোরাডোর কথা। হ্রদের ধারে রয়েছে সোনার মানুষ এল ডোরাডোর শহর। মূর্তিগুলোর চোখে বসানো পান্না পাথর।

ডালফিঙ্গার দুর্গম পথ ধরে এগিয়ে গেলেন। পথে মারা গেলেন বিষাক্ত তীরের আঘাতে।

১৫৩৫ সালে আবার অভিযান চালালেন হোহারমুখ। বনে পাহাড়ের অনেক ঘুরলেন। ব্যর্থ হলেন তিনি।

১৫৩৬ সালে অভিযান করলেন কুইমেডা। তিনি অভিযান শুরু করেছিলেন ভেনিজুয়েলার সীমা থেকে। অনেক কষ্ট সহ্য করে ওয়াতাভিতা হ্রদ পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছিলেন। ঐ হ্রদে নতুন রাজার অভিষেক হতো সোনার গুঁড়োতে ঢেকে।

কুইমেডাও শেষ পর্যন্ত কোনো খোঁজ পেলেন না।

প্রতিটি শতাব্দীতে এল ডোরাডোর অনুসন্ধানে অভিযান চলেছে।

১৯২৫ সালেও ইংরেজ কর্নেল ফাসেট এই রকমের এক অভিযানে স্থানীয় অধিবাসীদের হাতে নিহত হয়।

ফাসেট ভেবেছিলেন স্বর্ণ শহরটি লুকিয়ে রয়েছে ব্রাজিলের সেই দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভেতরে। তাচাঙ্কো স্বর্ণশহরের কাহিনি এ পর্যন্ত বললেন।

হঠাৎ ফোন বেজে উঠল।

আমার মনে হলো তাচাঙ্কো যেন ফোনের শব্দে কেমন ভয় পেয়েছেন।

ফোন ধরতেই দেখলাম তার চোখমুখে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তিনি কম্পিত হাতে ফোনটি রেখে দিলেন।

কার ফোন মি. তাচাঙ্কো? কোনো দুঃসংবাদ?

বুঝতে পারি না। শুধু বলে আমার কাছে স্বর্ণশহরে পৌঁছাবার পথের যে ম্যাপটি রয়েছে তা যেন ওদের দিয়ে দিই। নইলে ওরা আমাকে হত্যা করবে।

আছে নাকি আপনার কাছে সেই ম্যাপ?

অসম্ভব। আমি এক টিভি সাক্ষাৎকারে শুধু বলেছিলাম এতদিন গবেষণা করে, তথ্য ঘেঁটে আমি এল ডোরাডোর অবস্থান সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করতে পারছি। অবশ্য এর সবটাই আমার অনুমান।

কোথায় রয়েছে বলে মনে করেন?

আন্দিজের এস্পাটো পর্বতে ব্যাপক অভিযান চালালে হয়তো কিছু হদিশ পাওয়া যাবে। আর যেতে হবে আমাজানের উজানে। বড্ড দুর্গম সেই স্থান। এসব অঞ্চল এখনো অজানা। মানচিত্রও ভালো করে তৈরি হয়নি। আমাজানের শাখা নদী আপরিম্যাকের উৎসে যেতে হবে। আমার এই সাক্ষাৎকারটি লিমা টিভিতে প্রচারিত হওয়ার পর থেকেই আমি রাতের বেলায় এক রহস্যময় অচেনা কণ্ঠের টেলিফোন পাই। তারপর থেকে পেতেই থাকি। আমার মনে হয় কারা যেন আমাকে অনুসরণ করছে। দেখুন তো বাইরে কোনো লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে কিনা?

আমি উঠে জানালার কাছে যাই। পর্দা একটু ফাঁক করে দেখি রাস্তার অপর দিকে দুজন লোক এ বাড়িটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাদের তাকানোর ভঙ্গি খুব সন্দেহজনক। পরনে লোমশ চামড়ার বিচিত্র জ্যাকেট। এ ধরনের জ্যাকেট সাধারণত কুখ্যাত অপরাধী দল কালো শকুনের সদস্যরা পরে থাকে। কালো শকুন দলের নেতা পেরুর ভয়ংকর হত্যাকারী স্পিনো যাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে পুলিশ।

তবে কি স্পিনোর লোকেরা তাচাঙ্কোকে অনুসরণ করছে?

তাচাঙ্কোর বাবুর্চি চমৎকার রান্না করেছে। পেরুভিয়ান শেষে খাবার। বেগুন দিয়ে ভেড়ার মাংশ।

খেতে বসে মনে হলো তাচাঙ্কো যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন।

পর পর কদিন লিমার জাদুঘরে কাজ করতে গিয়ে বৃদ্ধ অধ্যাপক তাচাঙ্কোকে দেখলাম না। শরীর খারাপ করেছি নাকি? তাকে তো কখনো জাদুঘরে অনুপস্থিত থাকতে দেখিনি। জাদুঘরের কিউরেটরের ঘরে গেলাম তাচাঙ্কো সম্পর্কে খোঁজ নিতে। কিউরেটর ভদ্রলোক তাচাঙ্কোর ছাত্র।

কিউরেটর আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন,

আপনি শোনেননি? পরশু রাতে অধ্যাপক তাচাঙ্কোকে কারা যেন খুন করে গেছে। তার আলমারি ভেঙে খুনিরা অনেক জিনিশ নিয়ে গেছে।

লিমার একটি দৈনিক পত্রিকার এক কোণায় একদিন একটি খবর আমার চোখে পড়ল। পিওতর নামে এক পোলিশ অভিযাত্রী আমাজানের উজানে এক অভিযানে যেতে চায়। অভিযানের আয়োজন করে ফেলেছে। যারা এই দুর্গম পথের অভিযানে যেতে ইচ্ছুক তারা যেন অবিলম্বে তার সাথে হোটেল পাসাদ্রুয়াস-এ যোগাযোগ করে।

আমাজানের উজানে! শুনলেই অভিযানপ্রিয়দের শরীর কেমন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। খুব দুর্গম পথ। বিপজ্জনক অঞ্চল। তাচাঙ্কো বলেছিলেন এল ডোরাডোর অবস্থান সেখানেও হতে পারে।

হোটেল পাসাদ্রুয়াস-এ পিওতর এর কক্ষে যখন এলাম তখন বিকেল শেষ হয়ে আসছে। শেষ বিকেলে লিমা শহরের উঁচু বাড়িগুলোর কাঁচে বিদায়ী সূর্যের আলো চমৎকারভাবে পড়ে। মনে হয় সোনার পাতে কেউ যেন শহরটিকে মুড়ে দিয়েছে। এ দেশের প্রাচীন সভ্যতার বিশ্বাসে আছে, সূর্য কাঁদলে সোনা। তাই নগর স্থপতি এমন ভাবে শহরটির উঁচু ভবনগুলো

তৈরি করেছেন যাতে শেষবিকেলে সূর্যের আলো প্রতিফলনকে সোনার রঙ বলে মনে হয়।

পিওতর খুব প্রাণবন্ত যুবক। বেপরোয়া স্বভাব। তার স্বপ্ন রোমাঞ্চকর অভিযানে যাওয়া যায়। দেশ বিদেশের প্রকৃতি যেখানে অজানা, অচেনা রহস্য তৈরি করেছে তাকে জয় করা।

আমাজান নদী তাকে অনেক দিন ধরে আলোড়িত করেছে। পেরুর আন্দিজ পাহাড়ের উচ্চভূমি থেকে এ নদীর শুরু আর বিস্তার। এই অভিযানে পাড়ি দিতে হবে সেই প্যাডেল লাগানো ছোট নৌকায় চেপে। আমাজানের স্রোত বেয়ে যেতে হবে। এই নৌকার নাম কায়াক।

আমাজান নদীর উৎস হলো একটি বিচিত্র জায়গা। আন্দিজ পবর্তমালার পিঠ ঘেঁষে আঠারো হাজার ফুট উচ্চতায়। জায়গাটির নাম মিশমি। বরফে ঢাকা। কোথাও মাঝে মাঝে সবুজ ঝোপ উঁকি দিচ্ছে। পাথরের চাঁই ছড়ানো। ছোট একটি হ্রদ। এই উৎসব থেকে বরফের কুচি নিয়ে প্রচণ্ড গর্জন করে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে আমাজান।

অভিযান দলে আমরা মোট সাতজন। এর মাঝে দুজন সম্পর্কে আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে। তাদের স্বভাব ঠিক অভিযানকারীদের মতো নয়। নিষ্ঠুর চেহারা। এদের একজনের বাঁ গালে গভীর কাটা দাগ। কালো শকুন দলের নেতা স্পিনোর গালে একটা কাটা দাগ ছিলো বলে শুনেছি। দলের মাঝে এরা চুপচাপ থাকে। নিজেরা কেবল ফিশফাশ করে। তাদের সাথে লোহার বাক্স। কি যে আছে ওর ভেতর। পিওতর তাদের সম্পর্কে বেশি কিছু জানে না। ওরা নাকি প্রায় জোর করেই এই দলে এসেছে। পিওতর এও জানালো লোক দুটোকে তার মোটেই ভালো লাগেনি।

শুরু হলো যাত্রা। নদীর তীব্র স্রোত। চারদিকে পাথরের বিপজ্জনক অবস্থান। কায়াক এঁকেবেঁকে এগিয়ে যাচ্ছে। স্রোতের টান। পাথরের ধারালো মুখ। পথে পেরিয়ে গেলাম হরনিলম। পেছনে দেখা যাচ্ছে মিশমি পাহাড়ের চুড়ো। কখনো আমরা কায়াক থামিয়ে পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে হেঁটে যাই। ঐ লোক দুটো মাঝে মাঝে একটা কাগজ বের করে কি যেন দেখে। কি ওটা? তাচাঙ্কোর ম্যাপটা নাকি!

আমার তো সন্দেহ হচ্ছে ঐ কাটা গালের লোকটাই হলো কুখ্যাত স্পিনো।

এক সময় পৌঁছালাম একটি আগ্নেয়গিরির কাছে। চারদিকে কালো পাথর। পানি খুব ঠাণ্ডা। রাতে হাড়কাঁপানো শীত নামে। ঘাস জ্বালিয়ে

আগুন পোহাই। এদিকে মানুষজন একদম দেখা যায় না। এ স্থানের নাম আকোম্বাএবিস। নদী এখানে খাড়া ভাবে নেমে গেছে।

অনেকটা পথ পেরিয়ে দেখলাম রেড ইন্ডিয়ানদের ছোট্ট গ্রাম হুয়ায়েক। গ্রামবাসীরা শুধু বারবার জিজ্ঞেস করছে, তোমরা সোনা খুঁজতে এসেছো বুঝি?

এদিককার লোক ঘাস দিয়ে সেতু বানিয়ে নদী পারাপার করে।

পিওতর ভিডিওতে ছবি তুলছে। আমরা চাই আদিবাসীদের উৎসব দেখতে। শুনলাম সামনের কানামারাকা গ্রামে ইনকা উৎসব হবে। আমরা সে গ্রামে গিয়ে উৎসব দেখলাম। চারাঙ্গো নামের পোশাক পরা একটি মেয়ে বিচিত্র একটা বাদ্যযন্ত্র বাজাল। ভূতুড়ে মুখোশ আচ্ছা গিয়ে নাচলো কিছু মানুষ।

আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। নির্জন পথ। কোনো গাছপালা নেই। লম্বা ঘাস। এবড়োখেবড়ো পাথর। হঠাৎ এক জায়গায় বিরাট এক ঘাসের সেতু। জায়গাটার নাম ইয়াউরি। সেতুটা দেখে কাটা গালের লোকটা চাপা চিৎকার করে উঠল। পকেট থেকে কাগজটা দেখে কি যেন মেলালো। পিওতর জানাল, এই ঘাসের সেতু দিয়ে ষোড়শ শতকে পিঁজারো তার বাহিনী আর ঘোড়া নিয়ে পার হয়েছিল। পিঁজারো এসেছিল এল ডোরাডোর সন্ধানে।

সন্ধ্যেবেলায় তাঁবু খাটিয়েছি নদীর তীরে। চাঁদ উঠেছে। উঁচু পাহাড়গুলোকে কি রকম রহস্যময় লাগছে। গ্রামের হাট থেকে কেনা বুনো আনাজ সেদ্ধ হচ্ছে। শালগমের মতো তরকারি। ঝাঁঝালো গন্ধ আছে।

ঐ লোক দুজনের মাঝে আমি কেমন একটা চাপা অস্থিরতা লক্ষ্য করলাম।

কাটা গালের লোকটা একবার পিওতরকে জিজ্ঞেস করলো, পিল্লিপেন্টে জায়গা কাছে কিনা।

পিওতর দূরের পাহাড়ের গিরিখাত দেখিয়ে বললো, ওদিকে পিল্লিপিন্টো।

ভোরবেলায় পিওতর জানালো, আমাদের দলের সেই লোক দুজন নেই। তারা রাতে চলে গেছে।

আমি বললাম, কাটা গালের ঐ লোকটা হলো কুখ্যাত অপরাধী স্পিনো। সে আর তার সঙ্গী গেছে এল ডোরাডোর খোঁজে।

পিওতর বলল, বড্ড বিপজ্জনক ঐ গিরিখাত। একটু ফসকে গেলেই অবধারিত মৃত্যু। শুনেছি এ পথে যারা যায় তারা আর ফিরে আসে না।

আমাদের কায়াক আবার ভাসলো। আটলায়া নামে একটি জায়গায় দুজন জেলের সাথে দেখা। পাথরের চাঁইতে দাঁড়িয়ে মাছ ধরছে। আমাদের দেখে জানালো, দূরের নদীতে তারা দুটো ক্ষত-বিক্ষত লাশ ভেসে যেতে দেখেছে।

হঠাৎ পিওতর চেঁচিয়ে বলল,

দেখ, কেউ যেন এদিকে আসছে।

সামনে পাথরের বাঁক থেকে এক লালমুখো সাহেব বেরিয়ে এলো। সাহেব যেন আমাদের দেখে বেশ অবাক হয়েছে। ঐ দুর্গম অঞ্চলে পৌঁছান খুব কষ্টসাধ্য। আমি সাহেবকে চিনতে পারলাম। রেইনহার্ড। প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধানকারী। ইনকা সভ্যতা নিয়ে কাজ করছেন। আমার প্রকাশক বলেছিল তার কথা। রেইনহার্ডের ছবি দেখেছি ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফি পত্রিকায়। কিন্তু এখানে কি করছেন রেইনহার্ড? এই আমাজানের উজানে?

তার কাছে গিয়ে আমি নিজের পরিচয় দিলাম। ইনকাদের ওপর আমার বই বেরুচ্ছে জেনে খুশি হলেন।

আপনি এখানে কি করছেন রেইনহার্ড।

দূরের পাহাড়টার দিকে আঙুল দিয়ে বললেন,

আমি যাবো ঐ এস্পাটো পাহাড়ে। আমার ধারণা ওখানে ইনকা সভ্যতার কিছু নিদর্শন হয়তো পাওয়া যাবে।

রেইনহার্ডের কথা শুনে আমার ভেতরে চাঞ্চল্য এলো। আমি এ যাত্রায় তার সঙ্গী হতে চাইলাম। এরকম দুর্গম পথে আমার হয়তো আর সহজে আসা হবে না। সুযোগ সব সময় আসে না। আমার মতো একজনকে সঙ্গী পেয়ে খুশি হলো রেইনহার্ড। তার দলের বাকি দুজন রয়েছে সামনের ক্যাম্পে।

আমি পিওতরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। এই দুঃসাহসী পোলিশ যুবকের উৎসাহ না পেলে আমার এখানে আসা হতো না।

পিওতর বলল, তোমাদের অভিযান সার্থক হোক। কামনা করি তোমরা এমন কিছু পাও যাতে ইনকা সভ্যতার রহস্য কিছু ভেদ হয়।

পিওতর আর দলের অন্যরা তরতর করে কায়াক ভাসিয়ে চলে গেল। নদীর স্রোতের কলকল শব্দ। সূর্যের আলো ঝিকিয়ে উঠছে। আমি রেইনহার্ডের সাথে ক্যাম্পের দিকে হাঁটা শুরু করলাম।

এক সময় এম্পাটো পাহাড়ে এক ব্যাপক অগ্নুৎপাত ঘটে। তখন গরম লাভা পাহাড়ের চূড়ায় পাঁচশো বছর ধরে জমে থাকা সমস্ত বরফ গলিয়ে দেয়। এই বরফ গলে যাওয়ার পর পুরো এলাকাটা পরিষ্কার হয়ে যায়।

গত কদিন ধরে আমরা হেঁটে উপরে উঠছি। প্রায় ২৭ হাজার ফুট উঁচুতে উঠেছি। হঠাৎ পাহাড়ের ঢালের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠেন রেইনহার্ড, দেখ, দেখ, ওখানে কি যেন দেখা যাচ্ছে।

আমরা তাকিয়ে দেখি বরফের ভেতর থেকে একগুচ্ছ পাখির পালক যেন উঁকি দিচ্ছে।

সেদিকে দৌড়ে গেলেন রেইনহার্ড। বরফের ওপর পালক ঢাকা একটা মুকুট। সামনে যেতেই দেখা গেল মুকুট মাথায় একটি মূর্তি। তার দু পাশে আরো দুটি মূর্তি বসা।

রেইনহার্ড কাছে গিয়ে আনন্দে চিৎকার করে ওঠেন। উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, পেয়েছি। এগুলো হলো কিশোরী মেয়েদের মমি।

ঠাণ্ডা পাহাড়ি রাজ্যে কি জীবন্ত দেখাচ্ছে মমিগুলো। রেশমী চুল। উঁচু চোয়াল। গায়ে ধূসর রঙের পশমের জামা।

এরাই হলো গিয়ে সেই দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করা মেয়েরা। যাদের সম্পর্কে এতোদিন শুধু ধারণাই করা হয়েছে। এই সব নিরাপরাধ মেয়েদের ইনকা পুরোহিতেরা পর্বত দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য হত্যা করত। বলি দিত।

কি নিষ্ঠুর আচার। আমার মনে পড়ল ইনকা সভ্যতার এক অধ্যায়ের কথা। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইনকার মহান শাসক পাচাকুতি নির্মাণ করেছিলেন মাচ্চুপিচ্চু শহরটি। সেখানে সূর্য দেবতার কুমারী দাসীবৃন্দেরা ছিল।

কারা ছিল এই দাসী?

রেইনহার্ড আর তার সঙ্গীরা মমিগুলোকে সযত্নে উদ্ধার করেছেন। হু হু করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ি উপত্যকা। কত উঁচুতে আমরা। রেইনহার্ড প্রচণ্ড উত্তেজিত।

এরা হলো স্বর্গের রথে ইনকা কিশোরী। আমার প্রত্নতাত্ত্বিক জীবনের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার এটা। এতে ইনকা সভ্যতার অনেক অজানা ইতিহাস উন্মোচিত হবে।

আমরা তাকিয়ে রয়েছি হিমে জমা ইনকা মেয়েগুলোর দিকে। চার, পাঁচশো বছর পরেও অবিকল রয়ে গেছে। প্রচণ্ড শীতের জন্যে মোটেই নষ্ট হয়নি।

এই মমিগুলো ইনকা সভ্যতার ধর্মীয় আচার উপচারে সাক্ষ্য বহন করছে। এ থেকে জানা যাবে তখনকার ইনকাকালের ইতিহাস। ইনকা সময়ের লোকেরা লিখতে জানত না বলে নিজেদের সম্পর্কে কিছু লিখে যায়নি। পরে যখন স্পেনীয়রা লাতিন আমেরিকায় আগ্রাসন চালিয়েছে তখনো তারা ইনকা সভ্যতার কিছুই সংরক্ষণ করার চেষ্টা করেনি। বরং ধ্বংস করেছ। এই ইনকা সভ্যতাটি আধুনিক পৃথিবীর কাছে অজানা রয়ে যায়।

এই মমিকে বলা হতো জওনি। মেয়েদের শরীরে তিন স্তর করে মাটির গহনা আর শরীরে গোলাপি জামা পরানো হয়। মেয়েগুলোর চোখেমুখে এক ধরনের প্রশান্তির চিহ্ন। অথচ এদের নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হয়েছে।

তবে কি স্বেচ্ছায় এরা পর্বত দেবতার উদ্দেশে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে? তাই চোখেমুখে কোনো উদ্বেগের ছাপ নেই?

রেইনহার্ড জানালেন, আসলে এই কিশোরীদের দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করার আগে প্রচুর পরিমাণে চিচা নামের এক ধরনের বুনো ফল জোর করে খাইয়ে দেয়া হতো। এই ফল খেলে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় মানুষ। তখন পুরোহিতেরা তাদের পাহাড়ের চুড়োয় বরফের গুহাতে রেখে আসত। এক সময় প্রচণ্ড হিমে জমাট বেঁধে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত।

এদের উৎসর্গ করার সময় আবার সম্মান জানানো হতো। দেয়া হতো লাল গালিচার সম্মান। উপাসনালয়ের বেদী থেকে সমাধি পর্যন্ত সুন্দর ঘাস বিছানো হতো। ঐ ঘাসের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেত কিশোরীরা। তারপর ঐ হতভাগ্য মেয়েগুলোর উপর জমত বরফের স্তর।

আমি দেখলাম রেইনহার্ডের চোখের কোণায় চিকচিক করছে পানি। প্রায় পাঁচশ বছর আগে ইনকা কিশোরীদের জন্যে আমাদের তখন প্রচণ্ড দুঃখ হলো।

পাখির পালক তাদের চিনিয়ে দিয়েছিল।

ফরাশগঞ্জের পুরানো বাড়ির চিলেকোঠার ঘরে বসে তখন মনে হলো আমাদেরও বুকের ভেতরটা বুঝি টলটল করছে আন্দিজের কিশোরীদের জন্যে।



ধীরাশ্রমের সেই লোক

কোত্থেকে যে কী হয় কেউ তা বলতে পারে না। নইলে এই আমি যে ঢাকার একটা এঁদো গলিতে থেকে স্যাঁতস্যাঁতে দিনগুলোকে কাটিয়ে দিচ্ছে এক ঝাঁঝাঁ রোদ্দুরমাখা ভরদুপুর কেনই বা ট্রেন থেকে হুট করে ধীরাশ্রম নামের সেই ছোট্ট স্টেশনটায় নেমে পড়বো। অবাক করা সেই লোকটার সাথে।

কয়েকটা জংলা ঘুঘু একটানা ডাকছিল। ধীরাশ্রম স্টেশনের সামনের কড়ুই গাছটার নিচে আমি দাঁড়িয়ে। সাথে সেই লোকটা। ট্রেনে যার সঙ্গে আলাপ। কী অদ্ভুত চাউনি তার। আমি যখন জানালার পাশে বসে ট্রেনের ঝাঁকুনিতে ঢুলছিলাম তখন কানের কাছে মুখ এনে সেই লোকটা কেমন ফিসফিস, যেন রহস্যময়, কেমন গা ছমছম করা গলায় বলল, এই খোকা, বাওবাব গাছের পাতায় ছাওয়া বাড়ি দেখেছ কখনও আর সিংহের ল্যাজ?

আমি চোখ বড় বড় করে তাকালাম লোকটার দিকে। বলে কি? বাওবাবা পাতার বাড়ি! সিংহের ল্যাজ! এ্যাঁ!

লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

ওমা, অবাক হলে যে। জান, আমি আফ্রিকায় অনেকদিন ছিলাম। মোম্বাসা শহরে আমার ওক কাঠের ছড়িটা ফেলে এসেছি। জান খোকা, সেই ছড়িয়ে ভেতরে ফাঁপা জায়গা রয়েছে। আর তার ভেতরে লুকানো আছে এখনও একটা ম্যাপ।

ম্যাপ! কিসের?

আমি শুধু পর পর অবাকই হয়ে চলেছি।

ধ্যুস, তুমি আস্ত বোকা, হাঁদারাম। উজবুক। ঠিক বান্টু সর্দারের মতো। ওর জন্যই তো শিম্বু পাহাড়ের গুপ্তধনটা পেয়েও পেলাম না। সে ম্যাচটা হচ্ছে গুপ্তধনের। শিম্বু পাহাড়ের উত্তর দক্ষিণ কোণার পাঁচটা বাওবাব গাছের পরের নীল পাথুরে গুহাটার ভেতরে রয়েছে মাটির নিচে যাবার সুড়ঙ্গ। আর সেই সুড়ঙ্গের পরেই তো আছে বান্টুর পূর্বপুরুষদের অগাধ গুপ্তধন। বুঝলে খোকা!

আমার সবই ঠিক ছিল। প্ল্যানমতো এগোচ্ছিলাম। কিন্তু ওই বুদ্ধু বান্টু সর্দারটাই তো সব কিছু ভেস্তে দিল। ব্যাটা এমন ভীতু বলে কিনা শিম্বু পাহাড়ের অপদেবতার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে আমরা পুড়ে ছাই হয়ে যাব। উফ, কী ভুলটাই যে তখন করেছি। যদি গুপ্তধনটা পেয়ে যেতাম তাহলে... তাহলে...

লোকটার চোখ দুটো চকচকিয়ে উঠল নতুন আধুলির মতো। আর আমি সেই ছেঁড়া জামাপনা, মুখভর্তি খোঁচা দাড়ির লোকটার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলাম। ট্রেন সাঁ সাঁ করে ছুটে চলেছে। কামরায় খুব বেশি লোক নেই। আমার মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছিল।

এখন যদি একবার মোম্বাসা যেতে পারি কোনোমতে, তবে... তবে গুপ্তধনটা পেতে আমার আর কোনো বাঁধা নেই। এই খোকা, তোমার কাছে একটা টাকা আছে, দাও তো চমচম খাব।

ট্রেনটা টঙ্গীতে থেকেছে তখন। আমি ভয়ে ভয়ে পকেট থেকে একটা টাকা দিলাম লোকটার হাতে। আর লোকটা চমচম কিনে গপাগপ করে খেতে লাগল আমার সামনেই। খেতে খেতেই বলল, দূর, এখানকার মিষ্টি এক্কেবারে বাজে। মিষ্টি বানাতো বটে পাপুয়া দ্বীপের মারুতি বুড়ি। কী এক রকম হলদে পাখির বাসা ভেজে এমন চমৎকার খাবার বানাতে পারত সেই বুড়িটা! আহা, তার স্বাদ এখনও লেগে রয়েছে মুখে। বলে লোকটা চমচমটাকে টপ করে ফেলল।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে তখন।

এই খোকা শুনছ বলে লোকটা আমার পেটে খোঁচা মারল। ধীরাশ্রম আমার বাড়ি। জান, সেখানে আমি দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছি সিংহের ল্যাজ আর সবুজ হরিণের চামড়া যাবে দেখতে?

আমার ভয় হলো। মনে হলো এ লোকটা এত সব জানে। এত অদ্ভুত রকমের কথা বলে। এর সাথে না গেলে আমার হয়তো কোনো একটা সাংঘাতিক বিপদ ঘটিয়ে দিতে পারে। আমি কুঁকড়ে গিয়ে বললাম, যাব।

তারপর ধীরাশ্রম নেমে সেই কড়ুই গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে আছি। কয়েকটা জংলা ঘুঘু ডাকছে। হঠাৎ সামনের চা দোকান থেকে কয়েকজন লোক বেরিয়ে এসে আমার সাথের লোকটাকে দেখে বলল, এই যে হাসু পাগলা।

সেই লোকটা, সেই আমাকে অবাক করে দেয়া লোকটা যে শিম্বু পাহাড়ের গুপ্তধনের স্বপ্ন দেখছে এখনও হঠাৎ করে সেই লোকটা দুটো ডিগবাজি খেয়ে হাসতে হাসতে দৌড়াল।

আমি তখন ঘাবড়ে গিয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি?

লোকটা বলল, আরে ও হচ্ছে হাসু পাগলা। স্কুলে ভালো ছাত্র ছিল। যতসব বাজে বই পড়ে মাথাটা একদম বিগড়ে গেছে। কিসব আফরিকা টাফরিকার জঙ্গলের কথা বলে। বলে ছেলেদের মাথা গরম করে দেয়। আপনাকে বুঝি এসব বলছিল।

পাগল সাহেব, ও আস্ত পাগল। ওর পাল্লাতে পড়েই বোধ হয় আপনাকে এ স্টেশনে নামতে হলো। তা যাবেন কোথায়?

কাঁদো কাঁদো মুখে বললাম, ময়মনসিংহ।

ঠিক আছে, সন্ধ্যেবেলায় একটা লোকাল ট্রেন আছে। কোনোমতে বসে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিন সময়টা। এই ছোঁড়া, সাহেবকে এক কাপ চা দিয়ে যা, সাথে দুটো লাঠি বিস্কিটও দিস।



পাখির মৃত্যু

বিয়ে বাড়িটিকে সাজানো হয়েছে রঙিন আলোর মালায়। চারদিক ঝলমল করছে। আলোর রোশনাই দূর করেছে পাহাড়তলির জমাট বাঁধা অন্ধকার। ভোজসভার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে অতিথিরা। বাতাসে ভাসছে সুঘ্রাণ।

বিয়ে বাড়িটির পাশেই একটা প্রাচীন ওক কাঠের গীর্জা। তার সামনে একটি পাথরের বড় বেদিতে একজন বুড়ো নাবিককে বসে থাকতে দেখা গেলো। নাবিকের মুখের চামড়া কোঁচকানো। ধূসর রঙের দাড়ি। বিয়ে বাড়ির অতিথিরা যাচ্ছে তার সামনে দিয়ে। বাতাসে ফুলের গন্ধ। বুড়ো নাবিক তাদের দেখছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। তার চাউনি কেমন অস্বাভাবিক।

হঠাৎ সে একজন অতিথির হাত খপ করে ধরলো। চমকে গেলেন অতিথি। নাবিক ফিসফিস করে বলতে লাগলো, একটি জাহাজ ছিলো... বুঝতে পেরেছেন... গভীর সমুদ্রে একটি জাহাজ।

ততক্ষণে ভোজ শুরু হয়ে গেছে। অতিথি সেখানে যেতে পারছে না। বুড়ো নাবিকের কাহিনি তাকে বুঝি খানিকটা মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছে। নাবিকের চোখে মুখে উত্তেজনা। সে বলতে শুরু করলো তার শেষ সমুদ্র যাত্রার কাহিনি।

বুঝলেন, আমাদের জাহাজটি তখন পাল তুলে দিয়েছে। বাতাসে ফুলে উঠেছে পাল, জাহাজ তরতর করে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলেছে। এভাবে একটানা যাত্রা। এক সময় আমরা এলাম ধূসর সমুদ্রে। হিমশীতল

কণকণে পরিবেশ। সমুদ্রের পানি জমে বরফের চাঁই হয়ে গিয়েছে। চারদিকে জাহাজের বড় শাদা পাল খুলে গিয়েছিলো। ঝোড়ো বাতাসের টানে জাহাজ ছুটে যাচ্ছে। চারদিকে কেমন গা ছমছমে অদ্ভুত এক পরিবেশ। কোনো জলজ প্রাণীকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আকাশেও কোনো পাখি নেই এ ভাবেই ধূসর হিমশীলত জলরাশি ভেঙ্গে জাহাজ এগিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু একদিনে নাবিকেরা আকাশে একটি অ্যালবাট্রোস পাখিকে দেখতে পেলো। বিশাল ডানা ছড়িয়ে পাখিটা উড়ে চলেছে। এই পাখিদের নিয়ে নাবিকদের মাঝে অনেক কাহিনি শোনা যায়। নাবিকেরা বিশ্বাস করে এই পাখি সমুদ্রে সৌভাগ্য বহন করে নিয়ে আসে। অ্যালবাট্রোস হলো সৌভাগ্যের প্রতীক। তাই পাখিটিকে দেখেই জাহাজের জন্যে খাবার নিয়ে এলো। আকাশে পাখি পোষ মানলো। যখনি নাবিকেরা ডাকতো তখনি আসতো পাখিটা। একদিন কি যে হলো আমার মাথায় শয়তান বুঝি এসে ভর করলো। আমি গুলি করে পাখিটাকে মেরে ফেললাম। জাহাজের বাকি লোকেরা কেমন আতঙ্কিত হয়ে পড়লো। তারা বলাবলি করছিলো আমি একটি ভয়াবহ পাপ কাজ করে ফেলেছি। মহা অন্যায় করেছি। যে পাখি হলো গিয়ে সৌভাগ্যের প্রতীক আমি তাকে অযথা হত্যা করেছি। যে পাখি বাতাসে প্রবাহিত করছিলো আমি তাকে নিষ্ঠুর ভাবে মেরে ফেলেছি। আমি নাবিকদের জীবনে অমঙ্গল নিয়ে এসেছি। এখন জাহাজটিতে দুর্ভাগ্যের সূচনা হবে।

নাবিকেরা ঠিকই বলেছিলো। তাদের অনুমান সঠিক। আমি সত্যিই প্রচণ্ড অন্যায় করেছিলাম। ঐ পাপের ফল চরম ভাবে ভোগ করতে হয়েছিলো আমাদের সবাইকে।

আমাদের জাহাজটি এভাবে চলতে চলতে হিমশীতল সমুদ্র পেরিয়ে আর একটু সাগরে গিয়ে পড়লো। সেই সাগর ছিলো উষ্ণ। মাথার উপর আগুন ঝরানো সূর্য। বাতাস স্তব্ধ। জাহাজ আর এগিয়ে যেতে পারছে না। এভাবে কাটছে দিনের পর দিন। নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে একই স্থানে রয়ে গেলাম। পানে বাতাসে নেই। প্রচণ্ড উত্তাপ। পরিবেশ অসহ্য হয়ে উঠলো।

সূর্যের উত্তাপ শুধু বাড়ছেই। আকাশে এক টুকরো মেঘ নেই। তামাটে গনগনে আকাশ। আমাদের সঞ্চিত পানি ফুরিয়ে গেলো। চারদিকে এতো পানি। কিন্তু সে পানি লোনা। তার এক ফোঁটাও খাবার উপায় নেই।

বাকি নাবিকেরা তখন আমার উপরে রেগে গেলো। তারা ভাবলো অ্যালবাট্রোস পাখিটিকে হত্যা করে আমি মহাপাপ করেছি। সে জন্যেই এই কঠিন শাস্তি পেতে হচ্ছে। এ হচ্ছে পাপের ফল। পিপাসায় পানি না পেয়ে তারা আমাকে অভিশাপ দিতে লাগলো। তারা এতোটাই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো যে আমার জন্যে এক অভিনব শাস্তির ব্যবস্থা করলো। মৃত পাখিটিকে আমার গলায় ঝুলিয়ে দিলো। রক্তমাখা পাখি।

কয়েকদিন পর জাহাজের লোকদের অবস্থা আরো সঙ্গিন হয়ে উঠলো। পানির অভাবে নাবিকদের বুক, গলা শুকিয়ে কাঠ। কথা বলতে তাদের ভীষণ কষ্ট হয়। চাপা গোঙানির মতো শব্দ করে। সবাই আকুল ভাবে উদ্ধারকারী জাহাজের জন্যে অপেক্ষার করে তাকিয়ে থাকে। সূর্যের প্রখর তাপে সমুদ্র থাকে ঝলসে। উষ্ণ বাতাস শরীরে ফোসকা ফেলে দেয়। প্রতীক্ষার পালা যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে।

হঠাৎ একদিন একটি জাহাজকে দেখা গেলো। সবাই জাহাজ দেখে চিৎকার করে উঠলো এবার বুঝি মুক্তি পাওয়া যাবে। জাহাজটা এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। আমরা বিস্মিত হয়ে দেখলাম সেটা কোনো সাধারণ জাহাজ নয়। সেটা ছিলো একটি রহস্যময় ছায়া জাহাজ। বাস্তবে যার কোনো অস্তিত্ব নেই। কেমন ভৌতিক ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে জাহাজটি। কোনো নাবিক নেই জাহাজে। ডেকের উপর দেখা যাচ্ছে দুজনকে। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। অস্বাভাবিক দেখতে দুজন। মেয়েটির শরীরের চামড়ার রং মৃত মানুষের মতো ফ্যাকাশে। পুরুষটি ছিলো স্বয়ং মৃত। তারা এসেছে যন্ত্রণাক্লিষ্ট নাবিকদের আত্মাগুলিকে নিতে। মৃত্যুলোকের মহা অন্ধকারে নিয়ে যাবে তারা। অশুভ সঙ্কেতের মতো তাদের দৃষ্টি। কেমন ছায়াময় হয়ে উঠলো পরিবেশ।

বুড়ো নাবিক বলতে লাগলো, আমার সঙ্গী নাবিকেরা এক এক করে মরণের কোলে ঢলে পড়তে লাগলো। ভয়ঙ্কর মৃত্যুদূত ছায়া জাহাজ আত্মাগুলি নিয়ে মৃত্যুপুরীতে চলে গেলো। শুধু বেঁচে রইলাম আমি একা।

সাতদিন ধরে আমি চেষ্টা করলাম প্রার্থনা করতে। পারলাম না। নাবিকরা আমাকে প্রচণ্ড ভৎর্সনা করতে লাগল। তখন আমি দিন রাত ছটফট করতাম। জেগে বসে থাকতে হতো। চোখের সামনে পড়ে রয়েছে পাখির মৃতদেহ। অসহ্য এক অবস্থা। আমার বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্ত যেন দূর্বিষহ হয়ে উঠলো।

শেষ পর্যন্ত বোধহয় আমার প্রতি করুণা বর্ষিত হলো। একদিন আমি অসহায় সাপগুলোর সৌন্দর্যের কথা ভাবছিলাম। সেই সাপগুলোর গায়ের রং ছিলো বিচিত্র। আমি যেন সাপগুলোকে ভালোবেসে ফেললাম। তাদের আমি আশীর্বাদ করলাম।

সাথে সাথে একটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো। মৃত অ্যালবাট্রোস পাখিটা নিজ থেকেই গলা থেকে খসে পড়ল। ঘুম... ঘুম নেমে এলো। আমি ঘুমিয়ের পড়লাম।

জেগে দেখি বৃষ্টি পড়ছে। তৃষ্ণার্ত আমি। বৃষ্টি আমাকে ভিজিয়ে দিতে লাগলো। বৃষ্টিপাতের শব্দকে তখন আমার কাছে সুমধুর সঙ্গীতের মতো মনে হচ্ছিল। শূন্যলোক থেকে দুটো স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

এই লোকটাই কি নিরীহ অ্যালবাট্রোস পাখিটিকে হত্যা করেছে?

সেই পাপের জন্যে ওর যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে।

একসময় বৃষ্টি থামলো। ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। জাহাজের পালে বাতাস লাগালো। ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো জাহাজ। শেষ পর্যন্ত নিরাপদে একটি বন্দরে এসে ভিড়লো। আমি দুর্বল। কোনোমতে বাড়ি ফিরে এলাম।

বুড়ো নাবিক বললেন, এটাই হলো আমার কাহিনী। আমি রক্ষা পেয়েছিলাম কারণ জীবিত প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা দেখিয়েছিলাম। সমুদ্রের অতি কুৎসিত সাপকেও আমি ভালোবেসে ছিলাম। আমার এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা অন্যদের কাছে বলা উচিত। আমার জীবনে এ এক দারুণ শিক্ষা।

সে জন্যই আপনাকে থামিয়ে আমার এই বিচিত্র অভিজ্ঞতাটার কথা শোনালাম। আমি শিখেছিলাম, যে ছোট বড় সব কিছুকেই ভালোবাসে সেই সবচাইতে ভালো প্রার্থনা করে।

আমার এই কাহিনী বলে, মানুষকে ভালোবাসার কথা বলে, আমি শান্তি পাই। মানুষকে আমি বলি, পৃথিবীর সবকিছুকে ভালোবাস।

বুড়ো নাবিক এ কথা বলে সামনের রাস্তা দিয়ে চলে গেলো। অতিথি অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো নাবিকের গমন পথের দিকে।

কোলরিজের কাহিনি অবলম্বনে
(ইংল্যান্ডের গল্প)



পাহাড়ে প্রেতপুরি

মাস দেড়েক ধরে টাইফয়েড জ্বরে ভুগে শয্যাশয়ী ছিলেন আর্থার ম্যাকলয়েড। নিজেকে এখন তার যথেষ্ট দুর্বল মনে হচ্ছে। শরীরের আগের মতো তেমন জোর পান না। খুব কর্মতৎপর মানুষ ছিলেন তিনি। অফিসে যতক্ষণ থাকতেন ততক্ষণ অতিরিক্ত আগ্রহে কাজ করতেন। কোনো দিন ছুটি নেবার কথা মনে হয়নি। তার কর্তব্য নিষ্ঠার কথা ফিরতো লোকের মুখে মুখে। অসুখের জন্যে এতদিন অফিসে যেতে না পারার জন্যে ম্যাকলয়েড এক ধরনের অপরাধ বোধে ভুগছেন। ডাক্তাররা তাকে জানিয়ে দিয়েছে আরো দুমাস পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে। হাওয়া বদল করা প্রয়োজন। যেতে হবে কোনো পাহাড়ি শহরে। যেখানে হ্রদ রয়েছে। হ্রদের ধারে থাকতে হবে তাকে। তবেই তার শরীরের অবসাদ ভাবটা যাবে কেটে। বিছানায় ম্যাকলয়েডকে এখন যথেষ্ট রোগপাণ্ডুর দেখায়। ডাক্তারের এ প্রস্তাবটি শুনে খুশি হয়েছে ম্যাকলয়েডের বড় কন্যা এমিলিয়া। এতোদিন তাদের বাবাকে কোনো জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যেতে পারেনি। কোথাও বেড়ানোর কথা শুনলেই চমকে উঠেছেন ম্যাকলয়েড। অফিসের কাজের অজুহাত দেখিয়েছেন। বাবার প্রতি মনে মনে রাগ ছিলো এমিলিয়ার। কাজ যেন আর কেউ করে না। এ ভাবে এক নাগাড়ে খাটুনির কোনো মানে হয়। ডাক্তারের প্রস্তাব শুনে সে চট করে দূরে যাওয়ার পরিকল্পনা করে ফেললো। পর্যটনের অফিস থেকে জোগাড় করলো তথ্য। স্কটল্যান্ডের এক নির্জন পাহাড়ি এলাকায় হ্রদ রয়েছে।

হ্রদের ধারে ছোট ছোট কুটির। সেখানে যায় স্বাস্থ্যসেবীরা। এমিলিয়া যাওয়ার আগে সবকিছু গুছিয়ে ফেললো।

ম্যাকলয়েড সাহেব বিপত্নীক। দুটি মেয়েকে নিয়ে তার সংসার। এমিলিয়া আর এথিনিয়া। এমিলিয়ার চব্বিশ বছর। এথিনিয়া তার দু বছরের ছোট।

দূরে কোথাও যাবে বলে দু বোনের খুব খুশি। ধূস, একঘেঁয়ে শহরটাকে তারা তাহলে পেছনে ফেলে যাচ্ছে। মালপত্র গোছানো হয়ে গেলো। যাচ্ছে লম্বা সময়ের জন্যে টুকটাক মেলা জিনিস গুছিয়ে নিতে হচ্ছে।

একদিন ট্রেনে উঠলো তারা। যাবে পাহাড়ি ছোট শহর রক লোভান। সেখানে রয়েছে টলটলে, স্বচ্ছ হ্রদ। তার তীরে কুটির। লোভান হ্রদের বুকে জলচর পাখিদের মেলা বসে। অপূর্ব এক স্থান ঐ হ্রদটি। নীল আকাশের মেঘের ছায়া পড়ে পরিষ্কার পানিতে। গাছের পাতা কাঁপে ঝিরঝির করে। পথের ধারে ফুটে থাকে নাম না জানা অসংখ্য বুনোফুল। ঘাসঝোপে পাখিদের বাসা। নাইটঙ্গেলদের দেখা যায় বেশি। সবচাইতে সুন্দর হচ্ছে ড্যাফোডিল ফুলে ছাওয়া প্রান্তর।

পাহাড়ি শহর লোভানে এসে ওদের মনে হলো এতো নির্জন, শান্ত পরিবেশও তাহলে পৃথিবীতে রয়েছে। মানুষজনের অহেতুক চিৎকার নেই। কোলাহল নেই। নেই গাড়িঘোড়ার শব্দ। কালো ধোঁয়া। প্রকৃতি এখানে স্নিগ্ধ, প্রসন্ন। রোদ এখানে আলতো নরোম। বাতাসে হালকা শীতের আমেজ। সমস্ত শহরে ভেসে বেড়ায় বনজ এক ধরনের গন্ধ। অল্প লোকজন এই শহরে। বেশিরভাগই বায়ু পরিবর্তনে আসা।

কখনো এথিনিয়া হ্রদের ধার ছেড়ে একটু দূরে যেতে চায়। ছোট ছোট পাহাড়। টিলার গায়ে সবুজ ঘাসের বন। রং-বেরঙের ফুল। পাহাড়ের মধ্যে বেশ কয়েকটা গুহা তার চোখে পড়েছে। গুহার ভেতরে অন্ধকার। ওদিকে কৌতূহলে তাকিয়েছে। যেতে সাহস হয়নি।

অ্যালান তাকে নিষেধ করেছে পাহাড়ে বা গুহার ওদিকে না যাওয়ার জন্যে। অ্যালান ছেলেটি আসে খয়েরি রঙের একটি ঘোড়ায় চেপে। দূরের এক গ্রাম থেকে আনে দুধ, ডিম আর তাজা সবজি। কখনো আনে গাছপাকা ফল। এগুলো বিক্রি করাই তার পেশা। হ্রদের তীরে ঘুরে ঘুরে সে এসব বিক্রি করে। অ্যালান এথিনিয়ার সাবধান করে দিয়েছে পাহাড়ি

গুহার দিকে না যাওয়ার জন্যে। অথচ এথিনিয়ার ওদিকে তাকিয়ে কেন জানি মনে হতো, বনপাহাড়ের গাছগুলো তাকে বুঝি ডাকছে। সবুজ পাতা, রঙিন ফুল, ডালপালা দুলে দুলে বলছে এসো, এসো। এথিনিয়া কখনো সাহস করে পাহাড়ে যেতো। কিন্তু গুহার দিকে যেতো না। গুহার ভেতরে কেমন থিকথিকে অন্ধকার।

এক সকালে অথিনিয়া বসেছিল হ্রদের পাশে। মিষ্টি বাতাস বইছে। জলচর পাখিরা উড়ে উড়ে শরবনে নামছে। হঠাৎ তার চোখ পড়লো জঙ্গলের দিকে। আশ্চর্য, কি প্রবল রঙের স্পর্শ লেগেছে সেখানে। মনে হচ্ছে সমস্ত পাহাড়ে কে যেন লাল রঙের মস্ত এক গালিচা বিছিয়ে দিয়েছে। পাতাগুলো ফুলগুলো তাকে ডাকছে। এথিনিয়ার মন সেখানে যাবার জন্যে আকুল হয়ে উঠলো। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে এগিয়ে চললো সে পাহাড়ের দিকে। ছোট ছোট টিলাগুলো পেরিয়ে গেলো। তাকে যেন তীব্র ভাবে টানছে জায়গাটা। আচমকা থেমে পড়তে হলো তাকে। সামনে উঠে গেছে খাড়া পাহাড়। সেই পাহাড়ের নিচে একটি গুহা দেখা যাচ্ছে। গুহার ভেতরটা তেমন অন্ধকার না। উল্টো দিক থেকে প্রচুর আলো এসে পড়েছে। এটা যেন একটি গুহাপথ। অ্যালানের সাবধান বাণী তার আর মনে রইলো না। এথিনিয়ার মনে প্রচণ্ড কৌতূহল জাগলো। গুহার ওপাশে বোধহয় অনেক সুন্দর দৃশ্য রয়েছে। এথিনিয়া কি এক আকর্ষণে ঢুকে পড়লো গুহাপথে। কিছুটা এগিয়ে যেতেই শেষ হয়ে এলো পথটা। গুহার অন্য পাশে দেখলো সুন্দর একটি সাজানো বাগান। সেই বাগানের শেষ প্রান্তে সুন্দর, ছোট একটি বাড়ি। নতুন বাড়ি। ঝকঝক করছে। আশ্চর্য, পাহাড়ের আড়ালে এতো সুন্দর একটি বাড়ি রয়েছে। এ যে ভাবাই যায় না। অ্যালান কখনো তাদের এ খরব দেয়নি।

এই নির্জন এলাকায় কার এতো সুন্দর বাড়ি? কে এতো শখ করে পাহাড়ের ওপরে বানিয়েছে বাড়িটি। হঠাৎ এথিনিয়া কাছে এসে দাঁড়ালেন।

সুপ্রভাত, আপনারা কি এখানে বেড়াতে এসেছেন?

হ্যাঁ। দিন পনের হলো এসেছি। উঠেছি ১৩ নং ভিলাতে। এদিকে আর কখনো আসিনি।

আপনারা রোজ হ্রদের ধারে বেড়াতে যান। আমার পক্ষে কোথাও যাবার উপায় নেই। ঘরে আমার স্বামী খুব অসুস্থ।

আপনারাও তাহলে আমাদের মতো হাওয়া বদলের জন্যে এসেছেন?

না। আমরা হলাম এখানকার বাসিন্দা। এই যে বাড়িটা দেখছেন এটা আমাদের। আমার স্বামী ছিলেন সেনাবাহিনীর বড় অফিসার। যুদ্ধে গিয়ে একবার প্রচণ্ড আঘাত পান তিনি। বাঁচার কোনো আশা ছিলো না। তার স্নায়ুকোষগুলো যথেষ্ট দুর্বল হয়ে গেলো। ডাক্তাররা বললেন, কামানের প্রচণ্ড শব্দে তার মাথার শিরাগুলো খুব বেশি রকমের জখম হয়েছে। তাকে সুস্থ রাখার পথ হলো খুব নিরিবিলি একটি জায়গায় গিয়ে বাস করা। তাই এখানে এসে বাড়ি করেছি। জায়গাটা আসলেই যথেষ্ট নির্জন।

এথিনিয়ার মনটা দুঃখে ভরে গেলো। কে জানতো, এই হাসিখুশি মহিলার জীবনে এতো চাপা দুঃখ রয়েছে। ভদ্রমহিলা তখনো তাকিয়ে রয়েছেন এথিনিয়ার দিকে।

দেখুন তো, আমাদের পরিচয়টাই এতোক্ষণ হয়নি। আমার নাম এমা। কর্ণেল ভগানের স্ত্রী।

আমি এথিনিয়া ম্যাকলয়েড। আপনার নামের সাথে আমার দিদির নামের মিল রয়েছে। দিদি এমিলিয়া। এমা বলে ডাকি।

তাই, তাহলে তো আমি আপনার দিদি হয়ে গেলাম। চলুন, আমাদের বাড়ির ভেতরে। ভদ্রমহিলার চমৎকার ব্যবহার এমিলিয়াকে মুগ্ধ করেছে। মহিলা বাগানের গেট খুলে দিলেন। এথিনিয়াকে ভেতরে যেতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। বাগান বাড়িটি কি সুন্দর। এথিনিয়ার তখন মনে পড়লো বড় বোন এমিলিয়ার সাবধান বাণী। কোনো অপরিচিত মানুষ ডাকলে তাদের বাড়িতে যেয়ো না। এই মহিলা তার কাছে অজানা। এভাবে তাদের এই নির্জন বাড়িতে যাওয়াটা মোটেই ঠিক হবে না।

এথিনিয়া বললো,

আজ থাক। বাড়ি থেকে অনেকক্ষণ হলো বেরিয়েছি। দিদি হয়তো চিন্তা করছে। কাল বাড়িতে বলে আসবো।

একথা শুনে যে ভদ্রমহিলার মুখটা কেমন রক্তশূন্য হয়ে গেলো। গভীর হতাশার ছাপ পড়লো যেন। হঠাৎ এথিনিয়ার চোখ পড়লো বাড়িটির ওপর। দোতলার সবগুলো জানালা খোলা ছিলো। শুধু একটি জানালার পাল্লা ভেজান ছিলো। সেই আধবন্ধ জানালার দিকে চোখ গেলো এথিনিয়ার। কেন যেন তীব্রভাবে তাকে আকর্ষণ করছে জানালাটা। সেদিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড রকমের চমকে গেলো এথিনিয়া। ওখানে একটি

বীভৎস মুখকে দেখা যাচ্ছে। কি ভয়ঙ্কর, কদাকার দেখতে মুখটি। চোখ দুটো জ্বলছে। ঝাঁকড়া লাল চুল। চোখ দুটো পিশাচের মতো ধকধক করছে। সেই ভয়ঙ্কর দৃষ্টি যেন আগুনের শিখার মতো ছুটে এসে তার বুকে জ্বলুনি সৃষ্টি করলো। এথিনিয়া হাত দিয়ে বুকটা চেপে ধরলো। ছোটবেলা থেকেই এথিনিয়ার গলায় ঝুলতো একটি রুপোর হার। হারের মাঝে একটি ক্রুশ। এথিনিয়া চেপে ধরলো ক্রুশটাকে। তখন জ্বলুনিটা যেন ধীরে ধীরে কমে এলো। এথিনিয়া তাকিয়েছিলো জানালার দিকে। সে ভদ্রমহি-লার মুখের পরিবর্তনগুলো দেখেনি। জানালার পাশে সেই বীভৎস মুখটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। এথিনিয়ার মাথাটা টলছে। শরীরটা অসুস্থ মনে হচ্ছে। সে ছুটে যেতে চাইলো। কোনোমতে গুহাপথটা পেরুলো। হঠাৎ তার মনে হলো ভদ্র মহিলাকে বিদায় জানিয়ে আসা হয়নি। কি ভাববেন তিনি। এথিনিয়া তখন পেছন ফিরে চাইলো। চরম বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলো সে। এদিকে, তার সামনে তখন কোনো কিছু নেই। ফুল বাগান নেই। ভদ্রমহিলা নেই। সেই সুন্দর বাড়িটাও নেই। সব কিছু যেন ভৌতিক ভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সামনে উঁচু-নিচু পাথরে ভরা খোলা প্রান্তর। শেষে একটি শ্যাওলা ধরা ইটের স্তূপ। এথিনিয়া তখন জ্ঞান হারিয়ে সেখানে লুটিয়ে পড়লো।

সন্ধ্যার পরও এথিনিয়াকে বাড়ি ফিরে আসতে না দেখে সবাই অস্থির হয়ে পড়লো। ম্যাকলয়েড সাহেব উন্মাদের মতো মেয়েকে খুঁজছেন। এমিলিয়া হ্রদের বুকে তোলপাড় তুলে জেলে ডিঙ্গি নামালো। সারা রাত খোঁজ হলো এথিনিয়াকে। ভোরবেলা অ্যালান এলো দূরের গ্রাম থেকে খয়েরি ঘোড়ায় চেপে। সব শুনে সে বললো,

প্রেত ভিলাতে আবার যায়নি তো?

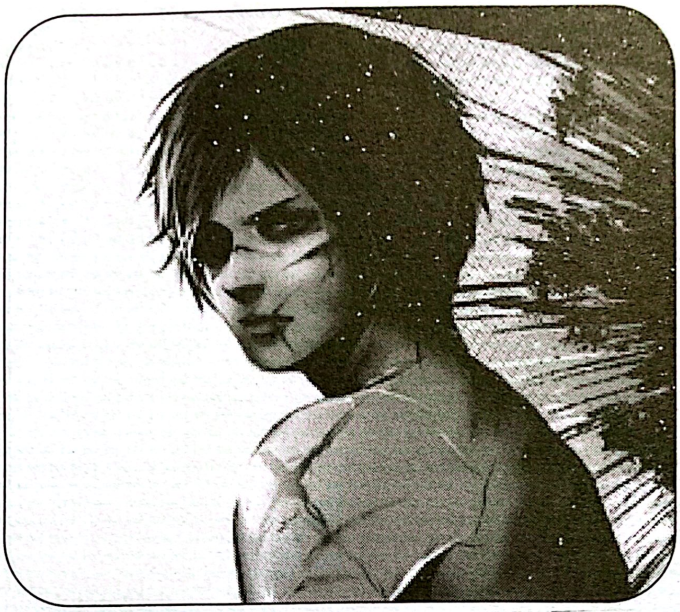
প্রেত ভিলা কোথায়?

অ্যালান তখন তাদের পাহাড়ি পথ ধরে নিয়ে গেলো সেই গুহার মুখে। সেখানেই ঘাসঝোপে পাওয়া গেলো মূর্ছিতা এথিনিয়াকে। সারা রাতের শিশির ভিজে রয়েছে। ফ্যাকাশে চেহারা। যেন প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে। প্রচণ্ড জ্বরে তার শরীর পুড়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে প্রলাপ বকছে, উঃ আমি আর সহ্য করতে পারছি না। কি ভয়ঙ্কর চোখ। আগুন। এথিনিয়াকে নিয়ে আসা হলো কুটিরে। অ্যালানের কাছে শোনা গেলো সেই গা ছমছমে কাহিনি।

: ঐ যে সেখানে দূরে একটি ঢিবি দেখেছিলেন ওটাই ছিলো প্রেত ভিলা। এক সময়টা ছিলো কর্ণেল ভগানের বাড়ি। কি যে নিষ্ঠুর স্বভাবের ছিলো লোকটা। একেবারে নরকের কীট। পাপিষ্ঠ। কোনো সদগুণ ছিলো না তার মাঝে। প্রচণ্ড অত্যাচারী। কোনো একটি যুদ্ধে জয়লাভ করে ক্ষমতার প্রবল দম্ভে সে উন্মাদের মতো আচরণ শুরু করলো। শেষ জীবনে এই পাহাড়ি এলাকায় এসে ভিলা করলো। মারা গেলো এক দুর্ঘটনায়। হ্রদের ধারে তার দগ্ধ লাশ পাওয়া গেলো। বজ্রাঘাতে তার মৃত্যু হয়েছিলো। তারপর প্রেত হয়ে সে রয়ে গেছে তার ভিলাতে। তার স্ত্রীও হয়েছে পেতনি। এখানকার পুরানো বাসিন্দারা এসব জানে। কেউ ভয়ে এদিকে আসে না। কর্ণেল ভগান মারা গেছে প্রায় দুশো বছর আগে। সেই থেকে বহু মানুষ ওদের পাল্লায় পড়ে মারা গেছে। ঐ বাড়ির মধ্যে ঢুকলে আর রক্ষা নেই। প্রেতপুরী ওটা। এথিনিয়ার বুকের ক্রুশটা তাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করেছে।

মি. ম্যাকলয়েড ঠিক করলেন তখনি ঐ অভিশপ্ত অঞ্চলটি ছেড়ে চলে যাবেন। তিনি স্টেশনে ছুটলেন টিকিট কাটার জন্যে।

-ইংল্যান্ডের গল্প



রুকুর বন্ধু

মাঝ রাতের হু হু বাতাস বয়ে যাচ্ছে শহরতলির দিঘল কাঠবাদাম আর শিরিষ গাছগুলো কাঁপিয়ে। শুকনো খসা পাতা উড়ছে পাক খেয়ে। আকাশ দিয়ে ভি-এর মতো করে তখন উড়ে যাচ্ছিল যাযাবর পাখিদের একটি দল। তাদের ডানা বাতাস কেটে চলেছে। শব্দ উঠছে শিসের মতো। হঠাৎ দল থেকে একটি পাখি যেন ছিটকে গেল। পাখিটা ডাইভ দিয়ে বাঁ দিকে খানিক নেমে একটি ফ্লাট বাড়ির উপর চক্কর মেরে উড়তে লাগল।

ঠিক ওই সময় হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেল রুকুর। তার সমস্ত শরীরে চিনচিন করছে তীব্র ব্যথা। মনে হচ্ছে শিরার ভেতর দিয়ে বুঝি আগুনের ফুলকি ভেসে বেড়াচ্ছে।

গত মাসের অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকে রুকু বিছানায় শোয়া। তার বাঁ পায়ের গোড়ালির হাড় ভেঙে গেছে। প্লাস্টার লাগানো। তীব্র ব্যথার নীল স্রোতটা যেন ওখান থেকেই পাক খেয়ে উঠে আসতে থাকে।

অ্যাক্সিডেন্টটা এক দুঃস্বপ্ন রুকুর কাছে। এক বন্ধুর সঙ্গে মোটর সাইকেলে যাচ্ছিল মধুপুরের দিকে। সে ছিল পেছনে বসা। নিজেকে তখন মনে হচ্ছিল বুনো ঘোড়ায় চেপে পাহাড়ি পথ ধরে ছুটে যাওয়া কাউবয়দের মতো। হঠাৎ করে একটা বাচ্চা ছেলে এসে পড়ল রাস্তায়। ছেলেটিকে বাঁচাতে গিয়েই ঘটল দুর্ঘটনা। রুকু তীব্র এক ধাক্কায় ছিটকে পড়ল রাস্তার পাশের গভীর খাদে।

ডাক্তার জানিয়েছে তাকে এখন কমাস বিছানায় পড়ে থাকতে হবে। ক্লাস নাইনের দুরন্ত স্বভাবের রুকু এখন কেমন কুঁকড়ে রয়েছে বিছানায়। সবুজ মাঠে পায়ে ফুটবল নিয়ে বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো ছুটে যেত সে। সেই অস্থির আর ছটফটে স্বভাবের রুকু এখন কেমন দুমড়ে রয়েছে।

রুকুরা থাকে ফ্লাট বাড়ির আঠার তলায়। ঘরে জ্বলছে মৃদু সবুজ আলো। জানালার কাচের শার্সিতে ঠকঠক শব্দ হচ্ছে। রুকু ঘুম ভাঙা চোখে দেখল একটা ধূসর বরণ পাখি শার্সির বুকে ডানা ঝাপটাচ্ছে। ডানার পালকে রক্তের দাগ। রুকু দেখল পাখিটার লাল পুঁথির মতো চোখ জ্বলছে। পাখিটা বুঝি অসহায়ের মতো আশ্রয় চাইছে তার কাছে। রুকু যেন পষ্ট শুনতে পেল পাখিটা বলছে, এই খোকা জানালাটা খুলে দাও তো।

চোখ কচলে অনেক কষ্টে বিছানায় উঠে বসে রুকু। মাথার কাছেই জানালা। ঠক ঠক শব্দ হচ্ছে। সন্ধেবেলায় বেদনানাশক কয়েকটি ট্যাবলেট খেয়েছিল রুকু। এই দামি ট্যাবলেট ওর মেজকাকু এনেছে বিদেশ থেকে। রুকুর মেজ কাকু মিশিগান স্টেটস বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছেন। তার গবেষণার বিষয়টি বেশ জটিল। প্রাণীদের জিন বৈশিষ্ট্যের রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করছেন।

সেদিন খাবার টেবিলে বলছিলেন, প্রাণীদের জীবকোষের রোমাঞ্চকর কিছু তথ্য পেয়েছেন। মালয়েশিয়ার সারওয়াক-এর গভীর অরণ্যে এক ধরনের লাজুক, ক্ষুদ্র আকারের বানর প্রজাতির প্রাণীর সন্ধান পেয়েছেন। জুলজুল করে তাকায়। অসম্ভব বুদ্ধিমান প্রাণী এরা। নিজেদের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করে বিশেষ সাঙ্কেতিক ভাষায়।

ওই রকম একটা প্রাণী এবার সঙ্গে করে এনেছেন তিনি। প্রাণীটাকে পাশের ঘরের একটি খাঁচায় রাখা হয়েছে। অন্ধকারে থাকতে বেশি পছন্দ করে প্রাণীটা। আলো তেমন সহ্য করতে পারে না। আলোর প্রখরতায় প্রাণীটির শরীরে লোম কেমন কুঁকড়ে যায়।

মেজকাকুর সুটকেসে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ট্যাবলেট। কয়েকটা তিনি নিজেই বিভিন্ন মিশ্রণে তৈরি করেছেন। রুকুর কাছে মেজকাকুকে কেমন রহস্যময় এক মানুষ বলে মনে হয়। সারাক্ষণ কী যেন চিন্তা করছেন। কথা বলেন অন্যরকমভাবে। কিছুটা হেঁয়ালিপূর্ণ মনে হয়। একবার উত্তেজিতভাবে বললেন, প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের ভাব বিনিময়ের

একটি যোগসূত্র বের করা যেতে পারে। এর ফলে প্রাণীদের কাছ থেকে বিচিত্র সব তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে মানুষ। যাতে তথ্য প্রবাহের জগতে এক বিপ্লব ঘটে যাবে। প্রাণীদের স্বভাবজাত ক্ষমতায় যে বুদ্ধির ঝিলিক রয়েছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে রহস্যময় ক্ষমতা রয়েছে তার সূত্র জানা যাবে। এই জানার ভেতর দিয়ে মানুষের সামনে খুলে যাবে দারুণ সম্ভাবনাময় এক পৃথিবীর বন্ধ দুয়ার। এতে প্রাণীরা কী ভাবছে তো বিস্ময়করভাবে জানতে পারবে মানুষ।

রুকু দেখছিল এ কথাগুলো বলার সময় মেজকাকুর চোখ দুটো কেমন চকচক করছে।

জানিস রুকু, এর ফলে কী ঘটবে। প্রাণীদের কাছে অদ্ভুত রকমের বুদ্ধি। সেই বুদ্ধির সূত্র দিয়ে তখন অনেক কিছুই আবিষ্কার করা সম্ভব হবে। মানুষ তখন প্রকৃতি থেকে প্রচুর সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে পারবে। এর ফলে জীবনযাত্রার ধারাটাই যাবে পাল্টে।

রুকু অনেক দিন ভেবেছে তার মেজকাকুর কথা। লোকটি কি শেষ পর্যন্ত উন্মাদ হয়ে যাবে। ওদের বাড়ির অনেকের কাছেই মেজকাকু একজন ক্ষ্যাপাটে মানুষ বলে পরিচিত। রুকুর কাছে তিনি অবশ্য একজন জিনিয়াস।

পাখিটা খানিক চক্কর মেরে আবার এসেছে। কী চায় পাখিটা ওর কাছে? এত রাতে এখানে এলো কী করে। রাতের অন্ধকারে ঘরের সবুজ আলোয় পাখিটাকে এক বিচিত্র দূত বলে মনে হচ্ছে। কে জানে এই যাযাবর বুনোহাঁস জাতীয় পাখিটা কত দূরের পথ পেরিয়ে এসেছে। রুকুর মনে হলো পাখি ওদের ঘরে প্রবেশ করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কেন ওদের ঘরে আসতে চাইছে পাখিটা? পাশের ঘরের তারের খাঁচায় শব্দ হয়। সেই ছোট, লাজুক বানর প্রজাতির প্রাণীটি বুঝি শব্দ করছে।

রুকু অনেক কষ্টে বিছানা থেকে গড়িয়ে নেমে গিয়ে জানালাটা খোলে। পাখিটা থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল। যেন তুষার ঝড়ের তাড়া খেয়ে ছুটে এসেছে একটা অসহায় পাখি।

রুকু কাঁপা কাঁপা হাতে পাখিটাকে স্পর্শ করে। ওর শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে কেমন তিরতির করে একটা হিমেল স্রোত বয়ে গেল। রুকুর চিন্তার পৃথিবীতে তখন তীব্র কাঁপুনি। ওর মস্তিষ্কে যেন আলোর ফুলকিরা দুলছে।

রুকুর ধারণার জগতে বেশ কিছু ছবি ধারাবাহিকভাবে ফুটে উঠছে। সৃষ্টি হচ্ছে ভিডিও ইমেজের।

রুকুর ভেতরের ঘোলাটে ভাবটা ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে আসছে। কেউ যেন টিউনিং করছে তাকে। পাখিটার সঙ্কেত প্রকাশের ক্ষমতার সঙ্গে তার চিন্তা চেতনার একটি যোগসূত্র স্থাপন করছে। রুকু ক্রমশ আশ্চর্য হয়ে অনুভব করে যে সে ওই পাখিটার সঙ্কেত বুঝতে পারছে। দূরাগত পাখিটাকে সে চিনতে পেরেছে। এই পাখি এসেছে লাদাকের হিম সরোবর থেকে। সেখানে ফুটে থাকে নীল কমল নামের বিরল পদ্ম।

রুকুর দিকে তাকায় পাখিটা। লাল পুঁতির মতো চোখ।

তোমার নাম কি?

রুকু অবাক হয়। পাখিটা যে তাকেই জিজ্ঞেস করছে।

আমার নাম রুকু।

তুমি এখন থেকে আমার বন্ধু।

রুকু আরও অবাক হয়। পাখিটা কী সুন্দরভাবে তাকে এখন বন্ধু বানিয়ে ফেলল। একটুও যেন ভয়ডর নেই পাখিটার।

তুমিও আমার বন্ধু হয়ে গেলে।

আমি তোমাদের এখানে এসেছি আরেক বন্ধুর খোঁজে। সে আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। আমাদের দলনেতা জানিয়েছে ওই শুভাকাঙ্ক্ষী রয়েছে এই শহরে। আরও জেনেছি সে আছে এই বাড়িতে। আমাদের দলটি যাচ্ছিল টেঙ্গুয়ার হাওরের দিকে। তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। যার কাছে আমাদের যাত্রাপথের রুট সম্পর্কে নতুন তথ্য রয়েছে।

কে তোমার বন্ধু?

তাকে আনা হয়েছে সারওয়াকের অরণ্য থেকে।

পাশের কক্ষে তখন শিসের মতো শব্দ হয়। রুকু বুঝতে পারে খুদে, লাজুক প্রাণীটি তাদের ডাকছে।

এসো তোমার বন্ধুর কাছে।

রুকু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পাশের ঘরের দিকে যায়। দরজা খুলতেই রুকু দেখে খাঁচার ভেতরে জ্বলজ্বল করছে দুটি চোখ। ছটফট করছে প্রাণীটি। পাখিটাকে দেখেই অস্থির হয়ে ওঠে প্রাণীটি। রুকু বুঝতে পারে তাদের সঙ্কেত বিনিময়ের ভাষা। বানর প্রজাতির প্রাণীটি পাখিকে সতর্ক করে দেয়।

তোমরা অবিলম্বে তোমাদের যাত্রাপথ পরিবর্তিত কর। এখন তোমরা যে রুট ব্যবহার করছ তা তোমাদের জন্যে মোটেই নিরাপদ নয়। তোমাদের দলের ওপর ব্যাপক হামলা হবে। হাকালুকির হাওরের ইকো পদ্ধতি এখন বিপন্ন। ফলে আমাদের ডিম থেকে আর ছানা হবে না। ডিমের খোলস হয়ে যাবে সাঙ্ঘাতিক পাতলা ফিনফিনে।

তাহলে তো আমাদের ভীষণ বিপদ।

তোমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের নির্মূল করার জন্যে ব্যাপক ষড়যন্ত্র চলছে। আমি বহুভাবে চেষ্টা করেছিলাম তোমাদের কাছে এই তথ্য পৌঁছে দিতে।

আমাদের যে ভাবেই হোক হাওরে গিয়ে এ খবর সবার কাছে জানাতে হবে। আরও কয়েকটি দল আসছে ওই হাওরে। তাদেরকেও সাবধান করে দিতে হবে।

তোমাদের জন্যে এখন মঙ্গল হবে আন্দামান নিকোবরের দিকে চলে যাওয়া।

আমি তাহলে এক্ষুণি যাই। হয়তো পথে আমাদের দলটিকে ধরতে পারব।

ধূসর বরণ পাখিটা জানালা দিয়ে উড়ে যায়। রুকু কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে বাইরের ঘন অন্ধকারের দিকে।



মৃতদেহ চুরি গেল

১৮৯৬ সালের নভেম্বর মাস। সমস্ত লন্ডন শহরে দারুণ রকমের চমক সৃষ্টি করল একটি ঘটনা। মি. বেসিল একজন ধনী ব্যক্তি। অনেকগুলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। মি. ভিনস প্রখ্যাত আইনজীবী। দুজনের মাঝে রয়েছে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। তারা গবেষণা করছিল একটি বিচিত্র এবং অস্বাভাবিক বিষয় নিয়ে। ব্যাপারটি ছিল টেলিপ্যাথি। টেলিপ্যাথি একটি রহস্যময় পদ্ধতি। এতে প্রচণ্ড রকমের চিন্তা আর ইচ্ছেশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে দূরের কোনো মানুষের মানসিক জগতে কোনো নির্দেশ পাঠানো যায়। তারা দুজন আবার কালো জাদুর প্রতি আগ্রহী ছিল। তাদের তাই কখনও দেখা যেত রহস্যময় ভুডু পুরোহিতদের সঙ্গে। জিপসিদের মধ্যে কেউ কেউ তন্ত্রচর্চা করত। তারা জিপসিদের ওই রকম বিচিত্র পদ্ধতির সঙ্গেও পরিচিত ছিল। শোনা যেত কোনো কোনো জিপসি নাকি যোগবলে মহাশূন্যে ভাসমান অবস্থায় থাকতে পারে।

মি. বেসিল আর মি. ভিনস অতি উৎসাহে বিষয়টি নিয়ে চর্চা করতে করতে একেবারে বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করল। তারা চাইল টেলিপ্যাথির সাহায্যে শুধুমাত্র নির্দেশ পাঠানো নয় বরং ওই অদ্ভুত শক্তির সাহায্যে আরও বড় কিছু একটা করে দেখাতে হবে। ঘটনা ঘটাতে হবে আরও তীব্রভাবে। তা হলো কেবলমাত্র ইচ্ছেশক্তিকে বাহন করে স্বশরীরে দূরের মানুষের সামনে গিয়ে কোনোভাবে দাঁড়ানো যায় কিনা। এই

গবেষণাতে ওরা তখন গভীরভাবে নিমগ্ন হয়ে পড়ল। কখনও কখনও দিনরাত এর মাঝে ডুবে থাকত। নভেম্বরের এক শুক্রবারের সন্ধেবেলায় মি. বেসিল আকস্মিকভাবে লন্ডন শহর থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু হলো। দুদিন পর এক বিকেলে মি. বেসিলকে পাওয়া গেল ক্ষতবিক্ষত অবস্থায়। প্রচণ্ডভাবে আহত। কোনোমতে প্রাণটি রয়েছে শরীরে। তারপরেই জানা গেল সেই অদ্ভুত, রোমাঞ্চকর ভয়াল কাহিনি।

মি. ভিনসের কথা

শুক্রবারের বিকেল। বাইরে শীতের ছোট দিন দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। আজ হলো আমাদের গবেষণার চূড়ান্ত অধ্যায়। ঠিক হয়েছে আমি থাকব আমার স্টেপল ইনের ঘরে বসে। বেসিল থাকবে ওর পিকাডেলির বাড়িতে। এর মাঝে দূরত্ব হলো দু মাইল। বেসিল বন্ধ ঘরে বসে নিজেকে প্রথমে সম্মোহিত করবে। এরপর প্রবল ইচ্ছেশক্তির ঢেউতে মহাশূন্যে ভাসিয়ে দেবে তার শরীরের ছায়া। সেই ছায়া ধীরে ধীরে ভেসে আসবে আমার ঘরে। এসে এক সময় দাঁড়াবে আমার সামনে। আমিও তখন টেলিপ্যাথি দিয়ে বেসিলের কথা ভাববো। প্রচণ্ডভাবে ভাবতে থাকব বেসিল যেন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এ ধরনের পরীক্ষা এর আগে আরও চারবার করতে গিয়ে প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছি। আজ হলো পঞ্চম প্রয়াস। সময় হয়ে আসছে। নিয়মমতো আমি ঘরে বসে ইচ্ছেশক্তিকে ঘনীভূত করতে লাগলাম। কতটা সময় চলে গেছে সে খেয়াল নেই। এক ধরনের আচ্ছন্ন ভাব আমাকে ঘিরে রেখেছে। আমি যেন ডুবে রয়েছি মিহি কুয়াশায়। হঠাৎ করে দেখতে পেলাম আমার ঘরে আমার চোখের সামনে বেসিলের আবছায়া মূর্তিটিকে দেখা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে মূর্তির আকার স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। হালকা মেঘের মতো আবছা সেই মূর্তি। বেসিলের মুখকে দেখাচ্ছে ধপধপে শাদা। এলোমেলো চুল। চেহারায় গভীর দুশ্চিন্তার ছাপ। কিছুক্ষণ পর মূর্তিটা আবার যেন মিলিয়ে গেল বাতাসে। আমি তখন স্তব্ধ। বাকরুদ্ধ।

বেসিল মিলিয়ে যাবার পর আমার চেতনা, বুদ্ধি ফিরে এলো। আমার তো তখন বেসিলের ওই অবস্থার একটা ছবি তুলে রাখার কথা সাক্ষ্য প্রমাণের জন্যে। ক্যামেরা প্রস্তুত ছিল। কিন্তু আমি ঘটনার আকস্মিকতায়

এতটাই আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলাম যে, ছবি তোলার ব্যাপারটি আর মনে ছিল না। আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে তাড়াতাড়ি বেসিলের বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলাম। সমস্ত পথ ধরে আমার ভেতরে প্রবল এক উত্তেজনা কাজ করছিল। অবশেষে আমরা তাহলে আমাদের এতদিনের কষ্টকর পরীক্ষায় সফল হয়েছি। এ কথা প্রকাশ পেলে তো চমকে যাবে পৃথিবী।

বেসিলের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বেশ অবাক হলাম। সামনের দরজা খোলা। বেসিল অবিবাহিত। বাড়িতে শুধু একজন কাজের লোক থাকত। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। আমি বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। সব ঘরের জিনিসপত্র এলোমেলো। টেবিল, চেয়ার উল্টে পড়ে আছে। পর্দা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো। কাঁচ ভাঙা। চারদিকে একটা লণ্ডভণ্ড অবস্থা। দেখি এককোণায় ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির কাজের লোকটি। আমাকে দেখে সামনে এসে ভিতভাবে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল—

স্যার, মি. বেসিল একেবারে বুঝি উন্মাদ হয়ে গেছেন।

মানে।

আধঘণ্টা আগে মি. বেসিল ওর ঘর থেকে তীরবেগে বেরিয়ে এসে সবকিছু ভাঙচুর শুরু করে দিলেন।

আমি সময়টার হিসেব করলাম। আধঘণ্টা আগে বেসিলের ছায়ামূর্তি আমার ঘরে গিয়েছিল।

কাজের লোকটি ভয়ার্ত কণ্ঠে জানাল, এমন অদ্ভুত ধরনের কাণ্ড আমি আর কখনও দেখিনি। ঘরের সব জিনিসপত্র ভেঙে লণ্ডভণ্ড করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। বেরিয়ে যাবার সময় চিৎকার করছিলেন, জীবন, আমার জীবন বলে।

আমি ঘটনাটির কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারলাম না। বেসিলের এ রকম উদ্ভট আচরণের মানে কী। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম বেসিলের ঘরে। ওর ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা বোধ হয় নেই। বেসিলকে একটা চিঠি লিখে দিয়ে আমিও বেরিয়ে এলাম।

আমার কেমন জানি অস্বস্তি লাগছে। বাড়ি ফিরে চোখেমুখে পানির ঝাপটা দিলাম। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। আমি যেন স্বপ্নের ভেতরে বেসিলকে দেখলাম। কী করুণ আর অসহায় মুখের ভঙ্গি হয়েছে তার। ভয়ার্ত চেহারা। আমাকে আকুল হয়ে ডাকছে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে।

স্বপ্নটা ভেঙে গেল। খুব খারাপ লাগছিল বেসিলের কথা ভেবে। ও কি কোনো ভয়ঙ্কর বিপদে জড়িয়ে গেছে? আমার ঘরের ভেতরে যেন বেসিলকে দেখলাম। করুণ মুখে বসে রয়েছে। যেন আমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছে।

আমার বুকটা কী রকম করে উঠল। ভাবলাম যে করেই হোক বেসিলকে খুঁজে বের করতেই হবে। নিশ্চয়ই কোনো ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছে সে। গভীর রাতে আমি বেরিয়ে পড়লাম বেসিলের খোঁজে। হেঁটে হেঁটে অনেকটা পথ পার হয়েছি। হঠাৎ শুনি মানুষের আর্তচিৎকার। একজন তীরবেগে ছুটছে। পেছনে হল্লা করতে করতে ছুটে আসছে একদল উত্তেজিত মানুষ। তারা চিৎকার করছে। আমি সামনের লোকটাকে চিনতে পারলাম। বেসিল! কী রকম হিংস্র চেহারা হয়েছে। আমি ওর নাম ধরে ডাকলাম। বেসিল যেন আমাকে চিনতে পারছে না। অস্বাভাবিক তার চাউনি। ওর হাতে লাঠি। আমি ওকে ধরতে এগিয়ে গেলাম। আমাকে সে লাঠি দিয়ে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করল। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। আমার শরীর মাড়িয়ে বেসিল চলে গেল। লোকজনের কাছে শুনলাম এতক্ষণ বেসিল বাজারে ঢুকে যথেষ্ট জিনিসপত্র ভাঙচুর করেছে। অনেককে রক্তাক্ত করেছে। তারপর জীবন, আমার জীবন বলে চিৎকার করতে করতে ছুটে গেছে। আমি ছটফটে মন নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলাম। বেসিল কি শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি উন্মাদ হয়ে গেল? একি তাহলে আমাদের পরীক্ষার ফল। আমার মনে হলো বেসিল যেন ফিসফিস করে আমাকে বলছে, ভিনস আমাকে বাঁচাও বন্ধু। বাঁচাও।

সারা রাত এক ফোঁটা ঘুম এলো না। শুধু ছটফট করে কাটালাম।

ভোর হতেই ছুটে গেলাম বেসিলের আরেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু মি. হার্ট এর কাছে। আশ্চর্য হলাম শুনে যে গত রাতে তারও একদম ঘুম হয়নি। বিনিদ্র কেটেছে। বেসিল নাকি তার কাছে সাহায্য চাইছে। আকুতি করছে।

আমরা দুজনে তখন বেরুলাম বেসিলের খোঁজে। তাকে পাওয়া গেল রবিবার বিকেলে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায়।

রবিবার সকালে আমার বাড়িতে এসেছিলেন উইলসন। নামকরা এক প্রেততত্ত্ববিদ। প্ল্যানচেটের মাধ্যমে পরলোকের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। তার হাতে একটি শ্লেট। সেখানে বেসিলের হাতের লেখা, বেসিল, বেকার স্ট্রিট। সাহায্য চাইছি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম তিনি এটা কোথায় পেয়েছেন। উইলসন জানালেন শনিবার রাতে তারা নিয়মিতভাবে প্ল্যানচেটের আসর করে। এই শনিবার প্ল্যানচেটের মাধ্যমে এক মহিলার হাত দিয়ে এটা শ্লেটে লেখা হয়েছে। উনি বেসিলের নিরুদ্দেশ হওয়ার ব্যাপারটি জানতেন। আমাকে চেনেন বলে শ্লেটটা আমার কাছে নিয়ে এসেছেন। এতে যদি বেসিলের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়।

আমরা তখন বেকার স্ট্রিটে ছুটলাম। সেখানে খোঁজা হলো বেসিলকে। কিছুক্ষণ পর তাকে পাওয়া গেল মারাত্মক রকমের আহত অবস্থায়।

মি. বেসিলের কথা

শুক্রবার সন্ধ্যায় সার্থক হলো আমাদের টেলিপ্যাথির গবেষণা। আমি আর ভিনস মিলে দীর্ঘদিন থেকে গোপনে এই গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি। কী যে রহস্যময়ভাবে ব্যাপারটি ঘটে গেল। হঠাৎ মনে হলো আমার শরীরের ভেতর থেকে মেঘের মতো কিছু পদার্থ আমার মন আর ইচ্ছেশক্তিকে জড়িয়ে নিয়ে বুঝি বেরিয়ে আসছে। সে এক আশ্চর্য রকমের অনুভূতি। আমার স্নায়ুকোষ কাঁপছে। তীব্র শিহরণ জাগছে শরীরে। ওই মেঘের সঙ্গে আমার বুদ্ধি, দৃষ্টিশক্তি প্রভৃতি জড়িয়ে আমি তখন যেন অসংখ্য হয়ে গেলাম। তারপর ভেসে বেরিয়ে গেলাম। আমার এই ভেসে যাওয়াতে কোথাও কোনো রকমের যেন বাধা নেই। কী অবাধ স্বাধীনতা আমার। ভেসে ভেসে আমি উপস্থিত হলাম ভিনসের ঘরে। ভিনস আমার ছায়ামূর্তি দেখতে পেল। সে তখন দারুণ রকমের বিস্মিত হয়ে গেছে। আমার ছবি তুলে রাখার কথা তার মনে হলো না। আমারও তখন বেশিক্ষণ সেখানে থাকার উপায় নেই। ইচ্ছেশক্তির সুতীব্র প্রয়োগে এক মুহূর্তের জন্যে ভিনসকে দেখা দেয়া হয়ে গেছে। ইচ্ছেশক্তির উপর প্রবল চাপ পড়ছে।

আবার ভেসে পড়লাম। পথে দেখলাম আমার মতো মেঘের শরীর নিয়ে অনেকগুলো মেঘপুঞ্জ ভেসে বেড়াচ্ছে। ভাবছিলাম এরা কারা। অনুভব করতে পারছিলাম প্রতিটি মেঘপুঞ্জের মধ্যে আমারই মতো একটা সত্তা মিশে রয়েছে।

বাড়িতে ফিরে এলাম। আমার ফেলে যাওয়া শরীরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। এখন আমি ইচ্ছেশক্তির প্রয়োগ করে এর মধ্যে ঢুকব। সেই

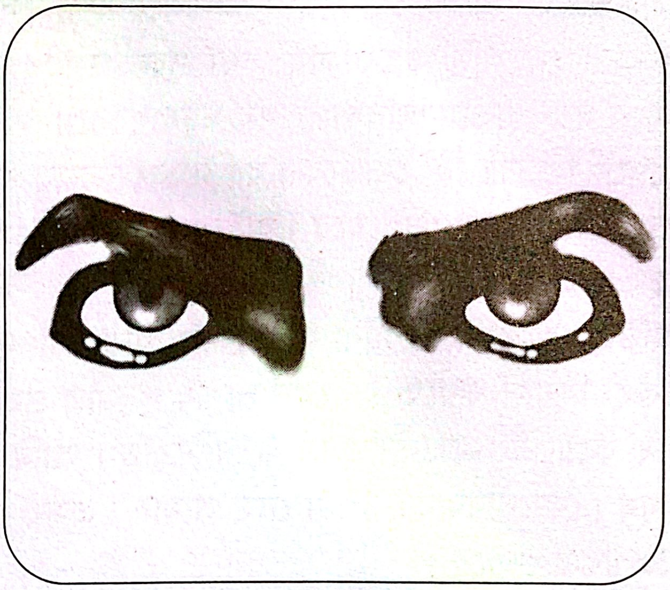
চেষ্টা করছি। তখনি ঘটল সেই বিস্ময়কর ঘটনাটি। আমার চোখের সামনে জানালা দিয়ে এক টুকরো মেঘ ভেসে এলো। এসে ঢুকল আমার শরীরের ভেতরে। এর ফলে আমার ঢোকার পথটি বন্ধ হয়ে গেল। আমার শরীরের নতুন সত্তা তখন আমার দখল করা শরীরটিকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই শুরু করে দিল। বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। সমস্ত লন্ডন শহরে উন্মাদের মতো ছুটোছুটি করতে লাগল। আমি ওকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতে লাগলাম। স্বপ্নের ভেতর দিয়ে দেখা দিলাম ভিনস আর হার্টের কাছে। তাদের কাছে আকুল হয়ে চাইলাম সাহায্য। কিন্তু ওরা ঠিক যেন বুঝতে পারল না। এটা হয়তো আমারই ব্যর্থতা। আমিই ওদের বোঝাতে পারলাম না।

শনিবার রাতে আমার নতুন শরীর পিছলে পড়ে আহত হলো। হাত পা ভাঙল। আমার শরীরের নতুন মেঘসত্তা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে দেহ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল ইচ্ছেশক্তির সাহায্যে। আমি আতঙ্কিত হয়ে ভাবলাম আমাকে কি চিরকালের মতো এভাবে মেঘ হয়ে ভাসমান অবস্থায় থাকতে হবে?

আমার ইঙ্গিত ভিনস বুঝতে পারছে না। হার্ট পারছে না। কে বুঝবে? কাকে বোঝাব? ভাসতে ভাসতে এক সময় দেখতে পেলাম এক প্রাচীন দুর্গবাড়ির ছাদে উইলসন তার প্ল্যানচেটের আসর বসিয়েছে। আমি সেখানে উপস্থিত হলাম। একজন মাধ্যমের হাত দিয়ে শ্লেটে কোনোমতে লিখলাম, বেসিল, বেকার স্ট্রিট... সাহায্য চাই। উইলসন এই শ্লেট নিয়ে গেল ভিনসের কাছে। আমি ততক্ষণে আবার প্রবল ইচ্ছেশক্তি প্রয়োগ করে আমার পুরানো শরীরে ঢুকে পড়েছি। আবার আমি বেসিল। আবার আমি মানুষ হতে পেরেছি।

এর পরের ঘটনা জানিয়েছে ভিনস।

- এইচ. জি. ওয়েলস এর কাহিনি অবলম্বনে



ইচ্ছেশক্তি

গত কয়েক দিন যে সব ঘটনা ঘটল তাতে করে রীতিমতো হতভম্ব হয়ে পড়েছি আমি। অবিশ্বাস্য সব ব্যাপার!

আমার নাম ফেদারিঙো। কোঁকড়ানো চুল। বাদামি চোখের মানুষ। গালে জড়ুল রয়েছে। খুব সাধারণ একটি চাকরি করি। গতানুগতিক জীবনধারা। এই ছোট্ট শহরের অনেকেই ভাবে আমি বুঝি উন্নাসিক।

আজ ১০ নভেম্বর। রবিবার। একটু আগে গির্জায় বক্তৃতা শেষ হয়েছে। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা আমাকে হতবুদ্ধি করে ফেলেছে। অস্থির করে রেখেছে। আমার মনে হচ্ছে এই ঘটনাগুলো ঘটাতে গিয়ে প্রকৃতির নিয়মের রাজত্বে যথেষ্ট অনিয়ম করে ফেলেছি।

গির্জাতে আজ অলৌকিক বিষয় নিয়ে মি. মেডিক বক্তৃতা করেছিলেন। আদিভৌতিক বিষয় নিয়ে কথা। তার বক্তৃতার শিরোনাম ছিল, যা আমাদের করা অনুচিত।

সত্যি, গত কয়েকদিন ধরে আমি যা করে চলেছি তা অনুচিত। এই শহরের সবচাইতে ডাঁকসাইটে পুলিশ কর্মকর্তা মি. উইনচকে সেদিন রাতে গাছের বাড়ি মেরে সান ফ্রান্সিসকোতে উড়িয়ে ফেলে দেয়াটা আমার মোটেই উচিত হয়নি। বুঝতে পারছি মি. উইনচ বারবার সান ফ্রান্সিসকো থেকে আবার এখানে ফেরত আসার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। আর আমি সেই চেষ্টাকে বারবার নষ্ট করে দিচ্ছি।

মি. মেডিক যখন অলৌকিক বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছিলেন তখনই আমি ঠিক করে ফেলেছি তাকে সব কথা খুলে বলতে হবে। ইদানীং আমার জীবনে ঘটে যাওয়া অবিশ্বাস্য সব ঘটনাগুলো।

গির্জা থেকে গিয়েছি মি. মেডিকের বাড়িতে। নিজের পড়ার ঘরে বসে আছেন তিনি। স্বল্প আলো সেই ঘরে। বাইরে বয়ে যাচ্ছে হিমেল বাতাস। পাইন গাছের পাতায় শব্দ হচ্ছে।

মি. মেডিক, অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? আপনি নিশ্চয়ই একথা বিশ্বাস করতে চাইবেন না যে শুধুমাত্র প্রবল ইচ্ছেশক্তির জোরে আমি কয়েকটি অসাধারণ ঘটনা ঘটিয়েছি। আমি একজন অতি সাধারণ মানুষ। কোনোরকম বৈশিষ্ট্য নেই আমার। এসব হয়েছে শুধুমাত্র আমার ইচ্ছেশক্তির জোরে।

মি. মেডিক আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রয়েছেন যে মনে হয় তিনি আমাকে অবিশ্বাস করছেন না।

মি. মেডিক, আমি বরং আপনাকে এখন কিছু ঘটনা দেখাই। সামনাসামনি। তাহলে ব্যাপারটা আপনি ভালো করে বুঝতে পারবেন। এই যে দেখছেন টেবিলের উপর একটা ছাইদানি। এটা একটা ছাইদানি। দেখুন তো কী ঘটে।

আমি ভ্রূ কুঁচকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম সেই ছাইদানির দিকে। ফিসফিস করে বলতে লাগলাম, ফুলসহ ফুলদানি হয়ে যাও। ফুলদানি হয়ে যাও।

যা ভেবেছিলাম তাই হলো। টেবিলের উপর ছাইদানির পরিবর্তে দেখা গেল সুগন্ধি ফুলে ভরা একটি চমৎকার ফুলদানি।

মি. মেডিক তখন হতবাক। বিস্মিত।

কী করে এমনটা হলো? কী করে?

জানি না। দেখলেনই তো। যেইমাত্র বললাম অমনি হয়ে গেল। আসলে এই ব্যাপারটা বোঝার জন্যেই তো আপনার কাছে ছুটে এসেছি। এটা কি কোনো কালো জাদুর ব্যাপার? অলৌকিক ঘটনা। ডাইনিবিদ্যা?

আমার এই অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় প্রথম পেলাম দিন চারেক আগে এক সন্ধ্যায়। লাল ড্রাগন রেস্তোরাঁয়। সেই সন্ধ্যায় সেখানে টডির সঙ্গে গল্প করছিলাম। টডি বলছিল যত সব অলৌকিক ঘটনার পক্ষে। আমি প্রতিবাদ করে বলছিলাম অসম্ভব ঘটনা ঘটানো যায় কেবলমাত্র মনের জোরে। এর জন্যে প্রয়োজন প্রচণ্ড ইচ্ছেশক্তির।

একথা বলে আমি তাকালাম চারপাশে। তারপর উঁচু গলায় বললাম, সবাই দেখুন, টেবিলের ওপর ওই যে বাতিটা জ্বলছে প্রকৃতির নিয়মকে ভেঙে তাকে কি কেউ উল্টো ভাবে রাখতে পারে? অর্থাৎ বাতির ওপর দিকটা নিচে। নিচটা ওপরে। পারবে কেউ এভাবে জ্বালিয়ে রাখতে?

কখনও না।

চারপাশ থেকে লোকজন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল।

তবে আমাকে দেখুন। বাতি উল্টে যাও।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো আমার জীবনের অলৌকিক ঘটনা। বাতিটা সোজা একটু উপরে উঠে পুরোপুরি ডিগবাজি খেয়ে উল্টে গেল। তারপর সবার চোখের সামনে দপদপ করে জ্বলতে লাগল।

লাল ড্রাগন রেস্তোরাঁতে হঠাৎ করে যেন নেমে এলো ভয়ংকর নীরবতা। সবাই এই অভাবনীয় দৃশ্যটি দেখে যেন বিমূঢ় হয়ে গেছে। হতবিহ্বল অবস্থা।

হঠাৎ আমার মনে হলো আমি বুঝি বাতিটাকে আর ঝুলিয়ে রাখতে পারছি না।

আমার ভ্রূ কুঁচকে উঠল। বাতিটাকে ঐভাবে ঝুলিয়ে রাখা আমার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না। বাতিটা হঠাৎ মাটিতে ঝনঝন করে পড়ে গেল। কেটে গেল রেস্তোরাঁর হিমশীতল পরিবেশ। আবার যেন প্রাণ ফিরে এলো সেখানে। লোকজন বিস্মিত। তারা বলছে আমি নাকি ভেলকি দেখিয়ে তাদের বিভ্রান্ত করেছি। আমি ডাইনিবিদ্যা জানি। কালো জাদুর চর্চা করেছি।

কিন্তু আমার ভেতরে তখন অন্য রকমের প্রতিক্রিয়া চলছিল। মনে হচ্ছিল কেউ বুঝি আমার স্নায়ুগুলো দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে। প্রচণ্ড এক শিহরণের স্রোত কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে আমার ভেতরটা। আমার শিরা উপশিরার ভেতর দিয়ে জোনাকিরা বুঝি জ্বলছে, নিভছে।

ধীরে ধীরে এক সময় আমি স্বাভাবিক হয়ে এলাম। জীবনে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হলো আমার। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম আচ্ছন্নের মতো। তখন গভীর রাত। মনের ভেতরে তখন শুধু একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। কী করে এমনটা ঘটল। আর ঘটলই যখন বাতিটা হঠাৎ পড়ে গেল কেন!

বিছানায় শুয়ে ছটফট করছি। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যেন একটা সমাধান খুঁজে পেলাম। মনে হলো এটা সম্ভবপর হয়েছে আমারই

ইচ্ছেশক্তির জোরে। আমার প্রবল ইচ্ছেশক্তির বাহন হয়ে আমার মুখের আদেশ বাধ্য করেছে বাতিটাকে উল্টে যেতে। বাতিটার কোনো সাধ্য ছিল না আমার আদেশকে অমান্য করার। কিন্তু যেইমাত্র ইচ্ছেশক্তির প্রাবল্য একটু কমে গেল অমনি বাতিটা আমার ইচ্ছেশক্তির সীমানা থেকে বেরিয়ে গিয়ে পুনরায় প্রাকৃতিক নিয়মে চলে গেল। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে গিয়ে মাটিতে পড়ল।

এরপর থেকে আমি যেন অন্য রকমের হয়ে গেলাম। একটি দারুণ পরিবর্তন ঘটে গেছে আমার মধ্যে। ইচ্ছে হলো আবার ওই রকম ঘটনা ঘটাই। বিছানায় উঠে বসলাম। ঠিক করলাম নির্দেশ দিয়ে সে রাতে একটি মোমবাতিকে সোজা দাঁড় করিয়ে রাখব। তাই করলাম। মনে মনে একটা দেশলাই চাইলাম। এই চাওয়ার জন্যে প্রয়োগ করলাম তীব্র ইচ্ছেশক্তি। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে একটি দেশলাই চলে এলো।

নিজের উপরে বিশ্বাস ক্রমশ বাড়ছে। আস্থা বাড়ছে। আমার মুখ দিয়ে ইচ্ছেশক্তির জোরে যা বলব তাই ঘটে যাবে। এই দৃঢ় ইচ্ছেশক্তির বেশ কটি প্রয়োগ করলাম। একটি গ্লাসের পানিকে প্রথমে নীল পরে সবুজ করেছিলাম। একটি শামুককে পরিণত করলাম টুথব্রাশে। বিচিত্র এক নেশায় পেল আমায়। কেবলমাত্র ইচ্ছেশক্তির জোরে আমি তখন যা ইচ্ছে তাই করতে পারছি।

পরদিন থেকে বেশ চিন্তাভাবনা করে আমি আমার ইচ্ছেশক্তির কাজগুলো করতে লাগলাম। যথেষ্ট সতর্ক হয়ে উঠলাম। খুব বেশি ব্যাপারে এই ইচ্ছেশক্তি প্রয়োগ করলাম না। সকালে খাবার টেবিলে একটি সুস্বাদু ডিম আমদানি করলাম। অফিসে ফাঁক পেয়ে দুটো দামি হীরে তৈরি করেছিলাম। অফিসের লোভী বড় কর্তাকে এগিয়ে আসতে দেখে হীরে দুটোকে অদৃশ্য করে দিলাম।

রাতে খাওয়ার পর বাড়ির পেছনের নির্জন রাস্তায় হাঁটছি। ফুরফুরে বাতাস বইছে। বুনো ফুলের গন্ধ। তখনই ঘটে গেল সেই সাংঘাতিক ব্যাপারটা। হাতের ছড়িটাকে তখন বানিয়ে ফেললাম একটি রক্তগোলাপ গাছ। হঠাৎ কার পায়ের শব্দ যেন কানে এলো। চমকে উঠে আদেশ দিলাম, চলে যাও।

আর এতেই হয়ে গেল সেই মারাত্মক ভুল। আমার তখন বলা উচিত ছিল রক্তগোলাপ গাছ থেকে আবার ছড়ি হও। কিন্তু যেইমাত্র বলেছি চলে যাও অমনি ডালপালাসুদ্ধ রক্তগোলাপ গাছ প্রচণ্ড বেগে চলে গেল। তার

পরমুহূর্তেই শুনতে পেলাম মানুষের আর্তনাদ। অর্থাৎ উড়ন্ত গাছের সঙ্গে কোনো পথচারীর ধাক্কা। সেই পথচারীকে দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম। পুলিশ কর্মকর্তা উইনচ। গত রাতের লাল ড্রাগন রেস্তোরাঁয় আমার ভেলকিবাজির খবর সে জানে। খুব হম্বিতম্বি করতে লাগল আমার ওপরে। কোনোমতেই তাকে আমি থামাতে পারছিলাম না। সে কোনো কিছুই বুঝতে রাজি না। শেষে অনেকটা বাধ্য হয়ে আমি বললাম একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটানো হয়েছে। একথা শুনে উইনচ আরও রেগে উঠল। হাতকড়ি পরিয়ে আমাকে বন্দি করতে চায়। তখন ইচ্ছেশক্তির প্রয়োগে তাকে সরাসরি আমি সান ফ্রান্সিসকোতে চালান করে দিলাম। আমি বুঝতে পারছি যে এটা আমার অন্যায় হয়েছে। কিন্তু এছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না। মি. মেডিক, আপনি এখন আমাকে সাহায্য করুন। আমি এসব ইচ্ছেশক্তি বা অলৌকিক ঘটনার নিয়ন্ত্রক হয়ে আর থাকতে পারছি না।

ঘরের স্বল্প আলোতে মি. মেডিককে কেমন রহস্যময় দেখাচ্ছে। দেয়ালে একটা কালো পাথরের আফ্রিকান মূর্তি ঝুলছে। লাল জিব বের করে আছে সেই মূর্তিটি। আদিবাসীদের শিল্প।

মি. মেডিক আমাকে আরও কিছুটা যাচাই করতে চায়। তিনি আমার কাছে আরও কয়েকটি ইচ্ছেশক্তির খেলা দেখতে চাইলেন। আমি তা করে দেখালাম।

প্রথমে ফুলদানি থেকে এক জার লাল মাছ তৈরি করলাম। লাল মাছ থেকে বড় পায়রা। পায়রা থেকে ফুলদানি। শেষে আবার ছাইদানি।

মি. মেডিক আমার এসব কাণ্ড দেখলেন। তারপর বিস্মিত কণ্ঠে শুধু বললেন অভাবনীয়, অপূর্ব! তুমি হচ্ছে প্রচণ্ড শক্তিধর।

মি. মেডিক আমার এই দুর্লভ ক্ষমতা দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। তিনি ভাবলেন আমার এই ক্ষমতাকে ভালো কোনো কাজে ব্যবহার করতে হবে। শুধুমাত্র ছেলেমানুষি কাণ্ডে যেন এসব প্রয়োগ না করি। আমাকে তিনি বোঝাতে চাইলেন এই ক্ষমতা দিয়ে সহজেই মানুষের কল্যাণ করা যেতে পারে।

মি. মেডিক আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন তার সঙ্গে রাতের খাবার গ্রহণের জন্যে। খেতে গিয়ে দেখি অত্যন্ত বাজে খাবার। তার বাড়িওয়ালি নিয়মিতভাবে এমন ধরনের খাবার পরিবেশন করে থাকে। এটা আমার

জন্যে তখন কোনো সমস্যা নয়। চট করে ইচ্ছেশক্তি দিয়ে সুস্বাদু খাবার আনিয়ে নিলাম।

মি. মেডিক খেতে খেতে বললেন, আমার বাড়িওয়ালি মিসেস মিনচিন খুব দজ্জাল ধরনের মহিলা। একেবারে জাঁহাবাজ রমণী।

তাই নাকি, এখনই তাকে আমি সত্যিকারের ভদ্রমহিলায় রূপান্তরিত করে দিচ্ছি।

আমি তখন ক্ষমতা প্রয়োগ করলাম। কিছুক্ষণ পর ওপর তলা থেকে চাপা গলায় কান্নার শব্দ পাওয়া গেল। সেখানেই থাকে বাড়িওয়ালি। মি. মেডিক কৌতূহলী হয়ে উপরে উঠে গেলেন। ফিরে এলেন হাসিমুখে।

এ কী করেছেন! দজ্জাল মহিলা একেবারে কোমল হয়ে গেছে। আমি দরজার এপাশ থেকে পষ্ট শুনে এলাম মিসেস মিনচিন অনুতাপ করছেন।

আমি কিন্তু তখনও আমার ক্ষমতার ব্যাপারে সন্দিহান ছিলাম। আমার ইচ্ছেশক্তি কি পারবে একজন জীবিত মানুষের মনকে পাল্টে দিতে? এখন বোঝা গেল এতেও আমার সাফল্য এলো। আমি যেন তৃপ্তি পেলাম। বেরিয়ে এলাম মি. মেডিকের বাড়ি থেকে। আকাশে রুপোলি চাঁদ। আমি ধীরে ধীরে আমার ক্ষমতার প্রয়োগ শুরু করলাম। শহরের মন্দ লোকদের ভালো করার কথা ভাবলাম। অপরাধীরা যেন অপরাধ ছেড়ে দেয়। ভাঙা রাস্তা সারিয়ে দিলাম। ভগ্ন সেতু ঠিক হলো।

চাঁদের মায়াবী আলো ছড়িয়ে রয়েছে চারপাশে। রাত বাজে তিনটে। আমি কী রকম স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো এই শুভকর কাজগুলো করে যাচ্ছি। মি. মেডিক ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছেন। তার স্নায়ুর উপর প্রবল চাপ পড়ছে। হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরলেন তিনি।

তুমি, তুমি এবার আকাশের চাঁদকে একজায়গায় স্থির করে দাঁড়িয়ে রাখো।

কী সব বলছেন! চাঁদকে কি থামিয়ে রাখা সম্ভব?

নিশ্চয়ই সম্ভব। তোমার পক্ষে সবই সম্ভব। চাঁদ নয় তুমি আমাদের এই পৃথিবীর চলার গতিকে স্তব্ধ করে দাও আর তাহলেই সময় যাবে থেমে। নিশ্চয়ই এটা পারবে তুমি। আর এটা করতে পারলেই সময় আর গজাবে না। আমরাও সেই ফাঁকে এ রকম আরও অনেক শুভকাজ করে নেব।

কী যেন হলো আমার। পারব কি! পৃথিবীর চলার শাশ্বত এই গতি থামাতে। সময়কে বন্দি করে রাখতে। ইচ্ছেশক্তিকে তীব্র তীক্ষ্ণ করে তুলতে লাগলাম। একাগ্রভাবে, প্রবলভাবে মনের জোর বাড়িয়ে দিলাম।

হঠাৎ কী যেন ঘটল। দমকা বাতাসের ঝাপটা উঠল। প্রচণ্ড ধূলিঝড় বইছে। আর্তনাদের মতো শব্দ। চারদিকে ঘূর্ণির দাপট। ভয়ংকরভাবে কাঁপছে চারদিক। বাতাসের দমকায় ঘুরতে লাগল আমার শরীর। তারপর উপর দিকে উঠতে লাগল শাঁ শাঁ করে। আমি তখন আমার ভেতরের ইচ্ছেশক্তির শেষটুকুকে যেন নিংড়ে নিয়ে বললাম, আমি নিচে নামতে চাই। মাটিতে নামতে চাই। অক্ষত শরীরে নামতে চাই।

পরমুহূর্তে পায়ের নিচে মাটির স্পর্শ পেলাম। কিন্তু একি! কোথায় এলাম। চারদিকে ধ্বংসস্তূপ শহরের সবকিছু ভেঙেচুরে গেছে। ভয়াবহ, বীভৎস দৃশ্য। তখনও বইছে প্রবল ধূলিঝড়। বিদ্যুতের গর্জন ঝলসে উঠছে।

মি. মেডিক, কোথায় আপনি?

আমি আর্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলাম।

আমাদের ছোট শহরটি আর নেই। বাড়িঘর নেই। পথঘাট নেই। গাছপালা নেই। আমি তো এসব চাই না। এমনটা কেন হলো? হঠাৎ আমার মনে হলো আমি যে পৃথিবীকে থামতে বলেছিলাম। যে পৃথিবীর গতি বিষুবরেখায় ছিল ঘণ্টায় প্রায় হাজার মাইল। প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন সেই পৃথিবীর আচমকা থেমে যাওয়ার ধাক্কাতে এসব ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে।

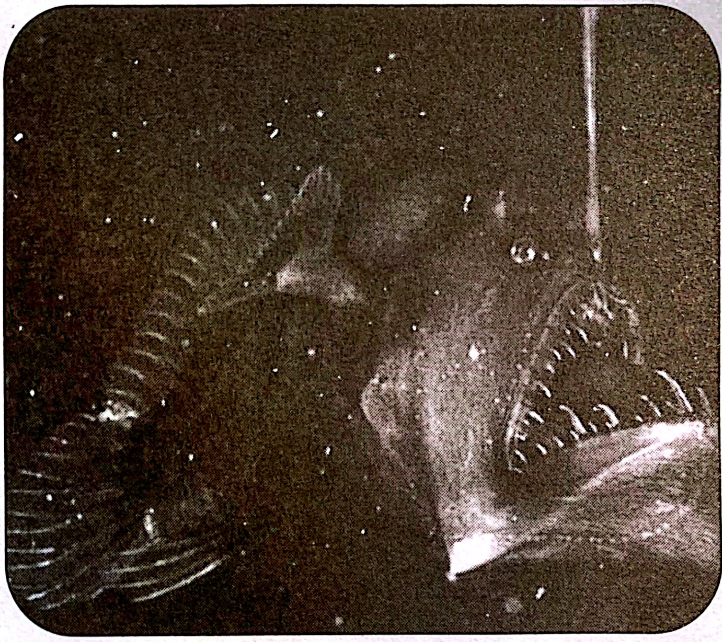
কিন্তু আমি তো এসব ভাবিনি। এই ধ্বংসযজ্ঞ চাই না। অথচ আমার ইচ্ছেশক্তিই পৃথিবীর বুকে এই ধ্বংসকে এভাবে নিয়ে এলো। বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। দেখতে পেলাম বিশাল পানির স্রোত ধেয়ে আসছে। শেষবারের মতো ছিন্নভিন্ন ইচ্ছেশক্তিকে প্রবল চেষ্টায় জাগিয়ে তুলতে চাইলাম।

থামো, সব ঝড় থেমে যাক। বন্ধ হয়ে যাক এসব অলৌকিক কাণ্ড। আমি আর কিছু চাই না। আমার ইচ্ছেশক্তির কর্মক্ষমতা ফিরিয়ে নেয়া হোক। আমাকে ফিরিয়ে দাও সেই দিনটি, সেই সময়, যখন আমার মধ্যে ইচ্ছেশক্তির এই প্রবল ক্ষমতা আসেনি। আমি যেন আর কোনোদিন এই ক্ষমতা ফিরে না পাই।

আবার পৃথিবীতে প্রসন্ন আলো ছড়িয়ে পড়ল। নরম আলো। ভেজা মাটির গন্ধ, সবুজ ঘাসের গন্ধ আবার পেলাম। ফিরে পেলাম মানুষের গন্ধ।

ভালো করে তাকিয়ে দেখি আমরা কজন বসে রয়েছি লাল ড্রাগন রেস্তোরাঁয় সেই টেবিলে। সে দিনের সন্ধ্যায় আমি সমানে তর্ক করে চলেছি অলৌকিক ঘটনা নিয়ে।

- এইচ.জি ওয়েলস এর কাহিনি অবলম্বনে



সমুদ্রের ভয়ঙ্কর

বিচিত্র, লোমহর্ষক, গা শিউরানো ঘটনাটি সিডমাউথের সমুদ্র তীরে ঘটল। সবাই অবাক হয়ে জানল। সেখানে দেখা গেছে সমুদ্রের এক অদ্ভুত আকৃতির প্রাণীদের। ভয়ঙ্কর, বীভৎস কদাকার সেইসব প্রাণী। এর আগে কোনো সমুদ্র তীরে এ ধরনের প্রাণী আর দেখা যায়নি। প্রাণিবিজ্ঞানীরাও এ রকম কোনো প্রাণী সম্পর্কে কোনো কিছু জানত না। লোকেরা বলল, গভীর সমুদ্রের নিচ থেকে উঠে এসেছে এই দানবেরা। বিচিত্র আকৃতির এই প্রাণীটিকে প্রথমে দেখতে পাওয়া গেল টুকরো টুকরো অবস্থায়।

১৮৯৫ সালের অক্টোবরের এক শীতের দুপুরে প্রথমে দেখা গেল প্রাণীটিকে। ইউরোপের সবচাইতে ক্ষুদ্র দেশ মোনাকোর যুবরাজ অ্যাজারস প্রথম দেখতে পেলেন প্রাণীটিকে। তিনি তখন তার প্রমোদতরীতে চড়ে ঘুরছিলেন সিডমাউথের সমুদ্র উপকূলে। এক সময় দেখলেন সমুদ্রের বুকে প্রচণ্ড হুটোপুটি হচ্ছে। ঢেউ এর মাথায় দেখা যাচ্ছে বিশাল লেজ। পানির ফোয়ারা উঠছে। একটা স্পার্ম তিমি আক্রমণ করেছে ক্যাচালাটকে। সমুদ্রের বুকে শুরু হলো দুটো প্রাণীর তীব্র লড়াই। প্রচণ্ড আলোড়ন। যুবরাজের তরণী ঢেউ এর প্রচণ্ড ধাক্কাতে দুলে উঠল। তিমিটা লেজ দিয়ে প্রচণ্ড ঝাপটা মারছে। এক সময় ক্যাচালটাকে মেরে তিমিটা চলে গেল। যুবরাজ দেখলেন সমুদ্রের নিচ থেকে বেশ কিছু প্রাণীর শরীরের টুকরো ওপরে ভেসে উঠছে। তিনি বিস্মিত হয়ে দেখলেন প্রকাণ্ড শুঁড় এর এক ধরনের প্রাণীর শরীরের খণ্ডিত অংশ। যুবরাজ প্রাণিবিজ্ঞানে

উৎসাহী। তিনি কখনও এ ধরনের প্রাণীর বিবরণ কোথাও পাননি। বুঝলেন হঠাৎ করে সন্ধান পেয়ে গেছেন সমুদ্রের বিরল কোনো জীবের। বিজ্ঞানীদের কাছে যে প্রজাতির প্রাণীরা তখনও অজানা।

বিচিত্র আকারের টুকরোগুলো ভেসে উঠেছিল ঢেউতে। যুবরাজ বুঝলেন এই খণ্ডিত অংশগুলো আবার তলিয়ে যাবে। কেউ হয়তো তখন জানতেই পারবে না এই অদ্ভুত প্রাণীদের সম্পর্কে। যুবরাজের নির্দেশে তখন নৌকো নামিয়ে প্রাণীটির খণ্ডিত অংশগুলো তোলা হলো। গভীর সমুদ্রের দ্রুতগামী এই জীবগুলো ছিল বিশাল আকারের। এরা ছিল সমুদ্রের আতঙ্ক। হানাদারের মতো ছুটে এসে আক্রমণ করত। বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিলেন হ্যাপলোটিউথিস। এই প্রাণীরা কখনও তীরের কাছাকাছি আসত না। এদের জালে ধরা সম্ভব ছিল না। কোনো আকস্মিক ঘটনা ছাড়া এদের সম্পর্কে জানার কোনো উপায় ছিল না। হঠাৎ করে এই প্রাণীরা ইংল্যান্ডের উপকূলে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে দেখা দিল। এই ঘটনায় রীতিমতো বিস্মিত হলেন প্রাণিবিজ্ঞানীরা। তারা ধারণা করলেন হয়তো গভীর সমুদ্রে ওদের থাকার স্থানে খাবারের টান পড়েছে। তাই উপকূলে এসে এমনভাবে হানা দিচ্ছে তারা।

সমুদ্রের জীবিত হ্যাপলোটিউথিসকে প্রথম দেখতে পেলেন চা ব্যবসায়ী মি. ফাইসন। এসব ভয়ঙ্কর, রাক্ষুসে প্রাণীদের মুখোমুখি হয়ে তিনি ভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছিলেন। তার কাছে জানা গেল সেই লোমহর্ষক ঘটনা। মি. ফাইসনের মৃত্যু ছিল অবধারিত। ঈশ্বরের কৃপায় বেঁচে এসেছেন তিনি। তার বিবরণ শুনে বোঝা গেল সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া অন্য যাত্রীদের কী পরিণতি হয়েছিল। গেল বছর মে মাসে ডেভন এর মাঝ সমুদ্রে নৌকো ভ্রমণ করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছিল প্রচুর যাত্রী। তারা যেন মাঝ সমুদ্রে রহস্যজনকভাবে অন্তর্হিত হয়েছিল। এখন বোঝা গেল তারা ছিল ওই জলদানবের শিকার।

চা ব্যবসায়ী মি. ফাইসনের হলো বিচিত্র অভিজ্ঞতা। তিনি তখন ছিলেন সিডমাউথের একটি হোটেলে। এক বিকেলে তিনি উঁচু, পাহাড়ি রাস্তায় বেড়াচ্ছিলেন। এই রাস্তাটি থেকে সমুদ্রের পানি অনেকটা নিচে। সমস্ত সমুদ্রতট সেখানে বড় বড় পাথর আর জলজ উদ্ভিদে ভরা। রাস্তাটির এক জায়গায় পাড় থেকে সমুদ্র তীরে নেমে যাওয়ার জন্য মইয়ের মতো খাড়া সিঁড়ির ধাপ কাটা রয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা দূরে চলে এসেছিলেন ফাইসন। সুনসান পরিবেশ। হঠাৎ তার চোখে পড়ল তীরের

একেবারে কিনারায় শাদা আর গোলাপি রং এ মেশা কী যেন একটা প্রবলভাবে নড়ছে। আর তার ঠিক ওপরে একঝাঁক সামুদ্রিক মাছ আটকা পড়েছে। গাঙচিলেরা চিৎকার করছিল। তিনি কৌতূহলী হয়ে খাঁড়া সিঁড়িটা বেয়ে নেমে জিনিসটা আসলে কী দেখতে গেলেন। ওই বিচিত্র জিনিসটা দেখে তিনি কিছু বুঝতে পারছিলেন না। তার মনে হলো সেটা যেন গোটা সাতেক গোলাকৃতি অংশ দিয়ে তৈরি। জলজ উদ্ভিদের ভেতরে সেই গোলাপি শাদা জিনিসটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। ফাইসন বড় পাথরটা উঠলেন। আর তখনি তার সামনে ব্যাপারটি স্পষ্ট হলো। প্রচণ্ড বিস্ময়ে তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। ওই শাদা গোলাপি জিনিসটা আসলে ছিল একটি আধখাওয়া মৃতদেহ। তার সঙ্গে লেগে আছে গোলাকার সাতটি জিনিস। সাতটি বিকট দর্শন ভয়াবহ প্রাণী। এই অজানা জীবগুলোর আকারের সঙ্গে অক্টোপাসের যেন অনেকটা সাদৃশ্য রয়েছে। প্রাণীটির সমস্ত শরীর থেকে অনেকগুলো প্রকাণ্ড লম্বা, নমনীয় শুঁড় বেরিয়েছে। শুঁড়গুলোর কোনোটা গুটিয়ে পড়ে আছে তীরের মাটিতে। আবার অন্য কয়েকটা ছড়িয়ে কিলবিল করছে। শুঁড় দিয়ে ঘেরা ঝুলে থাকা ঠোঁট। তার ওপরে বড় বড় জ্বলজ্বলে চোখ। প্রাণীগুলো দেখতে ভয়াবহ রকমের কুৎসিত। তাদের শরীরের চামড়া চকচকে মসৃণ। সমুদ্রের আতঙ্ক কদাকার প্রাণীগুলো ফাইসনের দিকে যেন ক্রুদ্ধভাবে তাকিয়ে রয়েছে। তীরে শুঁড় নেড়ে কিলবিল করছে সাতটি প্রাণী। আরও দুটি প্রাণী উঠে আসছে পানির ভেতর থেকে। ফাইসন প্রথমে ওদের দেখে চমকে গেলেন। বীভৎস প্রাণীগুলো একটা মানুষের শরীরকে খুবলে নিচ্ছে। দৃশ্যটা দেখে তার প্রচণ্ড রকমের ঘৃণা জন্মাল। প্রাণীগুলো মোটেই নড়ল না। ফাইসন তখন ভারী পাথরের একটি চাঁই তুলে ছুঁড়ে মারলেন ওদের দিকে। তখনি ঘটল সেই ভয়ংকর ব্যাপার। পাথর ছোড়া মাত্র সব কটা প্রাণী হিংস্র, মারকুটে হয়ে উঠল। তাদের সব কটা শুঁড় ছড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। তখন তাদের মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে চাপা গোঙানির মতো শব্দ। প্রাণীগুলোর চোখের দৃষ্টি নির্মম। কিলবিল করে এগিয়ে আসছে প্রাণীরা। ফাইসন বুঝতে পারলেন তার জীবন বিপন্ন। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন তিনি। তারপর পাথর থেকে নেমে পাহাড়ে ওঠার মইটার দিকে দৌড় দিলেন। তার ধারণা ছিল বিশাল আকারের এই থলথলে প্রাণীগুলো দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। তাদের শুঁড়গুলো রোদে চিকচিক করছে। আতঙ্কে দৌড়াতে গিয়ে ফাইসনের পা পিছলে যাচ্ছে।

প্রাণীগুলো তাকে তাড়া করে মই পর্যন্ত নিয়ে গেল। ফাইসন কোনোরকমে মই বেয়ে উঠে পড়লেন। প্রাণীগুলো পাথুরে সিঁড়ি শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল। ফাইসন পাথর ছুড়ে মেরে প্রাণীদের সরালেন। পাহাড়ের উপর রাস্তায় উঠে ফাইসন সিডমাউথের দিকে রওয়ানা দিলেন। সেখানে কয়েকজন লোক জড়ো করে নৌকো নিয়ে আবার তীরে ফিরে এলেন। উদ্দেশ্য আধখাওয়া মৃতদেহটাকে উদ্ধার করা। ফিরে এসে মৃতদেহটার কোনোরকম চিহ্ন খুঁজে পেলেন না। পানি তখন ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে।

হঠাৎ ফাইসন আর তার সঙ্গীদের চোখ পড়ল পানির ভেতরে। ওখানকার সমুদ্রতল ল্যামিনারিয়া জাতীয় এক ধরনের জলজ উদ্ভিদে ভরা। ওই ভয়ংকর, কুৎসিত প্রাণীদের একটি সেই উদ্ভিদের ভেতর দিয়ে একটা বেলুনের মতো দুলতে দুলতে চলেছে। হঠাৎ করে ওই উদ্ভিদ রাজ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হলো। আরও তিনটি জলদানব এলো সেখানে। এরপর ওরা মিলে পানির মধ্যে ডুবে আধখাওয়া মৃতদেহটাকে আবার খুবলে খুবলে খেতে শুরু করল। জলজ উদ্ভিদের জঙ্গলে ঢাকা পড়ে গেছে প্রাণীগুলো।

ফাইসন আর তার সাথিরা দাঁড় দিয়ে সেখানে জোরে জোরে বাড়ি মারতে লাগল। তাদের তখন বেপরোয়া আর ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছে। জলজ ঘাসের জঙ্গলে তীব্র আলোড়ন। ফাইসন হঠাৎ দাঁড় দিয়ে আঘাত করা বন্ধ করতে বললেন। পানি থির হয়ে আসছে। লোকগুলো দেখল ঘাসের ঝোপ থেকে অনেকগুলো চোখ যেন ওদের দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে রয়েছে। আবার নড়ে উঠল ঝোপ। কুৎসিত প্রাণীগুলো ঝোপের ভেতরে থেকে বেরিয়ে ওপরে উঠে আসতে শুরু করল। মনে হলো থিকথিকে সবুজ ঘাসের পুরু আস্তরণটা যেন হঠাৎ করে ফেটে গেছে। আর তার মাঝে জেগে উঠেছে অসংখ্য শুঁড়। কিলবিল করছে। কুৎসিত, ভয়ঙ্কর দেখতে। এদিক ওদিক নড়ছে। পিচ্ছিল শুঁড়গুলো ভাসছে। ক্রমশ প্রাণীগুলো সাহসী হয়ে উঠল। একটা প্রাণী এসে ফাইসনদের নৌকোটাকে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরল। নৌকোটাকে ঠেলে উলটে দিতে চাইছে। ফাইসন এ দৃশ্য দেখে সঙ্গে সঙ্গে একটা ধারাল শিক তুলে নিল। তারপর শিক দিয়ে প্রাণপণে শুঁড়গুলোকে খোঁচাতে লাগল। অন্য লোকেরাও শিক দিয়ে প্রাণীদের শুঁড় খুচিয়ে চলল। এভাবে আক্রমণ করে জলদানবেরা শুঁড়গুলোকে নৌকোর গা থেকে খুলে নিয়ে পানির ভেতরে ডুবে গেল। এতক্ষণের উত্তেজনায় ফাইসন কাঁপছিলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন, আমাদের এখনি এখান থেকে সরে পড়তে হবে।

সবাই তখন ঝটপট করে নৌকোয় উঠে পড়ল। প্রত্যেকের মনে প্রচণ্ড ভয়। দাঁড় বাইতে লাগল ছপছপ করে। পানিতে দাঁড় ডোবানোর সঙ্গে সঙ্গে লিকলিকে সাপের মতো অসংখ্য শুঁড় দাঁড়গুলোকে জড়িয়ে ধরতে লাগল। নৌকোর দুপাশ দিয়ে শুঁড়গুলো আবার উঠে আসার চেষ্টা করতে লাগল। ফাইসন আর তার সঙ্গীদের তখন মনে হচ্ছিল ওরা বুঝি কোনো আগাছার ঘন জঙ্গলে আটকা পড়েছে। ফাইসনের সঙ্গীদের একজন ছিল ইউয়েন। সে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে শুঁড়গুলোর উপর দাঁড়ের বাড়ি মারতে লাগল। তার চোখে তখন আতঙ্কের ছায়া। দেখাচ্ছে উন্মাদের মতো। চিৎকার করে অভিশাপ দিচ্ছে রাক্ষুসে প্রাণীগুলোকে।

নৌকোর মাঝি একটি বড় ছোরা নিয়ে অনবরত শুঁড়গুলোর ওপর আঘাত করতে লাগল। অন্য আরোহীরা ভীতভাবে দাঁড় টেনে চলেছে। ফাইসন হঠাৎ পেছন দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। একটা বড় নৌকো দেখা যাচ্ছে। সে নৌকোয় জনাদশেক আরোহী। স্ত্রীলোক ও শিশুরা রয়েছে। তাদের চোখেমুখে আতঙ্কের কোনো ছাপ নেই। তারা ফাইসনদের নৌকোর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছিল। ফাইসন বুঝলেন ওরা জলদানবদের তখনও দেখেনি। তিনি চেঁচিয়ে ওদের সাবধান করে দিতে চাইলেন। তখনি নৌকোটা জোরে দুলে উঠল। নৌকোর মাঝি প্রাণপণে চিৎকার করছে। ফাইসন দেখলেন মাঝির মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত। তার ডান হাতটি ডুবে আছে পানির নিচে। নিশ্চয়ই মাঝি পানির ভেতরে হাত ঢুকিয়ে কাঠতে গিয়েছিল শুঁড়গুলোকে। তখনি শুঁড়গুলো ওর হাতকে ধরেছে পেঁচিয়ে। নৌকোর অন্যান্য আরোহীরা ধারাল শিক, দাঁড় ধরনের অস্ত্র দিয়ে পানিতে আঘাত করে যাচ্ছে।

মাঝি অনেক চেষ্টা করে পানি থেকে ওর হাতটি টেনে তুলল। ওর হাতের সঙ্গে লম্বা, বাদামি ফিতের মতো অনেকগুলো শুঁড় আটকে রয়েছে। পলকের জন্যে পানির ওপর একটা ভয়ঙ্কর মুখ দেখা গেল। এক জোড়া চোখ জ্বলছে। শুঁড়ের প্রবল টানে নৌকোটা একদিকে বেশি করে হেলে পড়েছে। হঠাৎ পা পিছলে মাঝি পড়ে গেল নৌকোর পাটাতনে। সঙ্গে সঙ্গেই আরও অনেকগুলো কুৎসিত শুঁড় পানির ভেতর থেকে উঠে এসে মাঝিকে পেঁচিয়ে ধরল। শুরু হলো প্রচণ্ড হুটোপুটি। নৌকো উলটে যাওয়ার মতো অবস্থা। শুঁড়গুলো এক সময় মাঝিকে টেনে ঝপাৎ করে পানিতে ফেলল। তারপর টেনে নিয়ে গেল নিচে। নৌকোটা সোজা হয়ে গেল। জোয়ারের টানে নৌকোটা অবশ্য তীরের পাথরগুলোর কাছে সরে এসেছে। প্রাণপণে দাঁড় টেনে ফাইসন একটা পাথরের কাছে গেলেন।

তারপর লাফ দিয়ে সেটার ওপর গিয়ে উঠলেন। পা পিছলে যাচ্ছিল তার। কোনোমতে লাফ দিয়ে পরের পাথরটায় চলে গেলেন।

হঠাৎ ফাইসন ছিটকে দুটো পাথরের মাঝে অগভীর গর্তে পড়ে গেলেন। তিনি যেন শুনতে পাচ্ছেন মাঝির আর্তনাদ। তার শরীরের ওপর দিয়ে নোনা পানির ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। ফাইসন কোনোরকমে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর চরম আতঙ্কে সামনের দিকে দৌড়াতে লাগলেন। নৌকোর অন্যান্য আরোহীরাও তার সঙ্গে দৌড়াচ্ছে। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে গাঙচিলের ঝাঁক। একটা নিরাপদ জায়গায় এসে তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এতক্ষণ যেন একটা বিভীষিকার মধ্যে ছিলেন। তাদের তাড়া করছিল ভয়ঙ্কর ধরনের শুঁড়গুলো। ফাইসন তাকালেন সমুদ্রের দিকে। রোদজ্বলা আকাশ। সমুদ্র ঝকঝক করছে। ফেনিল ঢেউ। তাদের নৌকো তীর থেকে কিছুটা দূরে ঢেউয়ের উপর ভাসছে। ফাইসনের চোখ থেকে তখনও দুঃস্বপ্নের রেশ মুছে যায়নি। সেই ভয়ংকর সমুদ্রদানবের দল। জীবন বাঁচাবার জন্যে তাদের মরণপণ সংগ্রাম। হিলহিল করে এগিয়ে আসছে কুৎসিত শুঁড়গুলো।

ফাইসনের বুক তখনও কাঁপছে। হঠাৎ তার মনে হলো পেছনের নৌকোটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। সেটাতে স্ত্রীলোক আর শিশুরা ছিল। কী হয়েছে তাদের? দুশ্চিন্তা তাকে অবসাদগ্রস্ত করে ফেলল। দিশেহারা অবস্থায় তিনি সামনের দিকে এগিয়ে চললেন। পথে যেতে যেতে হোঁচট খেতে হচ্ছিল। খানিক দূর গিয়ে আবার সমুদ্রের দিকে ফিরে তাকালেন। তার চোখ পড়ে পেছনের সেই নৌকোটা সমুদ্রের ওপর ভেসে উঠেছে। আরোহী শূন্য নৌকোটা উল্টে আছে। তলার দিক আকাশের দিকে ফেরানো।

এ ঘটনাটি ছিল ডেভে শায়ারের উপকূলে হ্যাপলোটিউথিস্‌দের সবচাইতে মারাত্মক আক্রমণ। সেখানে ভয়াবহভাবে আত্মপ্রকাশ ঘটল তাদের। আরও বহু মানুষের নিখোঁজ হওয়ার মর্মান্তিক খবর পাওয়া গেল। কর্নিশ উপকূল থেকে সামুদ্রিক মাছের ঝাঁক সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বিজ্ঞানীরা ধারণা করলেন, নিজেদের জায়গাতে খাদ্যের অভাব দেখা দেয়াতে এই ভয়ঙ্কর প্রাণীগুলো চলে এসেছিল উপকূলের কাছে। অনেকের মতে এই কুৎসিত প্রাণীগুলো কোনো ডুবন্ত জাহাজের মৃত যাত্রীদের মাংশের স্বাদ পেয়ে নরমাংশলোলুপ হয়ে উঠেছিল। এই নরমাংশের লোভেই নিজেদের জায়গা ছেড়ে উপকূলের কাছে এসেছিল।

সিডমাউথের ওই ভয়াবহ, মর্মান্তিক ঘটনার দিনে এগারোটি তাজা মানুষকে শিকার করেছিল জলদানবেরা। সেদিন ওই তীরে তাদের আর উপস্থিতির কথা জানা যায়নি। সেদিন সারা সন্ধে উপকূলরক্ষীরা। নৌকো করে পাহারা দিয়েছে। বেশ কজন লোক নিজেদের উদ্যোগে এই নৈশ অভিযানে শরিক হয়েছিল। মাঝ রাতের দিকে সিডমাউথ এর দক্ষিণ পূর্ব দিকে একটা নৌকো থেকে বেশ চেঁচামেচি শোনা গেল। সেখান থেকে লণ্ঠনের সাহায্যে আলোক সঙ্কেত পাঠানো হলো। তখন আশেপাশের সব নৌকো সেখান গিয়ে জড়ো হলো। জানা গেল ওই নৌকোর আরোহীরা তাদের নৌকোর নিচ দিয়ে ওই জলদানবদের একটা ঝাঁককে ভেসে যেতে দেখেছে। গভীর সমুদ্রের প্রাণীদের মতো তাদের দেহেও জ্বলছিল ফসফরাস। মনে হচ্ছিল সমুদ্রের কুচকুচে কালো পানির ভেতর দিয়ে যেন চাঁদের আলোয় গড়া একঝাঁক বীভৎস মূর্তি ভেসে যাচ্ছে। ওদের শুঁড়গুলো গুটিয়ে রাখা ছিল। পানির মধ্যে অনবরত ঘুরপাক খেতে খেতে প্রাণীগুলো ধীরে ধীরে দক্ষিণ পূর্ব দিকে ভেসে চলছিল। এই রকমের বর্ণনা শুনে অনেকেই উত্তেজিত হয়ে উঠল। কিন্তু তাঁদের পেছনে ধাওয়া করে যেতে কাউকে আর উৎসাহিত দেখা গেল না। সব কটি নৌকোই পাড়ি জমাল তীরের দিকে।

এই ঘটনার পর অবশ্য আর জলদানগুলোর কোনোরকম খোঁজ পাওয়া যায়নি। এর দিন বিশেক বাদে একটি জীবিত হ্যাপলোটিউথিকে মুমূর্ষ অবস্থায় ক্যালে বন্দরের তীরভূমিতে দেখা গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গেই সেটা গুলি করে মারা হয়। এরপর আর কোনো জীবিত জলদানবের দেখা পাওয়া যায়নি। জুন মাসের মাঝামাঝি একটি মৃত হ্যাপলোরকের সমুদ্র তীরে ভেসে এসেছিল। একজন চিত্রশিল্পী গিয়েছিলেন নিউলীনে সমুদ্র স্নানে। তাকে হঠাৎ দেখা যায় দুহাত তুলে চিৎকার করতে। তারপর পানির মধ্যে ডুবে গেল। বোঝা যাচ্ছিল তাকে কোনো কিছু টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

গভীর সমুদ্র থেকে মানুষের ওপর আক্রমণের এটাই হলো শেষ ঘটনা। এই ভয়ঙ্কর প্রাণীগুলোর আক্রমণ এখানেই শেষ হলো কিনা তা অবশ্য নিশ্চিত করে বলা যায় না। ধারণা করা হলো ওই ভয়াল প্রাণীগুলো গভীর সমুদ্রের যে অতল থেকে উঠে এসেছিল সেখানেই আবার তারা ফিরে গেছে।

- এইচ, জি, ওয়েলস এর কাহিনি অবলম্বনে



অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস



কালো সারসের রহস্য

বিকেল খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছে। শহরতলির এদিকটায় প্রচুর গাছপালা। নামটাও সুন্দর। ছায়াবীথি। ছড়ানো ছিটানো বাড়ি। কয়েকটা উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরি হচ্ছে। কালো পিচের রাস্তা। এখানে এলে সারাক্ষণ গাছের পাতার কেমন একটা ঝিরঝির শব্দ শোনা যায়। শাল, সেগুন, কড়ই, গামার, চাপালিশ আর ছাতিম গাছের সারি। তেলাশুর গাছের ডালে ভুবন চিলের বাসা।

ছাত থেকে একটু ঝুঁকে ভুবন চিলের বাসা দেখার চেষ্টা করে। পাশের বাড়ির বান্টিরা পায়রা পোষে। ওদের ছাতে মুলিবাঁশের মাচা। ঝাঁক বেঁধে সেখানে পায়রা নামে। রোদের ভেতরে পায়রাদের ডানা পাখিদের ডাকছে। কি আশ্চর্য, ঐ শিস শুনে ডানা মুড়ে ঝুপঝুপ করে নেমে আসে পাখিরা।

কাজলের একবার শখ হয়েছিল পায়রা পোষার। কিন্তু একদিন বান্টিদের বাগানে দেখেছিল কলাবতী ফুলের ঝোপের কাছে দুটো পায়রা মরে পড়ে আছে। বুকের কাছের মাংস খুবলানো। পুঁতির মতো টলটলে চোখ দুটো ডেঁয়ো পিঁপড়েরা খেয়ে ফেলেছে। দেখে ধক্ করে উঠেছিল কাজলের বুকটা। ইস্, পায়রার নরোম চোখ দুটো এমন করে খেয়ে ফেলেছে পিঁপড়েরা। তার তখন টেলিভিশনে দেখা হিচককের দি বার্ডস ছবিটির কথা মনে পড়ল। নিষ্ঠুর সোয়ালো পাখিরা কেমন করে ঠুকরে খেয়ে ফেলেছিল মানুষের চোখ। ঐ দৃশ্য দেখে সেদিন খুব কষ্ট পেয়েছিল

কাজল। চোখের গর্তের অন্ধকার তার শরীরে কেমন শিরশিরে এক ভয় ছড়িয়ে দিয়েছিলো।

শেষ বিকেলের রোদ যাই যাই করছে। মিষ্টি করে শিস দিচ্ছে বান্টি। আকাশ থেকে নেমে আসছে পাখিরা। কাজল পাখিদের দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ তার মনে হয় কে যেন ফিসফিস করে বলছে, জলপায়রা, জলপায়রা।

সোনালি রোদের ভেতরে যেন সরোদের টুংটাং শব্দ শোনা যায়। কাজলের মনে হয় সেই পরনে রংচটা জিন্সের প্যান্ট, গায়ে ডোরাকাটা গেঞ্জি, গলায় একটা লাল মাফলার প্যাঁচানো। লোকটি ঝুঁকে গাছের বাকলের ভেতর থেকে কি যেন বের করার চেষ্টা করছে। কাজল টেনিস খেলে ফিরছিল। সন্ধ্যায় আবছা অন্ধকার, ছায়াবীথির নিরিবিলি পথ দিয়ে ফিরতে তার কাছে বেশ লাগে। এলোমেলো বাতাসে পাতা ছমছম করে।

চাঁদের রুপোলি আলোতে কি যে অপূর্ব লাগে এ রাস্তাটা। ঐ লোকটি গাছের কাছে কি করছে? শরীর থেকে কেমন বাতাবি লেবুর মতো গন্ধ বেরুচ্ছে। কাজল দেখে জিন্সের প্যান্টের পকেট থেকে বাতাবি লেবুর পাতাঅলা ডাল বেরিয়ে আছে। কাজল এগিয়ে তাকে দেখতে পেলে লোকটি ঠোঁটে আঙুল দেয়।

: চুপ। কথা বলবে না কিন্তু। কোনো শব্দ করবে না।

: কেন! কি হয়েছে?

: তা যদি বুঝতে তাহলে তো হয়েই ছিল। এতো সোজা ব্যাপার না। লাল ফুটকি পোকাগুলো শব্দ করলে পালিয়ে যাবে বাকলের নিচে।

: লাল ফুটকি পোকা!

: অনেক কষ্টে এই ধরনের পোকার সন্ধান আমি পেয়েছি। ভারী বজ্জাত। ছাতিম গাছের পচা বাকলের নিচে এরা ঘাঁপটি মেরে থাকে। বাকলের শাঁস খায়। এদের খোঁজে আমি কম গাছের বাকল চেঁছেছি?

কাজল এসব কথার কিছুই বুঝতে পারছে না। কথা বলার সময় লোকটার আঙুল কেমন মাকড়াশার পায়ের মতো নড়তে থাকে।

: আপনি লাল ফুটকি পোকা দিয়ে কি করবেন?

কাজল এবার কৌতূহলী।

: অনেক কাজে দেবে। যারা জানার শুধু তারাই জানে। বুঝলে খোকা, জানার আছে অনেক কিছু। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি একটা গুড বয়। ঘাড় গুঁজে শুধু মোটামোটা বই মুখস্থ করেছ। আদর করে আম্মু

রাতের বেলায় হরলিক্‌স গেলায়। জান, পৃথিবীর সবচাইতে দামি খাবার হচ্ছে ভেড়ার চোখের মণি। জান, তিতির পাখির ডিমের ভেতরে অনেক সময় গুবরে পোকা পাওয়া যায়। লেবু ঘাসের ডগা দিয়ে ডাহুকের লাল কলজে সেদ্ধ করলে ভারী সোয়াদ হয়। এসব তো কিছুই জান না। কাঁচকলার ঝোল খেয়ে কি আর বুদ্ধি হয়?

কাজল একটু অবাক হয়। পাগলাটে স্বভাবের লোকটা কি করে জানলো যে তার প্রায়ই পেটের অসুখ হয়। আর তাকে কাঁচকলার সেদ্ধ খেতে হয়। কি যে বিচ্ছিরি লাগে খেতে। বাড়ির আবদুল চাচা আবার আম্মুকে উপদেশ দেয়, ভাবি, কাজলকে বেশি করে চিরতার রস খাওয়াবেন। দেখছেন না ও কেমন ডিগডিগে হয়ে যাচ্ছে।

বাড়ির লোকগুলি যেন কি! খালি তেতো ওষুধ আর পথ্য গেলাবার তালে থাকে। আবদুল চাচা প্রায়ই বাজার থেকে থানকুনি শাক কিনে আনে। অথচ এই লোকটা কি অদ্ভুত রকমের খাবারের কথা বলছে। ডাহুকের লাল টুকটুকে কলজের সাথে সবুজ লেবু ঘাসের ডগা মেশালে না জানি কি অপূর্ব স্বাদের খাবার হবে। এসব শুনেই জিভটা কেমন সুরসুর করছে। ঐ ডোরাকাটা গেঞ্জিপরা লোকটাকে তখন কেন জানি কাজলের কাছে ভালো লাগে। কেমন অন্যরকম করে কথা বলছে।

: আপনি থাকেন কোথায়?

: যেখানে-সেখানে। কখনো পানিতে থাকি, কখনো ডাঙ্গায় থাকি। উভচর বলতে পার আমাকে। কখনো তো গাছের ডালেও ঝুলে থাকি। তবে হ্যাঁ, ঠিকানা আমার একটা আছে বটে। থাকি কাঁকরতলি গ্রামে।

নামটা শুনেই কেমন চমকে গেল কাজল। এ নামটা ওর চেনা। কাঁকরতলি। পত্রিকায় খবর বেরিয়েছিল কাঁকরতলি গ্রামে রহস্যময় জন্তুর আক্রমণে পাঁচ শিশু নিহত। শিশুদের ছিন্নভিন্ন লাশ পাওয়া যায় ডোবায় আর মাঠে। পত্রিকায় সে সব লাশের ছবি ছাপা হয়েছিল।

লোকটি এবার কাজলের দিকে তীব্র চোখে তাকায়।

: তুমি আমাকে এই ধরনের আরও ছাতিম সন্ধান দিতে পার?

: পারি।

: পারো!

আনন্দে জ্বলজ্বল করে উঠল লোকটির চোখ দুটো।

: লাল ফুটকি পোকা দিয়ে আপনি কি করবেন?

: বারে। জলপায়রাদের খাওয়াতে হবে না? জান না, জলপায়রারা এসব পোকা খুব ভালোবাসে।

: আপনি বুঝি জলপায়রা পোষেন?

: একমাত্র আমিই পুষি। আর সবাই তো খালি খাওয়ার জন্যে ছুটছে। কেমন করে জলপায়রার বুকের মাংস ছিঁবড়ে খাবে। কচি হাড় চুষে খাবে। আমি, এই আমি সাঁইত্রিশ বছর ধরে জলপায়রাদের পুষছি। আমার বাড়ির নামও রেখেছি জলপায়রা হাউস।

বলে লোকটি হো হো করে হেসে উঠল। সামনের তেলাশুর গাছের ডাল থেকে কয়েকটি পাখি পতপত পরে ডানা মেলে পালিয়ে গেল। আর তখন সেই ছাতিম গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কাজলের কেমন শীত শীত করতে লাগল।

লোকটির মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ধারলো নাক। বাঁ গালে লাল জড়ুল। রংচটা জিন্সের প্যান্টে কয়েকটা তালি। দেখলেই মনে হয় কোনো বিদেশি জাহাজডুবির নাবিক। দ্বীপ থেকে দ্বীপে ঘুরে বেড়ায়। কেন জানি কাজলের মনে হলো এই লোকটির কাছে রহস্যময় কোনো অঞ্চলের গুপ্ত খবর হয়ত আছে।

লোকটি পকেট থেকে একটি প্লাস্টিকের শিশি বের করে সাবধানে তার ভেতরে পোকাগুলো রাখে।

: বুঝলে, এই পোকার গাছ বাছাই করতেই আমরা এখানে আসা।

ঝোপে-ঝাড়ে জোনাক জ্বলছে। অনেক দূরের রাস্তা দিয়ে একটা ট্রাক চলে যাওয়ার শব্দ শোনা যায়। দূরের ফ্লাটবাড়িটার জানালার কাঁচের ভেতর দিয়ে নীল আলো দেখা যাচ্ছে। আকাশের দিকে তাকায় কাজল। কতো তারা ঝিকমিক করছে। ছায়াবীথির বাড়িগুলোর ছাদ থেকে চমৎকার আকাশ দেখা যায়। তাদের জালে টিভি এন্টেনায় এখানো এখানকার আকাশ ঢাকা পড়েনি। লোকটি একটু নেমে আসে কাজলের কাছে। কাজলের কাঁধে হাত রাখে।

: শোন, আমার সাথে তাহলে তোমার বন্ধুত্ব হোক। আমি বুঝতে পারছি তুমি অনেক গাছপালার খবর রাখ। তোমার শরীরে আমি গাছের পাতার সবুজ কষটে গন্ধ পাচ্ছি। আমি প্রতি শনিবার সন্ধেবেলায় এখানে আসব। লাল ফুটকি পোকার খোঁজে। আমার নাম হল তিমুর চান। কাঁকড়তলী তিমুর চান।

তোমার নামটা বল?

: আমার নাম কাজল।

: ব্যস। আজ হতে তোমার সাথে আমার চুক্তি হয়ে গেল। তিমুর চানের সাথে কাজলের চুক্তি। কাজল তিমুর চানকে লাল ফুটকি পোকার খোঁজ দেবে। মনে রাখবে এসব পোকা দরকার জলপায়রাদের জন্যে। আর এসব জলপায়রা অনেক দূর দেশ থেকে আনা। লাদাকের জলপায়রা। খুব দুর্গম জায়গা লাদাক। সেখানকার সরোবরের পাশের পদ্মবনে আছে এসব দুষ্প্রাপ্য সবুজ জলপায়রা। আমি অনেক কষ্ট করে এদের এনে পুষছি। যাই কাজল, আমার আবার অনেক কাজ বাকি। মনে থাকে যেন কাঁকরতলীতে আমার বাড়ি। জলপায়রা হাউস।

বলে লোকটি যেন অন্ধকারের ভেতরে ফুড়ুৎ করে মিলিয়ে গেল। চারপাশে গাছের পাতা কাঁপিয়ে হঠাৎ একটা দমকা বাতাস বয়ে গেল। আর পাশের গাছ থেকে ঝুপ করে কি যেন একটা পড়ল। টেঁ টেঁ করে শব্দ।

কাজল তাকিয়ে দেখে একটা ভুবন চিলের ছানা পড়ল মাটিতে। আবছা অন্ধকারের ভেতরে বাচ্চাটা যেন নড়ছে। সামনের ঝোপটা সরসর করে উঠল। কাজল দেখল একটা শেয়ারের মতো প্রাণি ছুটে বেরিয়ে এসে সেই বাচ্চাটাকে মুখে তুলে লাফ দিয়ে পালিয়ে গেল।

ছায়াবীথির সেই নিরিবিলি সড়কে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কাজলের মনে হলো তার শরীরে বুঝি ভুবন চিলের বাচ্চার রক্তের ছিটে এসে পড়েছে। হঠাৎ পায়ের কাছে শক্ত কি যেন একটা লাগল। নুয়ে দেখে ছোট্ট একটা পাখির মূর্তি। পাখিটাকে দেখে মনে হল পায়রা। চকচক করছে মূর্তিটা। কোনো ধাতু দিয়ে তৈরি কাজল ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। এই মূর্তিটা কি লোকটার জিন্সের প্যান্টের পকেট থেকে পড়ে গেছে? সেই মূর্তিটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলো কাজল।

আশ্চর্য হয়ে অনুভব করল মুঠোর ভেতরে মূর্তিটা নড়ছে। যেন ডানা ঝাঁপ্টাচ্ছে। দারুণ ভয় পেয়ে মুঠো খুলল কাজল। আর ঠিক তখনই তেলাশুর গাছের উপর থেকে মা ভুবন চিলটা চিৎকার করে ডেকে উঠল।

ছায়াবীথি নিরিবিলি রাস্তাটা দিয়ে কেমন আচ্ছন্নের মতো বাড়িতে ফিরে এল কাজল। হাতের মুঠোর চেপে রাখা জলপায়রার মূর্তিটাকে একটু শীতল লাগছে। কাঁকরতলী তিমুর চান নামের সেই রহস্যময় লোকটা আবার আসবে আগামী শনিবার সন্ধ্যায়। লাল ফুটকি পোকার খোঁজে। এই সাতদিন তাকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

দোতলার বাঁ দিকের ঘরটা কাজলের। দেয়ালে বেশ কটি পোস্টার। পৃথিবীর কয়েকটি রহস্যময় অঞ্চলের ছবি নিয়ে এই পোস্টারগুলো প্রকাশ করেছে আমেরিকান একটি শিশুসাহিত্যের প্রকাশনা গ্রুপ। কাজলের ছোটকাকু থাকে টেক্সাস। এখার থেকে ফেরার সময় কাজলের জন্যে এক সেট ছোটদের ঝলমলে বিশ্বকোষ নিয়ে এসেছিল। তার সাথেই ছিল পোস্টারগুলো। ইস্টার দ্বীপের রহস্যময় মূর্তিগুলোর ছবি। পেরুর নাজকা মরুভূমির জ্যামিতিক নকশার ছবি। টিয়েরা দেল ফুয়েগো দ্বীপের অদ্ভুত কাউকেন পাখির। ইন্দোনেশিয়ার কোমডো দ্বীপের ড্রাগনের ছবি। বিছানায় শুয়ে এসব পোস্টারের দিকে তাকিয়ে কখনো কখনো কাজল কেমন এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করে। আবছা আলোতে মনে হয় কোমডো দ্বীপের ড্রাগনটার বুঝি লিকলিকে জিভ দিয়ে আগুনের শিখা ছুঁড়ে দিচ্ছে। র‍্যাকের ওপর জলপায়রার মূর্তিটা রাখল। আবদুল চাচার আসার শব্দ শোনা যাচ্ছে। একটু গজগজ করতে করতে আসছে। ঐ এক স্বভাব আবদুল চাচার, আপন মনে কথা বলা। নিশ্চয়ই দেরি করে ফেরার জন্যে কথা শোনাবে। এ বাড়িতে অনেকদিন থেকে আছে আবদুল চাচা। সবুজ পর্দা সরিয়ে ঢুকলেন আবদুল চাচা।

: বলি এই রকম করলে কি চলবে কাজল? শরীর তো খারপ হয়ে যাবে। তোমার জন্যে ছোট চিংড়ি দিয়ে বড়া বানালাম। কুমড়ো ফুল ভেজে রেখেছি। তুমি তো আবার এসব খেতে খুব পছন্দ কর।

: আবদুল চাচা, খাবার কথা থাক। আজ একটা দারুণ ব্যাপার ঘটে গেছে। আমি এই মূর্তিটা কুড়িয়ে পেয়েছি।

কাজল র‍্যাক থেকে জলপায়রার মূর্তিটা তুলে আবদুল চাচার সামনে ধরে।

: কই, দেখি তুমি কি পেয়েছে?

: এই যে এইটা।

বারান্দা থেকে নীল বালবের আলো এস ঠিকরে পড়েছে মূর্তিটা উপরে। ওটা দেখেই কেমন যেন চমকে উঠলেন আবদুল চাচা।

: আরে! এ যে দেখছি বাওয়ালীদের মূর্তি। সুন্দরবনে এক ধরনের বাওয়ালী যায় যারা এই মূর্তিকে সঙ্গ রাখে। আমি পনের বছর সুন্দরবনে ছিলাম। ওখানকার সব খবর আমার জানা। এই ধরনের পায়রার মূর্তি দিয়ে বাওয়ালীদের গুনীনরা বাঘকে বশ করে। তুমি এটা কোথায় পেলে?

: ছায়বীথির রাস্তায় আমি কুড়িয়ে পেয়েছি।

: এখানে! আশ্চর্য! সুন্দরবনে গুনীনদের মূর্তি এখানে এলো কি করে? কাঁকরতলী গ্রামে এক বাওয়ালীদের গুনীন থাকে জানি।

কাঁকরতলী নামটা শুনেই কাজল বুঝতে পারে জিনসের প্যান্ট পরা সেই রহস্যময় লোকটা আসলে ছিল একজন গুনীন। লোকটা কথা আবদুল চাচাকে জানায় না। কাজলের কৌতূহল ক্রমশ ঘন হচ্ছে।

: আচ্ছা আবদুল চাচা, তুমি আমাকে বলবে সুন্দরবনে কেমন গুনীনরা এই মূর্তি ব্যবহার করে?

: এত রাতেরবেলায় এসব কথা শুনতে নেই বাপু। আর এসব শুনে লাভটাইবা কি হবে? তুমি ভাবতেও পারবে না গুনীনরা কি রকম আশ্চর্য ধরনের মানুষ। চল চল খেতে চল। চিংড়ি মাছের বড়া বোধ হয় এতক্ষণে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

: না, আবদুল চাচা। আমি এখন চিংড়ি মাছের বড়া খাব না। আগে তুমি আমাকে সুন্দরবনের গুনীনের কথা বল।

আবদুল চাচা ভালো করেই জানে কাজল খুব জেদী ছেলে। একবার যখন মাথায় ঝোঁক চেপেছে তখন তাকে বলতেই হবে। বিছানার একপাশে বসলেন আবদুল চাচা। পাশে বাড়ির ক্যাসেট পেয়ার থেকে সেতারের শব্দ মৃদুভাবে শোনা যাচ্ছে। জানালার বাইরে তাকালেন আবদুল চাচা। মানিপ্লান্টের লতা বুঝছে। তাকে এখন কেমন উদাস দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে আবদুল চাচা বুঝি শালতি ডিঙ্গি বেয়ে হোগলা আর শরখড়ির বন চিরে এগিয়ে যাচ্ছে।

: বুঝছে কাজল, হোগলা বনের কথা ভুলতে পারি না। ওখানে ছোট ছোট দ্বীপ আছে। সেসব দ্বীপে ফনীমনসা, হিজল, হরকোচের জঙ্গল। চৈত্র মাসে গোলগাছে ফুল ফোটে। আমরা যেতাম ঐ ফুলের রস সংগ্রহ করতে। ফুলের লম্বা ডগা কেটে সেখানে ঘটি বেঁধে রাখতাম। খুব মিষ্টি রস। অনেকটা কচি তালশাঁসের রসের মতো। গুনীনরা বাঘ বশ করার সময় এই রস খেয়ে নেয়। জলপায়রার মূর্তি দিয়ে অনুষ্ঠান করে গহীন বনে। তুমি ভাবতে পারবে না কাজল কি সব কাণ্ড ঘটে বনে। আমি দেখতাম আর অবাক হতাম। বাদা অঞ্চলে বেঁচে থাকার কায়দাই আলাদা। ওখানে প্রতি মুহূর্তে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়। গরান গাছের পাতায় দেখেছি লাল পিঁপড়ের চাক। এ চাক ভেঙে মাছ ধরতাম।

কাজলের কাছে আবদুল চাচাকে এখন কেমন বুনো লাগছে। মনে হচ্ছে তার শরীর থেকে লতাপাতার একটা বনজ ঝাঁজালো গন্ধ উঠে

আসছে। আবদুল চাচা যেন হোতাল বনের ভেতরে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যাচ্ছে মাছ ধরতে।

: আচ্ছা আবদুল চাচা, তুমি ওখানে আর কি করতে?

: পাখি ধরতাম। জলপিপি, বালিহাঁস, পানকৌড়ি. ডাহুক। এগুলো ধরে ধরে জবাই করে ঝোলার মধ্যে পুরে রাখতাম। আমি এসব পাখির মাংস বাওয়ালীদের কাছে বিক্রি করতাম। শীতকালে মনসাপোতার জঙ্গলে রাজহাঁসরা আসত। এরা আসত দক্ষিণ মহাসাগর থেকে। আরো পাওয়া যেত শামুকখোল আর মানিকজোড় পাখি। কাঠশোলার জঙ্গলে এসব পাখি মারতে দারুণ নেশা। সব পাখি মারা যাবে। কিন্তু জলপায়রা মারা যাবে না।

: কেন, কেন?

: কারণ ওটা ছিল গুনীনদের কাছে বশ করার পাখি। শুনেছি লাদাকের সরোবর থেকে এসব জলপায়রা আসত। লাদাকে থাকে লামা পুরোহিতেরা। তাদের সাথে গুনীনদের স্বভাব-চরিত্রের বেশকিছু মিল আছে।

কাজলের তখন মনে পড়ল তিমুর চান জানিয়েছিল সে দুর্গম লাদাক থেকে এসব পাখি সংগ্রহ করেছিল। ঘটনাগুলো কেমন যেন বিনি সুতোর মালার মতো একটার সাথে আরেকটা মিলে যাচ্ছে। একটা যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছে কাজল। আবদুল চাচার কাছ থেকে আরো কিছু তথ্য বের করতে হবে।

: তুমি মানিকজোড়ের মাংস খেয়েছ?

: খাইনি মানে? লাল মরিচের ঝোলের ভেতর ভাসছে মানিকজোড়ের মাংস। নৌকোর ভেতরে রান্না করেছি মাটির পাতিলে। কখনো বৃষ্টি নেমেছে। সেকি ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি। গায়ে ঠাণ্ডায় কাঁটা দিয়ে যায়। ঐ রকম পরিবেশে ফ্যালসা গরম ভাতের সাথে মানিকজোড়ের মাংস ঝোলসহ মাখিয়ে খেতে যে কি সোয়াদের!

: আবদুল চাচা। তুমি শুধু আমাকে কাঁচকলার সেদ্ধ, থানকুনি শাকের ভর্তা আর পটলের ঝোল খেতে দাও। মানিকজোড় আর শামুকখোলের মাংস খাওয়াতে পার না।

: খাওয়াবো খাওয়াবো। সামনের শীতেই খাওয়াবো। তেলতেল মাংস। তোমার শরীরটা একটু ভালো হয়ে উঠুক।

হঠাৎ বিছানা থেকে ঝট করে জলপায়রার মূর্তিটা মাটিতে পড়ে যায়। কাজল ঝুঁকে তুলতে যায় মূর্তিটা। মূর্তিটা যেন এক ঝটকা মেরে গড়িয়ে গেল। কি আশ্চর্য! মূর্তিটা কি জীবন্ত হয়ে উঠল নাকি! ফ্যাঁচ করে একটা শব্দ। পাশের বাড়ির কুচকুচে কালো বেড়ালটাকে দেখা গেল বারান্দার কার্নিশে। বেড়ালটা কেমন ঘাড়ের লোম ফুলিয়ে জলপায়রার মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে আছে। আবদুল চাচা চমকে একটু পেছনে সরে গেলেন। বিড়বিড় করে কি যেন বলতে লাগলেন। মূর্তিটা আবার একটা পাক খেল। কালো বেড়ালটা এবার লাফ দিয়ে নেমে এল ঘরে। তারপর সন্তর্পণে এগিয়ে যেতে লাগল মূর্তিটার দিকে। কাজল মুখে শব্দ করে বেড়ালটাকে তাড়িয়ে দিতে চাইল। বারান্দা থেকে ছিটকে আসা নীল আলোতে মূর্তিটাকে এখন কি রকম অদ্ভুত দেখাচ্ছে। বেড়ালটা একটা থাবা বসাল মূর্তিটার উপর। তারপরেই শোনা গেল কালো বেড়ালের ভয়ঙ্কর এক মরণ চিৎকার। কেউ যেন তার বুকের ভেতরে ধারালো ফলা গেঁথে দিয়েছে। বেড়ালটা প্রচণ্ড আকস্মিকতায় কাজল আর আবদুল চাচা হতভম্ব হয়ে গেছে। আবদুল চাচা দেয়ালের সাথে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জলপায়রার মূর্তিটার দিকে। কেমন ফিসফিস করে আবদুল চাচা বলল—

: কাজল, এ তো অভিশপ্ত মূর্তি। কোনো কোনো বাওয়ালীর কাছে শোনা গেছে লাদাকের পাহাড়ি গুহাতে থাকে ভয়ঙ্কর লামারা। যারা এসব মূর্তি বানায় অনেক সাধনা করে। তাদের বলে প্রেতসিদ্ধ লামা। এই মূর্তি দিয়ে অনেক ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটানো হয়। খুব দুষ্প্রাপ্য এ ধরনের মূর্তি। মন্ত্র পড়ে একে জীবন্ত করা যায়। কিন্তু এখানে এ রকম মূর্তি!

আবদুল চাচাকে এখন ভয়ার্ত দেখাচ্ছে।

: তবে কি কেউ দূর থেকে মন্ত্র পড়ে এই মূর্তিটাকে জীবন্ত করার চেষ্টা করছে?

কি মনে হওয়াতে কাজল বারান্দায় আসে। নিচের বাগানের কোনায় একটা লোককে দেখা যাচ্ছে। বারান্দার আবছা আলোতে লোকটাকে চিনতে পারে কাজল। তিমুর চান। ওদের বাড়ির কুকুরটা ছুটে আসছে। সাঁৎ করে পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে পেছনের ঝোপে অদৃশ্য হয়ে গেল তিমুর চান।

কাজল কেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। নিচে দারোয়ানের গলা শোনা যায়। তিমুর চান কেন ফিরে এসেছিল? ঐ জলপায়রার মূর্তিটার খোঁজে কি?

নিচের বাগান থেকে কুকুরটার গোঙ্গানির মতো শব্দ শোনা যাচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল দারোয়ান। কাজলকে সামনে দেখেই বলল, ছোট সাব। একটা লোক কুকুরটাকে ফাঁস লাগিয়েছে।

কাজল তরতর করে নেমে গেল বাগানে। কামিনী গাছের ঝোপের নিচে দুমড়ে পড়ে আছে কুকুরটা। গলায় সবুজ রেশমের দড়ির ফাঁস। কুকুরটার মুখ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে।

কাজলের চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। তার খুব প্রিয় ছিল কুকুরটা। স্কুল থেকে ফিরে এলে পায়ের কাছে ঘুরঘুর করত। তিমুর চান কেন ফাঁস লাগিয়ে মারল কুকুরটাকে? আবদুল চাচা পেছনে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করছে।

: কি আশ্চর্য! এই রকমের ফাঁস দিয়ে তো লাদাকের গুনীনরা কালো সারস মারে জানতাম। কাজল পেছনে তাকায়।

: তুমি কালো সারসদের কথা কি বলছ আবদুল চাচা?

: খুব রহস্যময় পাখি। লাদাকের কালো সারস। তারা এমন একটা পাহাড় থেকে আসে যেখানে নাকি লামা পুরোহিতদের গুপ্তধন লুকানো আছে। সেই গুপ্তধনের পাহাড়ের খোঁজে লাদাকে যায় অনেক লোভী মানুষ। তাদের কেউ কেউ লামাদের সাহায্যে এভাবে সবুজ রেশমের ফাঁস দিয়ে কালো সারসদের হত্যা করে।

: কিন্তু কেন?

: লামারা বিশ্বাস করে কোন কালো সারসের পেটে লুকানো আছে একটি সোনার চাবি। যা দিয়ে গুপ্তধনের নিচের লুকানো হিরে জহরতের বাক্সটা যাবে খোলা। সেই বাক্সে আছে পায়রার ডিমের মতো বড় সব হিরে।

অনেক কিছু জানে আবদুল চাচা। কত বনে জঙ্গলে পাহাড়ে কাটিয়েছে দিনের পর দিন। একটা যাযাবর পাখির মতো ঘুরে বেরিয়েছে। ডুয়ার্সের গহীন জঙ্গলে একবার তুষারচিতার সাক্ষাৎ পেয়েছিল। তুষারচিতাটা আবদুল চাচার দিকে নীল চোখ মেলে তাকিয়েছিল। যে তুষারচিতাকে সহজে দেখা যায় না। সেই গল্প আবদুল চাচার কাছে রোমাঞ্চিত হয়ে শুনেছিল কাজল।

কিন্তু তিমুর চান কেন হত্যা করল তার কুকুরটাকে? আমাদের প্রিয় কুকুরটা। দারোয়ানটার চোখ ছলছল করছে। কুকুরটাকে সে নিজ হাতে খেতে দিত। এই বাড়ির পাহারায় তার সাথে কুকুরটা ছিল কতদিন

থেকে। আজ দারোয়ানটা যেন তার একটা প্রিয় সঙ্গীকে হারিয়ে ফেলেছে।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে কাজল। তিমুর চানকে খুঁজে বার করবে সে। যাবে কাঁকরতলী গ্রামে। আগামী শনিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না। লাল ফুটকি পোকার খোঁজে আবার যে ছাতিম গাছের কাছে আসবে তিমুর চান তার নিশ্চয়তা কি?

কাঁকরতলী গ্রামে যাবে সে। তিমুর চান তাকে জানিয়ে গেছে সেখানে তার বাড়ির নাম জলপায়রা হাউস।

: আবদুল চাচা। তুমি কাঁকরতলী গ্রাম চেনো?

: নাম শুনেছি। ওখানে কয়েক ঘর বাওয়ালী থাকে।

আবদুল চাচা আবার বিড়বিড় করে বলছে, সবুজ রেশমী দড়ির ফাঁস–সবুজ রেশমী দড়ির ফাঁস।

কাজল মৃত কুকুরটার সামনে গিয়ে নুয়ে বসে। তারপর সাবধানে কুকুরটার গলা থেকে রেশমী দড়ির ফাঁস খোলে। এ যেন কাউবয়দের ল্যাসো ছুড়ে বুনো ঘোড়া আটকাতে পারে।

কাজল বুঝতে পারে সে একটি গভীর রহস্যময়তার ভেতরে জড়িয়ে যাচ্ছে। যেখানে কাঁকরতলী গ্রামের তিমুর চান জড়িত। যে গ্রামে রহস্যময় জন্তুর থাবায় শিশুদের ক্ষতবিক্ষত লাশ পাওয়া যায়। এর সাথে দুর্গম পাহাড়ি দেশ লাদাকও জড়িত। যেখানে সরোবরের পাশের পদ্মবনে আছে জলপায়রাদের বাসা।

জলপায়রা। জলপায়রা। ফিসফিস করে তার কানের কাছে কেউ যেন জলপায়রাদের ডাকছে। তবে কি তিমুর চান এখানো আশেপাশে কোন ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে আছে? লুকিয়ে থেকে ঈগলের মতো চোখ দিয়ে তাকে দেখছে? আর তার দিকে রহস্যময় শব্দের তরঙ্গ ছুঁড়ে তাকে হিপনোটাইজ করার চেষ্টা করছে?

কাজলের মনে হল তার কপালের বাঁ দিকের শিরা দপদপ করছে। হঠাৎ দূরের একটা ঝোপে নীল আলোর ঝিলিক দেখতে পেল সে। কাজলের মনে হল তার চারপাশে যেন নীল কুয়াশা ঘন হয়ে উঠেছে। আর সেই কুয়াশার ভেতরে দিয়ে ডানা ঝাঁপটে ছুটে আসছে অসংখ্য জলপায়রা। পায়রাগুলো তাদের কোমল ডানা দিয়ে কাজলকে ঘিরে ফেলতে চায়। কপালের যন্ত্রণাটা বেড়ে যাচ্ছে কাজলের। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে তিমুর চানের মাকড়শার পায়ের মতো লিকলিকে

আঙুলগুলো এগিয়ে আসছে। মাথাটা চক্কর মেরে ওঠে কাজলের। ঘুরে পড়তে যাবার আগে কামিনী গাছটাকে কোনোমতে আঁকড়ে ধরে। আবদুল চাচা আর দারোয়ান দৌড়ে আসে। শশব্যস্ত হয়ে ওঠেন আবদুল চাচা।

: কি হয়েছে কাজল? তোমার শরীর খারাপ লাগছে? দারোয়ান ছোট সাহেবকে ধর তো। ধরে ঘরে নিয়ে চল।

ওরা কাজলকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়। ফুল স্পিডে ফ্যানটাকে ছেড়ে দেয়। আবদুল চাচা নিয়ে আসে এক গ্লাশ শরবত। ওটা খাবার পর কাজলের শরীরটা ঝরঝরে হয়ে যায়।

: আবদুল চাচা। আমি ঘুমুতে যাই। শরীরটা খুব খারাপ লাগছে।

আবদুল চাচা আর দারোয়ান ঘর থেকে চলে যায়। লাইট নিবিয়ে দেয় কাজল। একরাশ অন্ধকার এসে ঘরের ভেতরে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাথাটা এখনো দপ্‌দপ্‌ করছে তার। বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে চোখ দুটো যেন জ্বলছে। নীল আলোর দুটো ফোঁটা মনে হয়। কাজল অবাক হয়ে দেখে ঐ চোখে দুটোর ভেতর থেকে একটা নীল আলোর শিখা বেরিয়ে আসছে। মৃদু শিসের মতো একটা শব্দ শুনে কাজল পর্দা সরিয়ে বাগানের পেছনের ঝোপের দিকে তাকায়। সেখানটায় সে একটু আগে নীল আলোর ঝিলিক দেখতে পেয়েছিল। ওখান থেকে আরেকটা আলোর শিখা বেরিয়ে আসছে। দুটো আলোর শিখা এক বিন্দুতে এসে মিলিত হয়। তারপর আকাশের দিকে উঠে যেতে থাকে আরেকটি নীল আলোর শিখা। কাজল অবাক বিস্ময়ে দরজা খুলে বারান্দায় আসে। আকাশের দিকে তাকিয়ে চমকে যায়। শিখাটিকে লক্ষ্য করে উপরের দিকে তাকায়। একটা আলোর চাকতি স্থির হয়ে ভেসে আছে। চাকতিটি আরেকটু নামে। তারপর সাঁৎ করে মিলিয়ে যায়। স্তম্ভিত হয়ে যায় কাজল। সেকি তাহলে ফ্লাইং সসার দেখেছে! এক অজানা আনন্দে কাজলের শরীর থরথর করে ওঠে। উত্তেজিত হয়ে পড়ে। সে ফ্লাইং সসার দেখেছে। আর হয়তো কেউ দেখেনি। কথাটা কাকে বলবে সে! কি প্রচণ্ড কৌতুহল তার ফ্লাইং সসার সম্পর্কে। সেই ছোটবেলা থেকে পত্রিকায় যেখানে উড়ন্ত চাকতির কথা দেখেছে তখনি তা আগ্রহ নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছে। উড়ন্ত চাকতির রহস্যের প্রতি কাজলের প্রচণ্ড কৌতূহল। অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছে সে। যত তথ্য যেখানে পেয়েছে। সব সুন্দর করে কেটে একটি ফাইলে রেখে দিয়েছে। নিজেকে এখন কাজলের দারুণ এক ঘটনার নায়ক বলে মনে

হচ্ছে। একটু আগে আকাশের বুকে সে যা দেখেছে সেটা যদি সত্যি সত্যি উড়ন্ত চাকতি হয় তবে তার জীবনে আজকের রাতটি এক স্মরণীয় রাত। সেই সন্ধে থেকেই পরপর অনেকগুলো রহস্যময় ঘটনা ঘটে গেল। ছাতিম গাছের নিচে বাতাবি লেবুর গন্ধমাখা শরীরের তিমুর চান নামের এক আশ্চর্য লোককে দেখা। যে তার পোষা জলপায়রার খাবারের খোঁজে লাল ফুটকি পোকার জন্যে ছাতিম গাছের বাকল চাঁছছে। সেখানেই পাওয়া গেল জলপায়রা মূর্তিটা। তার প্রিয় কুকুরটিকে মারলো সবুজ রেশমী দড়ির ফাঁস দিয়ে। বাগানের ঝোপের ভেতরে দেখল নীল আলোর ঝিলিক। জলপায়রার মূর্তি চোখ থেকে অন্ধকার রাতে বেরিয়ে আসা নীল আলোর শিখা মিশে যায় বাগানের ঝোপ থেকে আসা নীল আলোর শিখার সাথে। সেটার গতি লক্ষ্য করতে গিয়ে কাজল একটু আগে আকাশে দেখেছে উড়ন্ত চাকতিকে।

আবার তার শরীরের ভেতরে একটি শিহরণ বয়ে যায়। টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে বাঁ দিকের ড্রয়ার খুলে লাল রঙের ফাইলটি বের করে। এটার ভেতরেই আছে উড়ন্ত চাকতি সম্পর্কে তার জমানো বিস্ময়কর তথ্যগুলো। জলপায়রার মূর্তিটিকে তুলে এনে টেবিলের উপর রাখে। এখন এটাকে একটি স্বাভাবিক মূর্তি মনে হচ্ছে। কি এক কৌতূহলে ফাইলের পাতা উল্টাতে থাকে কাজল। কত যে বিচিত্র তথ্য এই উড়ন্ত চাকি সম্পর্কে। পৃথিবীর মানুষের কাছে এক বিস্ময়।

নীল নদের তীরে যখন ফারাওরা রাজত্ব করত তখন আকাশে দেখা গিয়েছিল এই রহস্যময় যানকে। তখন মানুষেরা নীল নদের তীরে জন্মানো প্যাপিরাস নামের এক ধরনের নলখাগড়ার ছাল থেকে তৈরি করত কাগজ। তখন বড় বড় পাথর কেটে তৈরি হচ্ছিল পিরামিড। মৃত মানুষের দেহ মমি করে রাখা হত। সেই সময় হঠাৎ একদিন দেখা গেল আকাশ থেকে বেরিয়ে আসছে কয়েকটি আগুনের গোলা। তা দেখে ফারাওয়ের সৈন্য ছুটে এল। তারা ভাবল নিশ্চয়ই অন্য দেশ থেকে আক্রমণ করতে কেউ আসছে। আকাশের দিকে তারা অস্ত্র নিক্ষেপ করল। কিছুক্ষণ দেখা দিয়েই সেই আগুনের গোলকগুলি হঠাৎ করে মিলিয়ে গেল। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল সেই রহস্যময় বস্তুর কথা। প্যাপিরাসের পাতায় লেখা হল এই আশ্চর্য জিনিস দেখতে পাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা। সেটাই প্রথম উড়ন্ত চাকি দেখার বর্ণনা।

কাজল ফাইলের পাতা থেকে চোখ তুলে জলপায়রার মূর্তিটার দিকে তাকায়। জলপায়রার চোখ কেমন জ্বলজ্বল করছে। বাতাসে ভেসে আসছে কামিনী ফুলের গন্ধ। জানালা গিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকায়। নক্ষত্রগুলো মনে হচ্ছে যেনো সোনালি খই। না, উড়ন্ত চাকিটাকে আর দেখা যাচ্ছে না।

আবার ফাইলের পাতায় চোখ কাজলের। প্রাচীনকালে লাতিন আমেরিকাতে মায়া সভ্যতা ছিল। সে সময়েও তারা তৈরি করেছিল সিঁড়ি পিরামিড। মায়া সভ্যতার লোকেরা মাথায় পড়ত পাখির রঙিন পালক। তাদের একটি পুঁথিতে এক অদ্ভুত পাখির কথা রয়েছে। বিশাল এক ঈগলের কথা। যে ঈগল আকাশ থেকে বেরিয়ে এসে নেমে আসে পৃথিবীর মাটিতে। পাহড়ি এলাকার অধিবাসীরা চাষ করার সময় অবাক হয়ে দেখল ঘাস জমির উপর নেমে আসছে একটা বিরাট পাখি। এত বড় পাখি তারা কখনো দেখেনি। আরও অবাক হওয়ার পালা। ঈগলের ঠোঁট হঠাৎ করে খুলে যায়। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে চারটি অদ্ভুত ধরনের প্রাণি। পাহাড়ি লোকেরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। মায়া পুঁথির সেই প্রাণিদের সম্পর্কে লেখা আছে তারা মানুষের মতো বাতাস গ্রহণ করত না।

ঠক্ করে একটা শব্দ হতেই চমকে তাকায় কাজল। বারান্দায় রেলিং-এর উপর সেই কুচকুচে কালো বিড়ালটা বসে আছে। প্রাচীন মিসরের লোকেরা নাকি বিড়ালের মমি বানিয়ে রাখত। কালো বিড়ালটা জলপায়রার মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছে। অন্ধকারে বিড়ালটার চোখ দুটিকে নীল আলোর ফোঁটা মনে হচ্ছে। হঠাৎ বিড়ালটা বাগানে লাফ দিয়ে নেমে যায়।

ফাইলের এক পৃষ্ঠায় এক প্রাচীন রোমান ক্যাথলিকের বর্ণনা। সেখানে বলা হয়েছে খ্রিষ্টপূর্ব ২১৬ সালে মহাশূন্য থেকে অদ্ভুত ধরনের এক জাহাজ পৃথিবীতে আসলো।

সেই তখন থেকেই মানুষের কৌতূহল। ভিন গ্রহে কি প্রাণ আছে? যদি থাকে তাহলে কেমন তাদের চেহারা? কেমন তাদের আকার? মহাকাশে কি পৃথিবীর মতো আরো কোনো বুদ্ধিমান প্রাণি আছে? সুদূর মহাকাশের দূর-দূরান্ত থেকে ভেসে আসছে বেতার তরঙ্গ। সেগুলো রেডিও টেলিস্কোপের সাহায্যে ধরা হচ্ছে। বিপ বিপ করে সিগনাল আসছে। কম্পিউটারের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে এই রহস্যময় বেতার সংকেতের। ১৯৫৯ সাল থেকে এভাবে রেডিও টেলিস্কোপের সাহায্যে

অন্য নক্ষত্র জগত থেকে আসা রেডিও সিগনাল ধরা শুরু হয়। তখন কাছের দুটি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। নক্ষত্র দুটি হচ্ছে এরিডানি ও তাউ সেটি।

১৯৬০ সালে একজন চীনা প্রত্নতাত্ত্বিক চিপুতে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রবন্ধ লিখলেন। তিনি বললেন, পৃথিবীতে বার হাজার বছর আগে প্রথম গ্রহান্তরের মানুষ এসেছিল। অনেক বছর ধরে তিনি বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকায় ঘুরেছেন পুরাকীর্তির খোঁজে। ১৯৩৮ সালে চীন-তিব্বত সীমান্তের বাইয়ান কারাউলা পাহাড়ের এক কোনায় হঠাৎ করে সারি সারি অনেকগুলো কবর খুঁজে পেলেন। নির্জন এলাকায় সেই কবরগুলো বুনো আগাছায় ঢাকা পড়েছিল। সেই সব কবরে জমাট বাঁধা পাথরের মতো কঙ্কাল ছিল। যাদের শরীর ছোট কিন্তু মাথা দেহের তুলনায় বড়। আশ্চর্যের ব্যাপার হল সেই সব কঙ্কালের পাশে কয়েকটি গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো ডিস্ক পাওয়া গিয়েছিল। সেগুলি ছিল দুই সেন্টিমিটার পুরু। রেকর্ডের মত খাঁজকাটা ছিল। ঐ খাঁজগুলোর ভেতরে প্রাচীন সাংকেতিক লিপি ছিল।

বিজ্ঞানীরা ঐ সংকেতিক লিপি পাঠোদ্ধারের জন্যে সাধনা শুরু করলেন। বছরের পর বছর চলে গেল। ঐ সাংকেতিক লিপির রহস্য আর ভেদ হয়নি। বিশ বছরের আপ্রাণ চেষ্টার পর পিকিং একাডেমির এক অধ্যাপক উমনুউ সেই লিপির পাঠোদ্ধার করলেন। তিনি ছিলেন প্রাচীন ইতিহাসের অধ্যাপক। ডিস্কের এক অংশে লেখা ছিল আমাদের মহাশূন্যযানটি নিকটস্থ পর্বতে ধ্বংস হয়েছে। হায়! আমরা আরেকটি যান নির্মাণে অক্ষম।

আরেকটি ডিস্কে লেখা ছিল :

একদা আকাশ থেকে এলো খাটো দুর্বল হলুদ বর্ণের জীব। মানুষেরা তাদের হত্যা করল।

মহাশূন্যের বুদ্ধিমান প্রাণিদের খবর বিজ্ঞানীদের মাঝে প্রচণ্ড কৌতূহলের সৃষ্টি করল।

চীনা সীমান্তের দূরে উজবেকিস্তানের ফরজানা পাহাড়ের গায়ে আঁকা একটা ছবি আবিষ্কার করলেন ডা: বিয়াচেসান। সেই ছবির মূর্তির মাথায় আঁকা রয়েছে নভোচারীদের শিরস্ত্রাণ। আছে শ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্র। হাতে ধরা একটি ডিস্ক। ছবিটি আঁকা হয়েছিল হাজার হাজার বছর আগে।

তাইপের জাদুঘরে কিছু রহস্যময় কাঠ খোদাই আছে। তাইওয়ানদের কাছ থেকে এই কাঠ খোদাই পাওয়া গেছে।

এগুলো খুবই প্রাচীন। কাঠ খোদাইতে আছে চারটি মূর্তির ছবি। মূর্তিগুলো যেন ভাসছে আকাশে। তাদের গায়ে নভোচারীর পোশাক। একটি মূর্তির মাথায় শিরস্ত্রাণ। তাতে ছোট্ট একটা এন্টেনা লাগানো। সেই কাঠ খোদাইগুলো পাওয়া গিয়েছিল ফরমোজার উপজাতিদের গ্রামে। একটি ছবি ছিল যাদের পিঠে চেপে একটা তিন মুখের জীব উড়ে যাচ্ছে।

১৯৬১ সালের জুলাই মাসে চীনের হোনান পর্বতমালা একটা রহস্যময় পথ পাওয়া গেল। সেই পথ চলে গেছে পাহাড়ি গুহার ভেতরে। পথের দেয়ালগুলো ছিল মসৃণ আর কাঁচের মতো চকচকে। পথটা গিয়ে শেষ হয়েছে ছোট একটি ঘরে। সেই ঘরের দেয়ালে ছিল কয়েকটি জন্তু জানোয়ারের ছবি। কয়েকজন লোক একটি ভাসমান ঢালের মতন জিনিশের উপর দাঁড়িয়ে জন্তুগুলোর দিকে অস্ত্র তাক করে আছে। বিজ্ঞানীরা ভাবলেন এটা হচ্ছে ভিন গ্রহের মানুষের ছবি। যারা অস্ত্র ব্যবহার করত। সেখানকার পাহাড়ি এলাকায় প্রচলিত একটি গল্পে আছে, একদা আকাশ থেকে এলো হলুদ বর্ণের জীব।

কাজলের চোখের সামনে চীন-তিব্বত সীমান্তের রহস্যময় গিরিখাদগুলো ভেসে উঠলো। লাদাকের কথা মনে হলো। ঐ দুর্গম এলাকাটির প্রতি মানুষের খুব কৌতূহল। সেখানে রয়েছে অনেক গুমফা। যার ভেতরে এখনো অনেক রহস্যময় পুঁথি আছে। তিমুর চান লাদাক থেকে জলপায়রা এনে পোষে। কাঁকরতলী গ্রামে জলপায়রা হাউসে গেলে কি কোনো কিছুর হদিশ পাওয়া যাবে? কাজল উঠে এসে ফোন করে ফারহানকে। ফারহান একটি বিজ্ঞান ক্লাব বানিয়েছে। এত রাতে ফোন পেয়ে ফারহান অবাক। কাজলের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা যায় টেলিফোনে।

: সত্যি বলছি ফারহান। আমি নিজে আজকে রাতে ফ্লাইং সসার দেখেছি।

: আমাদের শহরের আকাশে? তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?

: আমি নিজে দেখলাম উড়ন্ত চাকতিটাকে। অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেছে আজ আমাদের বাড়িতে। একটার পর এক রহস্যময় ঘটনা। আমার প্রিয় কুকুরটাকে হত্যা করা হয়েছে।

: বলিস কি?

: সবুজ রেশমের ফাঁস দিয়ে। আজ তিমুর চান নামে একটা অদ্ভুত লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেই বোধহয় ফাঁস দিয়ে হত্যা করেছে আমার কুকুরটাকে। লোকটার কাছ থেকে আমি একটা জলপায়রার মূর্তি পেয়েছি। আশ্চর্যের ব্যাপার মূর্তিটা মাঝে মাঝে কেমন জীবন্ত হয়ে ওঠে।

ফারহনের কাছে মনে হল কাজল এলোমেলো কথা বলছে। একটি কথার সাথে অন্য কথার যেন কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

: ফারহান। আমি দেখলাম আমাদের বাগানের আকাশে একটা নীল আলোর শিখা। একটা আলোর চাকতির মতো জিনিস। কিছুক্ষণ থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর চোখের পলকে সাঁৎ করে মিলিয়ে গেল। ওটা ফ্লাইং সসার না হয়ে যায় না।

: কাজল। যদি ব্যাপারটা সত্যি হয় তাহলে এক দারুণ ব্যাপার হবে। আমরা যে বিজ্ঞান আর এ্যাডভেঞ্চার ক্লাব করেছি তার সদস্যরা মিলে একটা অনুষ্ঠান করব। সেখানে তোকে বলতে হবে তোর এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। কালকেই আমরা অনুষ্ঠানটা করতে চাই। তুই তো জানিস আমাদের বিজ্ঞান ক্লাবের একটা অংশ হচ্ছে ভিন গ্রহের প্রাণিদের সম্বন্ধে তথ্য অনুসন্ধান। সেখানে তোর বক্তব্য দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করবে। এর আগে আমাদের মধ্যে কেউ ফ্লাইং সসার দেখেনি। কাল বিকেল পাঁচটায় আমাদের ক্লাবে তোকে কিন্তু ফ্লাইং সসার দেখার অভিজ্ঞতার কথা বলতে হবে। আমি সবাইকে খবর দিয়ে রাখব।

: ফারহান। আমি অবশ্যই আসবো। কিন্তু আমার মনে হয় আমি একটা রহস্যময় ঘটনার সাথে জড়িয়ে যাচ্ছি। তিমুর চান হচ্ছে সেই রহস্যময় লোক। তার সম্বন্ধে আমি খোঁজ নিতে চাই। তোদের কয়েক জনের সাহায্য লাগতে পারে।

কাজল ফোনটা ছেড়ে দেয়। ভেজা বাতাস বইছে। দূরে কোথাও বোধহয় বৃষ্টি হয়েছে। ঘুম আসছে না। বারান্দায় এসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। মিটমিট করে তারাগুলো জ্বলছে। কত বিশাল এই ছায়াপথ। কে জানে কোন সুদূর নক্ষত্র থেকে ভিনগ্রহের অধিবাসীরা খবর পাঠিয়ে চলেছে পৃথিবীর দিকে।

জলপায়রা। জলপায়রা। কানের কাছে কে যেন ফিসফিস করে শব্দটা বলে। টেবিল ল্যাম্পের নিচে জলপায়রার মূর্তিটা একটু কাঁপছে কি? কাজল চোখ কচলায়। তিমুর চান কি কোনো গোপন জায়গা থেকে মন্ত্র ছুড়ে দিচ্ছে? আসলে তিমুর চানের কাছে লাদাকের গুম্ফার অনেক অজানা

রহস্য আছে। গুম্ফার লামারা মন্ত্র উচ্চারণ করে মূর্তিকে জীবন্ত করতে পারে। ঐ সমস্ত গুম্ফায় এমন কিছু কিছু পুঁথি আছে যাতে ভিন গ্রহরে অধিবাসীদের পৃথিবীতে আসার বিবরণ আছে। এই সব পুঁথির খোঁজে চীন-তিব্বত সীমান্তের অনেক দুর্গম অঞ্চল ঘুরে বেরিয়েছিলেন এরিক ফন দানিকেন। যার জীবনের সাধনাই হচ্ছে ভিন গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণিদের সম্পর্কে গবেষণা।

কাল বিকেলে ফারহানদের ক্লাবে তার দেখা উড়ন্ত চাকতি সম্পর্কে বিবরণ দিতে হবে। এই উড়ন্ত চাকতি নিয়ে তোলা একটা ভিডিও ক্যাসেট কদিন আগে ছোটকাকু পাঠিয়েছেন প্যাসাডোনা থেকে। ছোটকাকু সেখানে এস্কোবায়োলজিতে অধ্যাপনা করছেন। খুব সুন্দর চিঠি লিখতে পাবেন ছোটকাকু। এই ক্যাসেটের সাথে পাঠানো চিঠিতে লিখেছেন, আমাদের চারপাশের পৃথিবীতে অনেক রহস্যজনক ঘটনা ঘটে। সবার কাছে তা ধরা পড়ে না। তোমার বুদ্ধির এন্টেনাকে সবসময় সজাগ রাখবে। তাহলে দেখবে সেখানে অনেক রহস্যের সাংকেতিক ভাষাতে তুমি পাঠ করতে পারছ। আমি তোমাকে যে ক্যাসেটটি পাঠাচ্ছি তাতে ফ্লাইং সসার দেখতে পাওয়া কয়েকজন লোকের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা আছে। এই ক্যাসেটটি আমার খুব প্রিয়। আমি জানি তুমি তাকিয়ে থাক আকাশের দিকে। হয়তো ভিন গ্রহ থেকে আসা কোনো উড়ন্ত চাকতির সন্ধান তুমি পেয়ে যেতেও পার।

কাজল তখনি মেঝকাকুকে চিঠি লিখতে বসে।

প্রিয় মেঝকাকু,

তুমি কি করে এমন আশ্চর্য একটি কথা লিখলে। জান, আজ রাতে আমি আমাদের বাগানের আকাশে একটি উড়ন্ত চাকতি দেখতে পেয়েছি।

কাজল ক্যাসেটটি চালিয়ে দেয় ভিসিপিতে। টিভি পর্দায় ফুটে ওঠে দূর নক্ষত্রপুঞ্জের ছবি।

পরদিন সকাল হতেই ফারহান তাদের বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যদের জানিয়ে দেয় কাজলের ফ্লাইং সসার দেখার কথা। কথাটা শুনে সবাই খুব উত্তেজিত হয়ে যায়। এই রকম আশ্চর্যজনক একটি ঘটনা ঘটে গেল। তারা কেউ জানতে পারল না। ফারহান সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে বিকেল পাঁচটার মধ্যে ক্লাবঘরে চলে আসতে। সেখানে কাজল তার গতরাতে দেখা আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা বলবে।

ফুয়াদ কদিন আগে আমেরিকা থেকে এসেছে। ও একটা নতুন খবর দিল। আমেকিার ভার্জিনিয়ার কজন বিজ্ঞানী ডলফিনদের সাহায্যে ভিনগ্রহের অধিবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছেন। ডলফিনদের অসাধারণ বুদ্ধি। জীববিজ্ঞানীরা মনে করেন মানুষের মতোই তাদের বুদ্ধি। ইদানীং গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার জন্যে নাবিকেরা কোথাও কোথাও ডলফিনদের সাহায্য নিয়ে থাকে। ঐসব ডলফিনের গলায় বাঁধা ট্রানজিস্টার। তারা মাছের ঝাঁকের কাছে গিয়ে সিগনাল পাঠায় জাহাজে। সেই সিগনাল বিশ্লেষণ করে নাবিকেরা বুঝতে পারে মাছের ঝাঁকটি কোথায় অবস্থান করছে। ভার্জিনিয়ার বিজ্ঞানীরা এখন ডলফিনদের সাথে টেলিপ্যাথির সাহায্যে ভাবের আদান-প্রদান করছে। তারা বিশ্বাস করে খুব শিগগির পোষা ডলফিনদের সাহায্যে ভিন গ্রহের অধিবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হবে।

ফারহান ফুয়াদকে একটি দায়িত্ব দিয়েছিল। পৃথিবীর কোন কোন দেশে ফ্লাইং সসার দেখা গেছে তার একটি রিপোর্ট লেখার জন্যে।

বিকেল পাঁচটার আগেই বিজ্ঞান ক্লাবের ছোট ঘরটি উৎসাহী সদস্য দিয়ে ভরে গেল। দেয়ালে স্পিলবার্গের ইটি ছবির কয়েকটি পোস্টার লাগানো। কয়েকজনের গেঞ্জিতে আবার ইটির ছবি। সবাই অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে কাজলের জন্যে। যার কাছে রয়েছে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতার খবর। ফুয়াদ ক্লাবের অন্য ছেলেদের বোঝাতে থাকে ফ্লাইং সসার নামের ইতিহাস।

১৯৪৭ সালের ২৪ জুন আমেরিকান ব্যবসায়ী কেনেথ আরনল্ড তার ব্যক্তিগত বিমানে করে বানিয়াক পাহাড়ের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন এক অদ্ভুত দৃশ্য। তিনি দেখলেন নয়টি গোল বস্তু সারিবদ্ধভাবে প্রচণ্ড গতিতে উড়ে যাচ্ছে। বস্তুগুলো এমনভাবে উড়ছে যার ধরনটা হচ্ছে পানিতে নিক্ষেপ করা থালার এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলার মতো। আরনল্ড ছিলেন একজন অভিজ্ঞ বিমানচালক। তার সেই কথাকে তাই কেউ আজগুলি বলে উড়িয়ে দিল না। বিভিন্ন পত্রিকায় গুরুত্বের সাথে ছাপা হল খবরটা। যেহেতু বস্তুগুলো আকাশের বুকে থালার মতো এঁকেবেঁকে উড়ে চলছিল, তাই তার নাম দেয়া হল ফ্লাইং সসার।

তারপরের বছর ক্যান্টাকির গোডম্যান বিমানবন্দেরর কাছে আবার দেখা গেল ফ্লাইং সসার। মাটি থেকে প্রায় বারো হাজার ফুট উপর দিয়ে সেই রহস্যময় উড়ন্ত চাকতি প্রচণ্ড বেগে দক্ষিণ দিকে উড়ে যাচ্ছিল।

পৃথিবীর আরো বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উড়ন্ত চাকতি দেখার খবর আসতে শুরু করল।

সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ফ্লাইং সসার নিয়ে শুরু হল কৌতূহল। এরিক ফন দানিকেন নামের একজন বিজ্ঞানী ঘোষণা করলেন বহু আগে আমাদের পৃথিবীতে ভিন গ্রহের অধিবাসীরা এসেছিল। তারা তাদের কীর্তির চিহ্ন রেখে গেছে। দানিকেন সমস্ত পৃথিবী ঘুরে এ ধরনের চিহ্নের বেশ কিছু ছবি সংগ্রহ করেছেন। ফুয়াদের সংগ্রহে আছে ঐসব রহস্যময় নিদর্শনের রঙিন স্লাইড। ক্লাবঘরের দেয়ালে সেই ছবিগুলো দেখিয়ে ব্যাখ্যা করতে থাকে ফুয়াদ।

প্রথমে দেখানো হল ইস্টার দ্বীপে পাওয়া মূর্তিটার ছবি। সেখানে পাওয়া গেছে একটা অজানা ধরনের পাথরের মাথা। সেই মাথার চোখ দুটো পোকার চোখের মতো। মাথা ফুঁড়ে বের হয়েছে দুটো শিক। দানিকেনের ধারণা মহাকাশ থেকে আসা যাত্রীদের মাথায় ঐ রকম শিরস্ত্রাণ দেখে পাথরের মূর্তিতে ঐ রকম শিক লাগিয়েছিল প্রাচীন শিল্পী। চীনের উনান পাহাড়ে পাওয়া গেছে গ্রানাইট পাথরে আঁকা মূর্তি। তাদের পরনে ডুবুরির সাজ। সেখানে শুড় লাগানো। পঁয়তাল্লিশ হাজার বছর আগে আঁকা এই ছবিগুলো মনে করিয়ে দেয় ভিন গ্রহ থেকে আসা প্রাণিদের পোশাকের কথা।

আমেরিকান নেভাদার একটি কয়লার খনিতে একটা জুতোর ছাপ পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন সেই ছাপের বয়স পনের লক্ষ বছর।

স্পেনের মাদ্রিদের একটি পাহাড়ে একটা অদ্ভুত দেবতার ছবি পাওয়া গেছে। যা দেখতে মৌমাছির মতো। পিঠে তার দুটো প্রাচীন ধরনের বোমা। এই ধরনের মৌমাছি দেবতার ছবি আছে মেক্সিকোর তুলুম মন্দিরে। দানিকেনের বক্তব্য এগুলো ভিন গ্রহের অধিবাসীদের ছবি।

জার্মানীর বন শহরের কয়েক মাইল পশ্চিমে একটি লোহার স্তম্ভ আছে। লোকে বলে লৌহমানব। স্তম্ভটা মাটির উপরে জেগে আছে চার ফুট দশ ইঞ্চি। মাটির গভীরে দেবে আছে নব্বই ফুট। খুব প্রাচীন এই স্ত স্তটিতে এখনো মরচে পড়েনি। দানিকেনের বক্তব্য, এই স্তম্ভটি নির্মাণ করেছে ভিন গ্রহের অধিবাসীরা। বলিভিয়ার টিটিকাকা হ্রদের মাঝখানে একটি ছোট্ট দ্বীপ আছে। তার নাম শর। সেই দ্বীপে বাস করে আদিবাসী উরোরা। তারা বলে, পৃথিবী যখন অন্ধকারে ঢাকা তখনো তারা সেখানে

ছিল। তাদের প্রাচীন পুঁথিতে আছে সেই বিবরণ। সেখানে লেখা আছে আমরা অন্য মানুষের মতো নই। আমরা যে ভিন গ্রহের মানুষ।

খুব অল্পসংখ্যক লোক ছিল উরো সমাজে। দানিকেন তাদের সাথে মিশতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঐ রহস্যজনক উরোরা কারো সাথে মিশতে চাইত না। একটির পর একটি রহস্যময় ছবির স্লাইড দেয়ালে প্রতিফলিত হচ্ছে। কিশোর সদস্যরা বিস্মিত হয়ে সেগুলো দেখছে। বিচিত্র আকৃতির সব মূর্তিরা ছবি। পৃথিবীর বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলের আদিবাসীরা এগুলো এখনো হয়তো পুজো করে। তাদের পুঁথির আছে এই সমস্ত দেবতার আকাশ থেকে নেমে আসার বিবরণ। তারা মেঘে ভেতর থেকে নেমে এসেছিল মাটিতে। কেউ এসেছিল অদ্ভুত আকারের পাখির পিঠে চেপে।

এল সালভাদরের গ্রামে একটি পাথরের প্রাচীন বাটি পাওয়া গিয়েছিল। তাতে একটি মায়া রমণীর ছবি। যার পিঠে উড়ে যাবার যন্ত্রের একটি ইঞ্জিন।

ফুয়াদ এবার বাহামা দ্বীপপুঞ্জের পানির নিচে পাওয়া এক রহস্যময় জনপদের ছবি দেখায়। ১৯৭২ সালে একজন মার্কিন ডুবুরি রেবি কফ হঠাৎ করে পানির নিচে এই পাঁচিল ঘেরা জনপদ দেখতে পান। পানির বিশ ফুটের নিচে রয়েছে বাড়িঘরগুলো। গবেষণা করে বললেন এই জনপদ দশ হাজার বছরের পুরানো। অদ্ভুত সেই জনপদের কিছু কিছু ভিত দুইশ পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত গভীর। কারা তৈরি করেছিল এই জনপদ এটা এখনো এক রহস্য। যখন পিরামিড তৈরি হয়নি তখন এই পাথরের জটিল কাজের বাড়ি তৈরি হয়েছিল। কাদের কাছে ছিল এত উন্নত প্রযুক্তি?

সমুদ্রে নিচের এই রহস্যময় জনপদের খবর প্রকাশিত হয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করল। কত যে রহস্য ছড়িয়ে আছে পৃথিবী বিভিন্ন প্রান্তের দুর্গম অঞ্চলে। বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যরা যেন শেষ বিকেলের যাই যাই রোদের মাঝে এক অদ্ভুত পৃথিবীর খবর পায়। রঙিন স্লাইডের ছবিগুলো দেখে তারা কেমন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। ছায়াবীথির কাজল নামের ছেলেটা তাদের বলে, গত রাতে তাদের বাগানে দাঁড়িয়ে আকাশে দেখেছে নীল আলোর শিখা। উড়ন্ত চাকতি।

ফারহান অনেক খবর রাখে। তাকে সবাই বলে ক্ষুদে বিশ্বকোষ। নতুন কিছুর খবর পেলেই ক্লাবের সবাইকে জানায়।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াবার ব্যাপারেও তার খুব আগ্রহ। একবার কয়েকজনকে নিয়ে সেন্ট মার্টিনস দ্বীপে গিয়ে তিন দিন কাটিয়ে এসেছিল। সেখানে থেকেছিল তাঁবু খাটিয়ে। নিজেরাই ডিঙ্গি নৌকো করে মাছ ধরতে গিয়েছিল।

দুঃসাহসী ফারহান সবসময় ওদের বলে, এ্যাডভেঞ্চারে না গেল কি জীবনের অর্থ জানা যায়। ঘরে কোনায় চুপটি করে বসে থাকলে পৃথিবীর কিচ্ছু জানা যায় না।

সন্ধে হয়ে এসেছে। সদস্যদের অনেকই চলে গেছে। কাজল বলল, ফারহান। আমি তোমাদের সাহায্য চাই। কাঁকরতলী গ্রামে যাব তিমুর চানের খোঁজে। ওর কাছে গেলে রহস্যের হদিশ পাওয়া যাবে। আমি যে জলপায়রার মূর্তিটা পেয়েছি ওটার খোঁজেই আসছে তিমুর চান। খুব রহস্যময় এই মূর্তি। এই জলপায়রার চোখ থেকে নীল আলোর শিখা বেরিয়েছিল। আর সেটা লক্ষ্য করতে গিয়েই আমি আকাশে উড়ন্ত চাকতিকে দেখি।

কাজল, ফারহান আর ফুয়াদ ঠিক করল কালকেই ওরা যাবে কাঁকরতলী গ্রামে।

রান্নাঘরে উঁকি মারে কাজল। আবদুল চাচা মেথি দিয়ে পমপ্রেট মাছ ভাজছে মেথি ফোড়নের সুন্দর গন্ধ আসছে।

: আবদুল চাচা, আজ কিন্তু আমার সাথে দুই বন্ধু খাবে। ফুয়াদ আর ফারহান। ওরা আবার তোমার রান্নার খুব ভক্ত। আজ কি রেঁধেছ?

: কলার থোড়ের ভর্তা জিরে ভাত। ফুলকপির ডালনা। আর পালং শাক দিয়ে ছোট চিংড়ি।

: তুমি যাই রাঁধো তাই অপূর্ব হয়। ঐ যে ওরা এসে পড়ল বুঝি। এখনি খাবার দাও।

ফুয়াদ আর ফারহান একটা তালিকা তৈরি করেছে। কাঁকরতলীতে যাওয়ার জন্যে কি কি জিনিস সাথে করে নিতে হবে। বাইনোকুলার, ছুরি, টর্চ, নাইলনের দড়ি এমনি আরো অনেক কিছু।

ফুয়াদের কাছে একটা নেপালী ছুরি আছে। কাজল একটা ছোট টেপ রেকর্ডার সাথে নিয়েছে। ফারহানের দিকে তাকিয়ে বলে, কাঁকরতলী গ্রামটা কিন্তু বেশ রহস্যময়। সেখানে একবার অদ্ভুত জন্তুর আক্রমণে পাঁচটি শিশু মারা গিয়েছিল। শিশুদের ছিন্নভিন্ন লাশ ডোবা আর মাঠে পাওয়া গিয়েছিল। পত্রিকায় বেরিয়েছিল খবরটা।

নেপালী ছুরিটার বাঁট শক্ত হাতে ধরে ফুয়াদ।

দরজায় আবদুল চাচার মুখ।

: জলদি খেতে আস। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

খাবার টেবিলের কাছে এসে ফুযাদ খুশি হয়ে ওঠে।

: ইমা, কলার থোড়ের ভর্তা খেতে যা টেস্ট। তোমার আবদুল চাচা যে কোত্থেকে এসব পায়। একদম টিপিকাল বাঙালি খাবার রাঁধতে তার জুড়ি নেই।

ধোঁয়া ওঠা জিরে ভাতে ফুলকপির ডালনা মাখাতে মাখাতে কাজল বলে—

: এইতো সেদিন শালুক কিনে আনল। শাপলা শালুকের চচ্চড়ি তো আর খাওনি। খুব মজা। আবদুল চাচার কাছ থেকেই কিন্তু আমরা কাঁকড়তলী যাবার রাস্তা জানব।

খুব ভোর থাকতেই ওরা তিনজন রওনা দেয় সদরঘাটের লঞ্চ টার্মিনালের দিকে। লঞ্চে করে যেতে হবে উলিপুরের হাট। সেখান থেকে নৌকো করে কাঁকরতলী গ্রাম। দুপুরের মধ্যেই পৌঁছানো যাবে।

বগবগ করে লঞ্চ ছেড়ে দেয়। কাজল আর ফুয়াদ বাইরের ডেকে এসে দাঁড়ায়। ভোরের নরোম আলোতে নদীকে খুব স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে। মাছভরতি নৌকো আসছে। সারারাত নদীতে মাছ ধরছে জেলেরা।

উলিপুরের হাট খুব ছোট। অল্প কয়েকজন লোক নামল। নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামতে ফুয়াদের পা কাঁপছিল।

হাটের মাঝখানে একটা বটগাছ। কচি পাতা দুলছে ঝিরঝির বাতাসে। সিমেন্ট দিয়ে একটুখানি জায়গা বাঁধানো। ওখানটায় বসে ঝোলা থেকে পাউরুটি ডিম সেদ্ধ বের করল। ফারহান গিয়ে কিছু কলা কিনে আনল। বেশ পুরুষ্টু কলা। একপাশে একটি লোক গরম গরম গুড়ের জিলিপি ভাজছে। সেটাও কেনা হলো। ঝটপট করে খেয়ে নিলো তিনজন। এখনি রওয়ানা হতে হবে কাঁকরতলীর দিকে। সেখানে কাউকে চেনে না। শুধু জানে জলপায়রা হাউস নামের একটি বাড়িতে তিমুর চান থাকে। এ রকম একটা অজানা অচেনা জায়গায় হুট করে যাচ্ছে। রাতে কোথায় থাকবে তারও কোনো ঠিক নেই। ভালোই লাগছে। কেমন একটা অ্যাডভেঞ্চারের উত্তেজনা মিশে আছে ব্যাপারটিতে।

হাট থেকে দরকার ঠিক করে একটা নৌকোয় উঠল ওরা। বুড়ো মাঝি। সাথে তার কিশোর নাতি। নৌকো থেকে পানি সেঁচছিল ছেলেটা।

দুপাশে ফসলের মাঠ। নৌকো তরতর করে এগুতে থাকে। ছেলেটা পানি ফেলতে ফেলতে কাজলদের দিকে আড়চোখে তাকায়। কাজল জিজ্ঞেস করে, কি নাম তোমার?

: পান্নাস।

চমকে ওঠে কাজল।

: এ কি রকম নাম! এতো সাপের নাম।

বুড়ো মাঝি ওদিক থেকে বলে—

: ছোটবেলায় কয়েকবার পান্নাস সাপের কামড় খাইয়াও এই পোলা মরে নাই। তাই ওর নাম রাখছি পান্নাস। বড় বিচ্ছু পোলা। রাইত বেরাইতে হাঁটে মাঠে ঘুইরা বেড়ায়। মাথায় ওর ছিট আছে।

পান্নাস কেমন লাল চোখে তাকায় ওর দিকে। কাজল বুঝতে পারে ছেলেটা একটু অন্য ধরনের। কি মনে হওয়াতে কাজল পান্নাসকে কাছে ডাকে।

: তুমি কাঁকরতলী গ্রামে কবার গেছো?

: মেলাবার।

: তুমি কাঁকরতলী গ্রামের কি কি জানো?

: কি জানবার চান?

: ওখানে একবার একটা অদ্ভুদ জন্তু দেখা গিয়েছিল। জন্তুটা ঐ গ্রামের পাঁচটা শিশুকে মেরেছিল।

পান্নাস কাজলের দিকে তীব্র চোখে তাকায়। ওর নাকের কেমন তিরতির করে কাঁপতে থাকে।

পান্নাসের বুকটা ওঠানামা করছে। কাজল বুঝতে পারে ছেলেটার ভেতরে এক ধরনের উত্তেজনা ছড়িয়ে গেছে। অদ্ভুত জন্তুর কথাটা শুনে ছেলেটা এমন করছে কেন? পান্নাস তখনো জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আছে কাজলের দিকে।

কাজল একটু ঝুঁকে আসে।

: কি ব্যাপার পান্নাস? তুমি আমার কথা বুঝতে পারছো না। আমি তোমার কাছে জানতে চাইছি কাঁকরতলী গ্রামের সেই অদ্ভুত জন্তুটার কথা। যার আঘাতে পাঁচটা শিশু মারা গিয়েছিল।

: কথাটা মিথ্যা।

: কি মিথ্যা? কোনো শিশু মারা যায়নি?

: গেছিল। তয়...

: তয় বি?

: কোনো জন্তু ঐ শিশুগুলোর মারে নাই।

: তবে কে মেরেছে? আমি ঐ শিশুদের লাশের ছবি দেখেছি পত্রিকায়। টুকরো টুকরো হাত পা।

পান্নাস হঠাৎ নৌকোর একটা কাঠ ধরে থরথর করে কাঁপতে থাকে। কাজলের মনে হলো ছেলেটা চোখের সামনে যেন একটা ভয়ংকর দৃশ্য দেখছে।

: কি হলো পান্নাস? তোমার শরীর খারাপ লাগছে?

কাজল পকেট থেকে একটা ট্যাবলেট বের করে পান্নাসকে খেতে দেয়। এই ট্যাবলেটের সাহায্য নার্ভাসনেস কেটে যায়।

: তুমি এটা খাও। ভাল লাগবে।

পান্নাস ট্যাবলেটটা নিয়ে চুষতে থাকে। কিছুক্ষণ পর ও একটু স্বাভাবিক হয়।

: পান্নাস, তুমি যেন কি বলতে চাইছিলে?

: আমি জানি কোনো জন্তু ওই পোলাপানাগো মারে নাই। ওইডা মিছা কথা। কোনো জন্তু কাঁকরতলী গ্রামে আসে নাই। একটা মানুষ জন্তু ওই পোলাপানগুলারে মারছে।

: মানুষ জন্তু! সে আবার কি?

কাজল বিস্মিত।

: আমি সব জানি। আমি রাইতে বিরাইতে ঘুইরা বেড়াই। মাইনষে কয় আমার মাথায় নাকি ছিট আছে। আমি কত কি যে দেহি। ওই সব কথা কাউরে কইতে পারি না। বিশ্বাস করেন আমি নিজের চোখে মানুষ জন্তরে পোলাপানগুলোরে মারতে দেখছি।

: কোথায়?

: কাঁকতলার জঙ্গলের কাছে। ওই জায়গায় নাম গাংকিনি। আমি ওইহান দিয়া নিশুত রাইতে আইতেছিলাম। হঠাৎ শুনি কচি পোলাপানের কান্না। আর একটা গর্জন। নিশুত রাইত। আমরা সারা শরীর কাঁটা দিয়া উঠল। ভয়ডর আমার একটু কম। একটা শ্যাওড়া ঝোপের মধ্যে লুকাইলাম। ঝোপের ডাল ফাঁক কইরা দেখি ভালুকের ছাল পইরা একটা মানুষ কয়েকটা পোলাপাইনের কুপাইয়া মারতাছে। আর বিড়বিড় কইরা কি যেন মন্ত্র পড়তাছে। কইতাছে জয় তারানাথের জয়। লামা গুরু তারানাথের জয়। আমি অবাক হইয়া সব দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষণের

মধ্যেই সব শেষ। ওই মানুষরূপী জন্তুডা তহন শরীর থাইকা ভালুকের ছাল সরাইল। আবছা আলোতে দেহি লোকটা হইল তিমুর চান।

: তিমুর চান! আমার তো তার খোঁজেই যাচ্ছি।

: বড় সাংঘাতিক লোক। আমি এই কথাডা এতদিন কাউরে ডরে কই নাই। আমি জানি তিমুর চান টের পাইলে আমারে কাইটা ফালাইব।

নৌকোটা একটা চরের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। বুড়ো মাঝি দূরের গ্রাম দেখিয়ে তার দিকে আঙুল তুলে বলল, ঐ দেখা যায় কাঁকরতলী।

চরের পাশে বোটে করে এখানে আবার কে এসেছে? কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না।

ফারহান ওদের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলে, ওটা কি?

দেখা গেল উলুখাগড়ার ঝোপের উপরে একটা শোলার টুপি। দেখা যাচ্ছে নড়ছে।

মাঝিকে চরের পাশে নৌকো থামাতে বলল ওরা। তিনজনেই ঝুপ করে নেমে পড়ল। তারপর পা টিপে টিপে উলুখাগড়ার ঝোপের কাছে গেল।

হঠাৎ নড়ে উঠলো ঝোপটা ঝোপটা। সামনে কাদামাটি থেকে ফরফর করে কয়েকটা স্নাইপ উড়ে গেল।

: সর্বনাশ হয়ে গেল। দিলে তো পাখিগুলোকে উড়িয়ে। আমি এতক্ষণ ধরে এই পাখিগুলোর চলাফেরা লক্ষ্য করছিলাম। নোট বইতে লিখছিলাম। তোমরা এসে সব একেবারে বানচাল করে দিলে।

বলতে বলতে উলুখাগড়ার ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এক ছিপছিপে শরীরের বুড়ো।

মাথায় শোয়াল টুপি। পরনে খাকি জ্যাকেট। গলায় বাইনোকুলার। কেডস পরা। দেখে বেশ স্মার্ট লাগে।

: কি ইয়াংম্যানের দল। তোমরা নিশ্চয়ই আমার মতো বার্ড ওয়াচার না? তাহলে এমন কাণ্ড করতে না। তেমরা কারা?

ওরা তিন জন নিজেদের পরিচয় দেয়।

: আমার নাম ড. কায়ানী। বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে কাজ করি। একটা ফেলোশিপ নিয়ে এই অঞ্চলের জলচর পাখিদের উপর গবেষণা করছি। ড. সালিম আলী আমার গাইড ছিলেন।

বিকেলের হলুদ রোদ ছড়িয়ে চরের উপর। একঝাঁক কাদাখোঁচা তিরতির করে হাঁটছে। নদীর বুক থেকে ভেসে আসছে হু হু বাতাস।

সামনের বিলে অনেক ধরনের পাখি দেখা যাচ্ছে।

লোকটা এবার হো হো করে হেসে উঠল।

: সবাই আমাকে ডাকে পাখিবুড়ো বলে।

দূরে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওই দেখ, একটা মানিকজোড় পাখি। চেনো এটাকে? মনে হয় চেনো না। চিনবে কোত্থেকে? তোমারা তো পাখি দেখো শুধু ম্যাগাজিনের পাতায় নয়তো ভিডিওতে। পাখি চিনতে হলে আমার মতো কেডসগুলোতে কাদা লাগিয়ে ঘুরতে হবে। আমি সারা দেশে পাখি দেখার একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই। কত পাখি যে দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। এই যে মানিকজোড় পাখিটা। লম্বা লম্বা লালচে ঠ্যাং। প্রায় তিন ফুটের মতো উঁচু। এরা জোড়ায় শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। লম্বা ঠোঁট দিয়ে মাছ বা ব্যাঙ খপ্ করে ধরে খায়। এখন এরা ক্রমশ বিরল হয়ে যাচ্ছে।

ওদের কাছে ভালো লাগছে পাখিবুড়োকে। লোকটা বাইনোকুলার চোখে দিয়ে কি যেন দেখতে থাকে। তারপর ওদের দিকে তাকিয়ে বলে :

: এই যে কাস্তেচরা পাখি। ইংরেজিতে বলে হোয়াইট আইবেস। এদের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। বেশ বড় শাদা রঙের পাখি। মাথা এবং গলা দুটোই কাল। লম্বা কালো ঠোঁট। নিচের দিকে একটু বাঁকানো। বাসা বাঁধবার সময় এরা ভারি অদ্ভুত আওয়াজ করে থাকে। আরেকটা পাখি কিন্তু ধীরে ধীরে গ্রাম থেকে কমে যাচ্ছে। সেটা হলো ডাহুক। বর্ষাকালে এক সময় কত ডাহুকের ডাক শোনা যেত। কেমন কোয়াক কোয়াক কুক্ কুক্ কুক্ করে ডাকতো। কচি জলঘাসের উপর পোকামাকড় খুঁটে খেতো। ধীরে ধীরে সব হারিয়ে যাচ্ছে। যেমন করে মরিশাস দ্বীপ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল ডোডো আর অনুডুক্কু পাখিরা।

ওরা বুঝতে পারে বেশি কথা বলা পাখিবুড়োর স্বভাব। হয়তো এমনি হয়। মানুষ বুড়ো হলে একটু বেশি কথা বলতে পছন্দ করে। ফুয়াদের দাদু তো সারাক্ষণই উপদেশ দিতে চান।

ওদের নৌকার মাঝি ডাকছে। পাখিবুড়ো হাঁটতে হাঁটতে বলে, যে কথা বলছিলাম। ডোডো আর অনুডুক্কুদের কথা। ১৬৮১ সালে মরিশাস দ্বীপ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ডোডো পাখি। আঠার শতকের শেষদিকে শেষ হয়ে যায় অনুডুক্কু পাখি। পর্তুগীজ জলদস্যুরা ওই দ্বীপে নিয়ে গিয়েছিল কুকুর আর বেড়াল। ওইসব পাখি উড়তে পারতো না বলে খুব

সহজেই কুকুর বেড়ালের শিকার হলো। আমাদের দেশেরও এখন যা অবস্থা। অনেক পাখি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তা ইয়াংম্যান, তোমরা এখান দিয়ে কোথায় যাচ্ছো?

: আমরা যাচ্ছি কাঁকরতলী গ্রামে।

: আরে সেখানে তো আমিও যাচ্ছি। অই গ্রামের একটা লোকের কাছে খুব দুস্প্রাপ্য ধরনের কিছু পাখি আছি বলে সন্ধান পেয়েছি। সবুজ জলপায়রা আর কালো সারস। তার খোঁজেই যাচ্ছি।

কাজল ড. কায়ানীর দিকে তাকিয়ে বলে, আমরা ওই একই লোকের কাছে যাচ্ছি। তার নাম তিমুর চান।

: তাই নাকি? একই লোকের কাছে যাচ্ছি। আমি অনেক কষ্টে তিমুর চানের হদিশ পেয়েছি। তোমরা পেলে কোথায়?

: আমরাও অনেক কষ্টে ওর আসল পরিচয় পেয়েছি।

নৌকো আর রাবারের বোটটি পাশাপাশি চলা শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা এসে পৌঁছাল কাঁকরতলি গ্রামে।

গ্রামের হাটটি ছোট। একটা শিমুল গাছের নিচে ওরা নৌকা বাঁধলো।

কাজল বুড়ো মাঝিকে বলল, আমরা পান্নাসকে একটা বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি। পান্নাস ওই বাড়িটা চেনে।

হাটের কয়েকজন ওদের দিকে অবাক চোখে চেয়ে থাকে। ড. কায়ানী একবার বলতে চাইলেন, বেশ কয়েকটা মৌটুসী পাখি দেখলাম বলে মনে হচ্ছে।

কাজল তাড়া দিয়ে বলে, জলদি চলুন। জলপায়রা হাউসে গিয়ে তিমুর চানকে ধরতে হবে। পাখি দেখার সময় অনেক পাবেন।

পান্নাস ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কখনো পার হতে হচ্ছে বাঁশের নড়বড়ে সাঁকো। দুপাশের গাছপালা থেকে কেমন একটা কষটে গন্ধ আসছে। গ্রামটার লোকবসতি কম। যেতে যেতে চোখে পড়ল একপাশে লেবু বাগান। সেখানকার গন্ধটা খুব সুন্দর।

: আর কদ্দূর তিমুর চানের বাসা?

পান্নাস পেছন দিকে তাকিয়ে বলে

: গাঁয়ের শেষ মাথায়। একদম ছাড়াবাড়ি।

মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর একটা ঢালু জায়গা পার হলো ওরা। এ পাশটায় বেশ ঘন জঙ্গল সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

পান্নাস হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়।

: ওই যে তিমুর চানের বাসা।

ওরা দেখে কাঠ দিয়ে তৈরি অদ্ভুত আকৃতির একটা বাড়ি।

: এটাই তাহলে জলপায়রা হাউস। রহস্যময় জলপায়রা হাউস।

ফিসফিস করে বলে কাজল। বাড়িটার কোথাও আলো দেখা যাচ্ছে না। ওরা নিঃশব্দে বাড়ির কাছে এসে দাঁড়ায়।

কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। পান্নাস পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে। কাজল এগিয়ে যায়।

: কে আছে বাড়িতে?

কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর একটা থুরথুরে শাদা চুলের বুড়ি বেরিয়ে আসে। হাতে একটা কুপি। দপদপ করে জ্বলছে। কুপির আলোতে সেই বুড়িটাকে কেমন শকুনির মতো দেখায়।

: তিমুর চান কোথায়?

বুড়ি ফ্যাশফ্যাশে গলায় বলে, জাতিংগা গেছে।

: ওহ্, আসামের জাতিংগা। যেখানে পাখিরা বছরের এক সময় রাতেরবেলা আত্মহত্যা করতে আসে। সে ঘটনার রহস্য এখনো ভেদ করা যায়নি। সেই জাতিংগা। তিমুর চান সেখানে গেছে। বুঝলে ইয়াংম্যান। কাঁকরতলীর পাখি উড়ে গেছে। পাখি গেছে জাতিংগা।

কাজল ফুয়াদ আর ফারহানের দিকে তাকিয়ে বলে, আমরা কালকেই জাতিংগার দিকে রওয়ানা দেবো। ড. কায়ানী, আপনি আমাদের জাতিংগা যাবার রুটটা একটু বুঝিয়ে দিন।

জাতিংগা আসামের একটি রহস্যময় জায়গা। উত্তর কাছাড়ের একটি গ্রাম। পাহাড়ি এই গ্রামটিতে জয়ন্তিয়া উপজাতিরা থাকে। উত্তর কাছাড়ের সদর শহর হাফলং থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে জাতিংগা গ্রাম।

সমস্ত পৃথিবীর পাখি বিজ্ঞানীদের কাছে এই গ্রামটি খুব কৌতূহলের। বছরের কোনো কোনো সময় সন্ধ্যাবেলায় সেই গ্রামে একটি পাহাড়ি জায়গায় হাজার হাজার পাখি এসে আত্মহত্যা করে মশালের আলোতে। অনেকেই যায় সেখানে। তারা জানতে চায় কেন পাখিরা এমন করে আত্মহত্যা করে? কিন্তু সেই রহস্য ভেদ হয় না।

ফারহান খুব কাজের ছেলে। একদিনের মধ্যেই সে ভিসা বের করে ফেলল। পরদিন কলকাতা থেকে হাফলং পৌঁছে গেলে বিকেলের দিকে। মাইলের পর মাইল জুড়ে কমলার ক্ষেত। থোকায় থোকায় কমলা ধরে আছে।

হাফলং থেকে একটা জীপে করে কাজল, ফুয়াদ আর ফারহান জাতিংগার দিকে রওয়ানা দেয়। তাদের সাথে একজন গাইড রয়েছে। আসামী যুবক লাংখবান।

জীপ চলেছে কমলা বনের ভেতর দিয়ে। মাঝে মাঝে খাসিয়া জয়ন্তিয়াদের গ্রাম। কাঠের বাড়ি।

লাংখবান বেশ খবর রাখে। জীপ চালাচ্ছে সে নিজেই।

: জাতিংগার আসল নাম হলো জেমে নাগা। এর মানে হলো দারুণ বৃষ্টি।

অনেক কাহিনী আছে একে নিয়ে। ১৮৮০ সালে গনজুম পাহাড়ে এখানকার মহকুমা শহরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এর দুই বছর পরে একজন কাছাড়ি সাধু এসে প্রচার করে তার উপরে দৈবশক্তি ভর করেছে। তার নাম শম্ভুধন। তার ছিল একদল হিংস্র অনুসারী। ঘোষণা করল বৃটিশকে নয় কর দিতে হবে তাকেই। এই কথার ফলে শম্ভুধনের সংগে লেগে গেল বৃটিশদের লড়াই। সাধুর লোকেরা বিষাক্ত তীর-ধনুক ছুঁড়ে সেবার অনেক সাহেবকে হত্যা করেছিল। মারা গিয়েছিল মেজর বয়েড। সাহেবদের মেরে তাদের লাশগুলো গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল অনেক দিন। এখনো নাকি বহু লোক রাতেরবেলায় সাহেব ভূতদের দেখে। শাদা ঘোড়ায় চেপে মেজর বয়েড পাহাড়ি রাস্তায় ঘুরছে। কমলা বনের অনেক চাষি এই গল্প বলে। হাফলং-এর কাছে আছে বরাইল পাহাড়। সেই পাহাড়ের একটা গুহায় থাকে একদল তিব্বতী লামা। তারা লাদাকে যায় কালো সারসের খোঁজে।

লাংখবানের কথা শুনে চমকে যায় তিনজন।

: কালো সারসের খোঁজে কেন?

সে আরেক কাহিনী।

: শুনি না সেই কাহিনী।

পাহাড়ি আঁকাবাঁকা রাস্তা। মাঝে মাঝেই বিপজ্জনক বাঁক। নিপুণভাবে জীপ চালাচ্ছে লাংখবান। এই রকম ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তায় জীপ চালাতে দক্ষতা লাগে।

: লাংখবান, সেই কালো সারসের কাহিনীটি?

: শুনেছি সেখানকার কোনো কোনো তিব্বতী লামা বিশ্বাস করে কোনো এক কালো সারসের পেট কাটলে পাওয়া যাবে একটি সোনার চাবি। যে চাবি দিয়ে খোলা যাবে লাদাকের কোনো গোপন গুম্ফার ভেতরে

লুকানো এক গুপ্তধনের বাক্স। বুঝলেন কিনা, কালো সারসদের শুধুমাত্র লাদাকেই দেখা যায়।

: এই গুম্ফাটা এখান থেকে কদ্দূর?

: এখান থেকে চার কিলোমিটার দূরে। তবে রাস্তাটা খুব দুর্গম। বরাইলের কোলেই। রয়েছে। জাতিংগা গ্রাম। একটু একটু করে নেমে গেছে হাফলং-এর ঢালু। বরাইল পাহাড় ঘন বনে ঢাকা।

জাতিংগার ধারে কাছে আছে নাগা কুকিদের বসতি। কিছুক্ষণের মধ্যেই জাতিংগা গ্রামে পৌঁছে গেল ওরা। গ্রামটির দিকে তাকিয়ে রইল কাজল, ফুয়াদ আর ফারহান। ওই সেই রহস্যময় গ্রাম। ছমছম করে বাতাস বইছে। অনেক লোক এসে গেছে গ্রামটিতে। সবাই চলেছে মাঠের দিকে। জয়ন্তিয়া যুবক যুবতীরা মশাল জ্বেলে মাঠে বসে আছে। তাদের সবার হাতেই লাঠি। কাজল চারদিকে তাকায়। তিমুর চানকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কাজলের মনে হয় তিমুর চান বরাইলের গুম্ফাতে আছে।

ভেজা বাতাস বইছে। একটু আগে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। পশ্চিম দিক কেমন লাল দেখাচ্ছে। মশালের আলো দপদপ করছে। হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে ওরা। আসছে। আসতে জাতিংগার রহস্যময় পাখিরা। ডানায় কাঁপন তুলে ছুটে আসছে মৃত্যুর দিকে। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসছে পাখি। এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে মশালের উপর। ধপধপ করে পড়ছে মাটিতে দৃশ্যটি দেখে বিস্মিত হয়ে গেল কাজল, ফুয়াদ আর ফারহান। স্বেচ্ছায় পাখিদের এমন মৃত্যুবরণ! এ যেন না দেখলে ভাবাই যায় না। কেন পাখিগুলো আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিচ্ছে আর কোথাও যায় না এই পাখিরা। শুধু জাতিংগাতেই আসে। জাতিংগার কাছের হাফলং এ যায় না। পাখিগুলোর চোখে কি রকম বন্যতা। ড. কায়ানী তাদের বলেছিল পাখিরা এমন আচরণ করে ভূ-চুম্বকের আকর্ষণে। জাতিংগার ওই জায়গাটার ভূ-চুম্বকের টানে এই সময়ে পাখিরা আকর্ষিত হয়। সেই তীব্র নেশায় উড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু কেন আসে তার কারণ জানা যায়নি।

ঝুপঝুপ করে পাখিরা মশালের আলোতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ফারহান ফ্লাশ জ্বালিয়ে ছবি তুলছে। এই জাতিংগা গ্রামের কথা সে ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফি পত্রিকায় পড়েছে। তার অনেক দিনের শখ ছিল জাতিংগা দেখার। কিন্তু এখানে এমন হঠাৎ করে আসা হবে তা ভাবেনি। ভিড়ের মাঝখানে একটি লোককে দেখে চমকে যায় কাজল। তিমুর চান। লাঠি দিয়ে পাখি মারছে।

তিমুর চানের পাশে আরো দুজন তিব্বতি লামাকে দেখা যায়। মুণ্ডিত মাথা। মশালের আলোতে তিমুর চানকে কেমন ভয়ংকর দেখাচ্ছে। লাঠির আঘাতে পাখি মেরে ঝোলায় পুরছে তিমুর চান। কাজলের চোখের সামনে একটা দৃশ্য ভেসে উঠল। পান্নাস বর্ণনা করছিল নিশুত রাতে কাঁকরতলীর গাংকিনির কাছে কি নিষ্ঠুর আক্রোশে তিমুর চান শিশুদের হত্যা করছিল। আর চিৎকার করে বলছিল জয় তারানাথের জয়, লামা গুরু তারানাথের জয়। কে এই তারানাথ? সে কি বরাইলের গুম্ফার কোনো লামা? তার নির্দেশ তিমুর চান কাঁকরতলী গ্রামের পাঁচটি নিস্পাপ শিশুকে হত্যা করেছে।

কাজল ফুয়াদ আর ফারহানকে কাছে ডেকে তিমুর চানকে দেখায়।

: আমার মনে হয় তিমুর চান কিছুক্ষণ পর বরাইলের গুম্ফায় যাবে। আমরা ওকে ফলো করবো।

জাতিংগাতে আজ প্রচণ্ড ভিড়। আশেপাশের পাহাড়ি গ্রামগুলো থেকে পাখি মারতে এসেছে লোকেরা। অনেকেই ঝোলা ভরতি পাখি নিয়ে ফিরছে। দিন কয়েকের খাবার পেল এখান থেকে। একদল কুকি মাদল বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে চলে গেল। তিমুর চান আর তার দুই সঙ্গী লামা হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছে। তিমুর চানের শরীর একটা টকটকে লাল চাদরে পেঁচানো। চাদরের মাঝে ড্রাগনের মুখ নকশা করা। কাজল, ফুয়াদ আর ফারহান ওদের অনুসরণ করেছে। একসময় নিরিবিলি একটা পথ দিয়ে তিমুর চান হাঁটা শুরু করল। কাজল একটু থমকে দাঁড়ায়। এখন সামনে এগুলে শব্দ হবে। ধরা পড়ে যেতে পারে। সামনেই পাইন বন। তিমুর চান আর তার সঙ্গী দুই লামা সেই পাইন বনের কাছে একটা ঝোপের ভেতরে প্রবেশ করে। কাজলরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। এদিকটায় কোনো জনবসতি নেই। পাইন বনের ভেতর দিয়ে সোঁ সোঁ করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। তিমুর চান আর তার সঙ্গীদের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে। হাতঘড়ি দেখে কাজল। মিনিট পনের পার হয়ে গেছে। কি ব্যাপর? ওরা কি অদৃশ্য হয়ে গেল নাকি? তিনজন এগিয়ে যায় ঝোপের দিকে। একটা কালো কুকুর হঠাৎ করে পাশ দিয়ে ছুটে যায়। দূর থেকে কি একটা প্রাণির ডাক ভেসে আসছে। হায়েনার হাসির মতো শব্দ। ডাকটা যেন বরাইলের পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। ওরা তিনজন ঝোপের ভেতরে ঢুকে দেখে কোথাও কেউ নেই। শুনশান করছে। ফুয়াদ অবাক হয়ে বলল, চোখের সামনে ভ্যানিশ হয়ে গেল! এরা মানুষ না ভূত?

ফারহান মাথা চুলকে বলে, নিশ্চয়ই এদের কাছে হিমালয়ের সেই দুষ্প্রাপ্য রূন শেকড় আছে। যা খেয়ে ইয়েতিরা মানে হিমালয়ের তুষার মানবেরা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। এমনি অদ্ভুত গুণ সেই রূন শেকড়ের। কত উদ্ভিদবিজ্ঞানী তন্নতন্ন করে খুঁজেছে এই শেকড়। পায়নি। শুধু এর সন্ধান জানে ইয়েতিরা। এখন তো মনে হচ্ছে তিমুর চানও জানে।

: খুব রহস্যময় লোক এই তিমুর চান। কে জানে আরো কত রহস্য মিশে আছে। আমাদের এখন বরাইলের গুম্ফায় যেতে হবে। ওখানেই গেছে তিমুর জান। চল আমরা লাংখবানের কাছে যাই।

কাজল ফুয়াদ আর ফারহানকে তাড়া দিয়ে ঝোপের ভেতর থেকে নিয়ে আসে। পাইন বনের ভেতর থেকে তক্ষকের ডাক শোনা গেল। জাতিংগার আকাশে একঝাঁক পাখি উড়ে গেল তখন। সেদিকে তাকিয়ে ফুয়াদ বলল, আজকে সব পাখি তাহলে আত্মহত্যা করেনি।

লাংখবান রেস্ট হাউজে বসে মাখন দিয়ে চা খাচ্ছিল। হন্তদন্ত হয়ে ঢোকে তিনজন। ওদের দিকে তাকিয়ে লাংখবান হেসে বলে, বলিনি, জাতিংগার পাখিদের আত্মহত্যা দেখা একটা দারুণ রকমের অভিজ্ঞতা। বিদেশ থেকে মেলা লোক আসে এটা দেখতে। ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফির এক সাংবাদিক তিন বছর আগে এসেছিল। সে পৃথিবীর মেলা জায়গায় গিয়েছে। আমাকে বলেছিল জাতিংগাতে পাখিদের এই স্বেচ্ছামৃত্যু দেখা তার জীবনের সবচাইতে স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

কাজল লাংখবানের পাশের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে।

: আমাদের একটা সাহায্য করতে হবে।

: বলুন। আমি তো আপনাদের গাইড। আমার কাজই হলো আপনাদের সবরকম সাহায্য করা।

: আমাদের এখনি বরাইলের গুম্ফায় যেতে হবে।

: এত রাতে! সেখানে যাওয়ার রাস্তাটা তো খুব দুর্গম। দিনের বেলাতেই যেতে কি কষ্ট। রাতে কোনোমতেই যাওয়া যাবে না। অসম্ভব।

কাজলের কেন জানি মনে হচ্ছে আজকের রাতটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বরাইলের গুম্ফাতে রহস্যময় কিছু একটা ঘটবে। ওর একটা অদ্ভুত গুণ আছে। ভবিষ্যত্যের ঘটনা আঁচ করতে পারে। অনেক কিছুই আগে থেকে অনুমান করতে পারে।

ছোটবেলায় একবার প্রচণ্ড জ্বর হয়েছিল ওর। তারপর থেকেই এই অদ্ভুত গুণটি তার হয়েছে। বাড়ির লোকেরা অনেক সময় তাই ওকে ঠাট্টা

করে বলে ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা। ভেতরে ভেতরে ছটফট করে ওঠে কাজল। লাংখবান চিন্তিত মুখে বলে, কাল সকালে গেলে হয় না?

কাজলের মনে হয় যা ঘটার তা আজ রাতেই ঘটবে। লাংখবানের হাত ধরে সে।

: প্লিজ। আমাদের সাহায্য করতে হবে। যেভাবেই হোক সেখানে আজ আমাদের যেতে হবে।

লাংখবান কিছুক্ষণ চিন্তা করে। তারপর তার মুখের কোণায় একটু হাসি ফুটে ওঠে।

: একটা উপায় আছে।

: কি?

ব্যাগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে কাজল।

: আমি এখানকার এক বুড়ো মাইবংকে চিনি। সে থাকে ডি মাসা বস্তিতে। ওই লোকটা এক সময় আমার কাছে বরাইলের গুম্ফার কিছু পটচিত্র বিক্রি করেছিল। বিদেশিদের কাছে সেগুলোর খুব চাহিদা। ওই লোকটা আমাকে একবার বলেছিল বরাইল গুম্ফায় যাওয়ার একটা গোপন পথের সন্ধান সে জানে। তার কাছে যাওয়া যেতে পারে।

: এক্ষুণি। আর দেরী না।

সবাই ঝটপট লাংখবানের জীপে উঠে পড়ে। জীপ স্টার্ট দিতে দিতে লাংখবান বলে, ডি মানে হচ্ছে নদী। আর মাসা হলো সন্তান। ডি মাসা হলো নদীর সন্তান। আমরা যে বস্তিতে যাচ্ছি সেখানকার লোকেরা নিজেদের নদীর সন্তান বলে পরিচয় দেয়।

জাতিংগা গ্রামের পুবদিকে ডি মাসা বস্তি। সারি সারি কাঠের ঘর। কয়েকজন লোক বসে তামাক খাচ্ছে। এক কোনায় পাতা জ্বালিয়ে পাখি ঝলসানো হচ্ছে। কয়েকটা কুকুর ঘুরঘুর করছে সেখানে। বুড়ো মাইবং-এর নাতনী। পুতুলের মতো দেখতে। লাংখবান ওদের আঞ্চলিক ভাষায় কি সব বলল। মেয়েটিও চটপট করে উত্তর দিয়ে গেল।

কাজল জিজ্ঞেস করল

: কি বলছে মেয়েটা?

: বলছে ওর দাদুর শরীর খুব খারাপ। কথা কলতে কষ্ট হয়।

: আমরা শুধু বরাইলের গুম্ফায় যাওয়ার পথটার সন্ধান নিয়েই চলে যাব।

ছোট মেয়েটা কাজলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কাজল বুঝতে পারছে মেয়েটা তাকে খুব একটা পছন্দ করছে না। মাইবং-এর ছেলে ঢোকে

ঘরে। লাংখবান তাকে কিছু বলতেই সে তাদের বুড়ো মাইবং-এর ঘরে নিয়ে যায়।

ছোট্ট ঘর। ঘরের দেয়ালে নানা ধরনের মুখোশ ঝুলছে। কয়েকটা পটচিত্রও দেখা গেল। বুড়ো মাইবং একজন শিল্পী। সে পটচিত্র আঁকতে পারে। বয়স হয়ে গেছে। চালসে চোখ। ঘরের মাঝখানে একটা বাতি ঝুলছে। মৃদু আলোতে মাইবংকে প্রাচীনকালের এক রহস্যময় মানুষ বলে মনে হচ্ছে। লাংখবানের কাছে বুড়ো মাইবং হাঁপতে হাঁপাতে যা বলে সেটা কাজলদের অনুবাদ করে বুঝিয়ে দেয়।

: মাইবং বলছে, বরাইলের গুম্ফাতে যাবার গোপন পথের খবর সে দেবে। ওই গুম্ফাতে সে অনেকগুলো পটচিত্র দেখেছে। কিছু পটচিত্র নাকি রহস্যময় কিছু ছবি আছে। সেগুলোর ব্যাখ্যা সে এখনো পায়নি। সে শুনেছে দূর আকাশের কোনো অধিবাসীদের নাকি ছবি আছে ঐসব চিত্রে। তার কাছ থেকে এই রকম কিছু পটচিত্র নিয়ে এক সাহেব। সেই সাহেবের নাম দানিকেন। সাহেবের সাথে তার তোলা একটা ছবিও আছে। কাজল তাকিয়ে দেখে ঘরের দেয়ালে এরিক ফন দানিকেনের সাথে বুড়ো মাইবং-এর হাসি মুখের ছবি। দানিকেন বিশ্বাস করেন ভিন গ্রহের অধিবাসীরা পৃথিবীতে এসেছিল। তারা অনেক নিদর্শন রেখে গেছে। সিকিম, ভুটান, তিব্বত, নেপাল, লাদাকের কোনো কোনো গুম্ফায় এমন সব পটচিত্র আছে যেখানে সাংকেতিক ভাষায় ভিন গ্রহের অধিবাসীদের পৃথিবীতে আসার বিবরণ রয়েছে। এগুলোর খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরেছে দানিকেন। জাতিংগাতেও এসেছিল। মাইবং-এর কাছ থেকে বেশ কয়েকটা পটচিত্র কিনে নিয়ে গেছে।

কাজল বুঝতে পারল বুড়ো মাইবং তাদের কাছেও কিছু পটচিত্র বিক্রি করতে চায়। কাজল লাংখবানের কাছে টাকা দিয়ে বলে।

: দরদাম করে আমাদের জন্যেও কটা ছবি কিনে দিন। আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বুড়োর কাছ থেকে গুম্ফায় যাবার গোপন পথটার কথা জেনে নিন। আমাদের শীঘ্র সেখানে যেতে হবে।

বুড়ো মাইবং ফিসফিস করে বলে, বরাইলের গুম্ফা। সেখানে আছে লামা গুরু তারানাথ।

কাজলের তখন মনে হলো পান্নাসের কথা। কাঁকরতলীর গাংকিনিতে এক নিশুত রাতে তিমুর চান পাঁচটি শিশু হত্যা করেছিল জয় লামা গুরু তারানাথ বলে।

বুড়ো মাইবং টাকা পেয়ে খুশি। কাজল লাংখবানকে বলে।

: মাইবং-এর কাছ থেকে জেনে নিন তো লামা গুরু তারানাথ সম্পর্কে আর কি জানে।

লাংখবান জিজ্ঞেস করতেই বুড়ো কেমন যেন একটু উত্তেজিত হয়ে যায়। বিড়বিড় করে কি যেন বলতে থাকে।

কাজল লাংখবানকে বলে, বুড়োকে বলুন পাঁচটি শিশু হত্যার কোনো ব্যাপার আছে কিনা তারানাথের সাথে।

এই কথায় বুড়ো মাইবং চমকে যায়। চালসে চোখে তাকায় কাজলের দিকে। তার ঠোঁট থরথর করে কাঁপে। বাঁ হাতের বাঁধা তামার তাগাটাকে শক্ত করে ধরে। তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে বলে, আছে, আছে। লামা গুরু তারানাথের নির্দেশ আছে। যে পাঁচটি শিশুকে বলি দিয়ে তার মনস্কামনা পূর্ণ করবে সে পাবে লাদাকের আলচি গুম্ফাতে রাখা গুপ্তধনের সন্ধান। সেখানে লুকানো আছে পায়রার ডিমের মতো হিরে।

বুড়ো মাইবং-এর চোখ জ্বলজ্বল করতে থাকে।

: বরাইলের গুম্ফাতে ঢোকার অনুমতি সবাই পায় না। আমি ১০১ টা মৃত তিতির ভেট দিয়ে ঢুকেছিলাম। যারা পিশাচসিদ্ধ তারাই শুধু সেখানে যায়। তারানাথের সাংঘাতিক ক্ষমতা। দূর আকাশের অধিবাসীদের সাথে তার যোগাযোগ আছে। দূরের পৃথিবী থেকে নীল আলোর ভেলায় চেপে আসে যাত্রীরা। তাদের সাথে তারানাথের আলোর সংকেত দিয়ে ভাব বিনিময় হয়।

জাতিংগার ডি মাসা বস্তির একটা ছোট্ট কাঠের ঘরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কেমন শিহরিত হয়ে উঠল কাজল, ফুয়াদ আর ফারহান। অশিক্ষিত বুড়ো মাইবং তাদের কাছে এক রহস্যময় ভাষায় শোনাচ্ছে উড়ন্ত চাকতির কথা। ছায়াবীথির আকাশে উড়ন্ত চাকতি দেখেছিল কাজল। সবুজ জলপায়রার চোখ থেকে বের হয়েছিল নীল আলোর শিখা। কত যে রহস্য মিশে আছে চারপাশের পৃথিবীতে। অনেক কিছু তার দেখা হয় না। জানা হয় না।

লাংখবান মাইবং-এর কাছে থেকে বরাইল গুম্ফায় যাবার গোপন পথটার কথা জেনে নেয়।

: চলুন, আমি জায়গাটা চিনতে পেরেছি।

ওরা বুড়া মাইবংকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে আসে কাজল দেখে বুড়োর ছোট নাতনীটা জানালার ফাঁক দিয়ে তাদের দেখছে।

লাংখবান তীব্রগতিতে জীপ চালিয়ে ওদের নিয়ে এল সেই পাইন বনের কাছে। এখানকার একটি ঝোপের ভেতরে ঢুকেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল তিমুর চান আর তার সংগী লামারা। জীপটা এসে ঝোপের পাশে থামে। লাংখবান ওদের দিকে ফিরে বলে—

: বুড়ো মাইবং আমাকে এই রাশনা ঝোপের কথা বলেছে। এর ভেতরে আছে বরাইল গুম্ফায় যাওয়ার গোপন সুড়ঙ্গপথ।

ফুয়াদ টর্চ জ্বালে। দুএকটা ছোট প্রাণি সরসর করে পালায়। লাংখবান ঝুঁকে কয়েকটা ডাল সরিয়ে কি যেন দেখতে থাকে।

: মাইবং বলেছিল ঝোপের মাঝখান থেকে উত্তর দিকে পাঁচ ফুট গেলে একটা পিতলের আংটা দেখা যাবে।

টর্চ জ্বালিয়ে ওরা এগুতে থাকে। ফারহান ফিসফিস করে বলে, ওই যে আংটা দেখা যাচ্ছে।

টর্চের আলোতে পিতলের আংটা চকচক করে ওঠে। কাজল ঝুঁকে দেখে আংটার সাথে সুতো দিয়ে একটা কালো সারসের মূর্তি বাঁধা। লাংখবান সেই মর্তিটাকে আংটার সাথে পেঁচিয়ে নেয়। তারপর একটু চাপ দিয়ে আংটাটা মোচড়াতে থাকে। সবাই বিস্মিত হয়ে দেখে তাদের সামনে মাটি থেকে একটা গোল চাকা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। টর্চের আলোতে দেখা যায় থাক থাক সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে।

: আমাদের এখান দিয়েই যেতে হবে।

কাজল আগে আগে যেতে থাকে। বাকিরা তাকে অনুসরণ করে। থিকথিকে জমাটবাঁধা অন্ধকারের মাঝে টর্চের আলোটা এক ভুতুড়ে পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। ভ্যাঁপসা একটা গন্ধ। একপাশে কয়েকটা ছোট প্রাণির কঙ্কাল পড়ে আছে।

লাংখবান একটু ভয়ার্ত গলায় বলে, আমাদের কি এভাবে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে?

: কোনো ভয় নেই। বিপদের মুখোমুখি না হলে কিসের জীবন।

লাংখবান আর কিছু না বলে ওদের পিছে পিছে আসতে থাকে।

কিছুক্ষণ যাওয়ার পর রাস্তাটা সামনে বাঁক নিয়েছে। মাথার উপর দিয়ে ছলছল করে পানি বয়ে যাবার শব্দ। মাটি কেমন স্যাঁতস্যাঁতে।

লাংখবান বলে, আমরা এখন ঝরনার নিচ দিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ ফোঁস করে একটা শব্দ। কাজল চমকে কয়েক পা পেছনে সরে যায়। টর্চের আলোতে একটা চিতি গোখরার ফণা ঝলসে ওঠে। ফুয়াদ ঝোলা থেকে

নেপালী ছুরিটা বের করে সাথে সাথে নিপুণ ভঙ্গিতে সাপটাকে কোপাতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফালা ফালা হয়ে গেল চিতি গোখরাটা।

দূরে আবছা আলো দেখা যাচ্ছে। গুম্ফাটা বোধ হয় কাছেই। ওরা তাড়াতাড়ি এগুতে থাকে।

সামনেই একটা ছোট নালা। ঝিরঝির করে ঝরনার পানি বয়ে যাচ্ছে। সুড়ঙ্গপথটা এখানে এসে শেষ হয়েছে।

এখানে এসে দাঁড়াতেই তাদের গায়ে একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস লাগল। এতক্ষণ গুমোট পরিবেশে থেকে ওরা হাঁপিয়ে গিয়েছিল। ঠাণ্ডা বাতাসে ওদের শরীরটা যেন একটু জুড়িয়ে গেল। সামনেই গুম্ফায় ওঠার সিঁড়ি। অদ্ভুত আকারের কিছু লতাপাতা ঝুলছে। পাথরের কয়েকটা ভয়ংকর আকারের মূর্তি। মূর্তিগুলোর চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে আসছে। নানা রঙের পাথর বসানো মূর্তিগুলোর গায়ে। একটা মূর্তি মস্ত লাল জিভ বের করে আছে। এটাই বুঝি তারানাথের মূর্তি। রক্তলোলুপ তারানাথ। পাঁচটি শিশুকে হত্যা করেছে। কে জানে তারানাথের ভোগে আরো কত শিশুর রক্ত লেগেছে।

হঠাৎ সাঁৎ করে মিলিয়ে যায় আলোর চাকতিটা।

পেছনে খুট করে একটা শব্দ হতেই ওরা চমকে তাকায়। একজন লামা পুরোহিত হিংস্র চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটা যেন তাদরে দেখে বিশ্বাসই করতে পারছে না ওরা কেম কেমন করে এখানে এল। হঠাৎ লোকটা একটা দড়ির ঘণ্টা ধরে টান দেয়। অমনি সমস্ত গুম্ফায় ঢং ঢং করে শব্দ হতে থাকে।

: সর্বনাশ হয়ে গেছে। সমস্ত গুম্ফায় এখন বিপদ সংকেত বাজিয়ে দেয়া হয়েছে। এখানকার লামারা খুব হিংস্র। আমাদের মেরে ফেলবে। চলুন পালাই এখান থেকে।

লাংখবানকে কেমন উত্তেজিত দেখায়।

হঠাৎ একটা অট্টহাসি শোনা যায়।

: কোথায় পালাবে তোমরা? লামা গুরু তারানাথের থাবার নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। কালো সারসের পালক আর চামড়া দিয়ে তৈরি একটা অদ্ভুত পোশাক পরেছে সে। তিমুর চানকে একটা মস্ত কালো সারসের মতো দেখাচ্ছে। তিমুর চানের দুপাশে সেই দুজন মুণ্ডিত মাথার লামা। তাদরে হাতে টাংগি চকচক করছে। কাজল শুধু চাপাগলায় বলল—

: এ্যাকশন।

তারপর চোখের নিমিষে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। ফুয়াদ উড়ন্ত চিলের মতো ফ্লাইং কিক দিয়ে পেছনের লামাটাকে আঘাত করে পকেট থেকে নাইলনে দড়ি বের করে লামাটার হাত মুচড়ে বেঁধে ফেলে। কাজল আর ফারহান কারাতে ব্ল্যাক বেল্ট পাওয়া ছেলে। তারাও মুখ দিয়ে চাপা শিসের মতো শব্দ করে লাফ দিয়ে উপরে ওঠে।

তিমুর চানের সঙ্গী দুই লামা কিছু বোঝার আগেই তাদের ঘাড়ের রগে তীব্র আঘাত পায়। লামা দুজন মূর্ছিত হয়ে পড়ে।

লাংখবান পকেট থেকে পিস্তল বের করে তিমুর চানের দিকে তাক করে। ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে যায় তিমুর চান। তারপর ওদের দিকে একটা মখমল কাপড়ের ঝোলা তুলে বলে—

: এর ভেতরেই আছে সেই রহস্যময় পুঁথিগুলো। যাতে আছে ভিন গ্রহের অধিবাসীদের আসার সাংকেতিক খবর। কিন্তু এগুলো তোমার পাবে না। এত সহজ না তিমুর চানের কাছ থেকে জিনিশ ছিনিয়ে নেয়া। আমি কালো সারস হয়ে লাদাকে চললাম।

বলে হা হা করে হাসতে থাকে তিমুর চান।

ওরা সবাই বিস্মিত হয়ে যায়। লাংখবান চাপা গলায় বলে, আমি কিন্তু গুলি চালাব। তুমি একটা জঘন্য হত্যাকারী।

তিমুর চান তীব্র কণ্ঠে চিংকার দিয়ে ওঠে, জয় লামা গুরু তারানাথের জয়। তারপর অদ্ভুত এক ভংগীতে দুহাতে মেলে ধরে। যেন মস্ত একটা কালো সারস ডানা মেলছে। তিমুর চান যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে বরাইল পাহাড়ের গভীর খাদ। আলকাতরার মতো থকথকে অন্ধকার সেখানে। ওরা কিছু বোঝার আগেই নিকষ কালো অন্ধকার লক্ষ্য করে ঝাঁপ দেয় তিমুর চান।

লাংখবান পিস্তলের ফাঁকা গুলি করতে থাকে। সেই গুলির শব্দ বরাইল পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। তখন কালো সারসদের ডানা ঝাঁপটানো শব্দ শোনা যায়। বরাইল পাহাড়ের সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ফুয়াদ বলে, আশ্চর্য। তিমুর চানের রহস্য এভাবে শেষ হয়ে গেল। জাতিংগার পাখিদের মতো সেও তাহলে আত্মহত্যা করল?

কাজল ফিসফিস করে বলে, না তিমুর চানের রহস্য নতুন করে আবার শুরু হল।

রাতের হিমেল বাতাস তখন বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ি উপত্যকায়।



প্রবাল দ্বীপের আতঙ্ক

প্রবাল দ্বীপের হাতছানি

টেলিভিশনটা অন করতেই নীলাভ একটা আলো যেন ছড়িয়ে গেল। প্রামাণ্য ছবি চলছে। বুলগেরিয়ার পাহাড়ী পথ ধরে একদল স্কুল ছাত্র শিস দিতে দিতে চলেছে। পিঠে তাদের বোঝা। শিপলু জানে ওগুলোর নাম হ্যাভারস্যাক। কিছুক্ষণ দেখার পরই বুঝতে পারলো, ওদের কাজ প্রকৃতি দেখা। ফার্ণ পাতা তুলে রাখছে। নুড়ি পাথরের টুকরো জমাচ্ছে। একটি ফসিল পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। আইভী আপা কি একটা গানের সুর গুনগুন করে ভাঁজতে ভাঁজতে ঘরে ঢুকে বলে, "ডকুমেন্টারি ছবি। ধুস। বন্ধ কর।"

"তোমার ভালো না লাগে, ভাগো।"

"উঃ, খুব আমার পণ্ডিত হয়েছেন। দেব এক...

ঠিক সেই সময় কারেন্ট যায় চলে। পুরো পাড়া অন্ধকার। কুচকুচে কালো কাপড় দিয়ে সবকিছু যেন মুড়ে দেয়া হয়েছে। একটা তেলাপোকা বুঝি ফরফর করে উড়ে এসে বসলো আইভী আপার ঘাড়ের কাছে। অমনি "উঃ মাগো" বলে চিৎকার।

শিপলু সোফাতে বসেই মনে মনে ভাবলো, আইভী আপাটা কি! আস্ত ভীতুর ডিম। সেদিন ছাদে ঝোলানো শাদা শাড়ি দেখে ভয় পেয়েছিল। শাড়ির ভেতর থেকে নাকি দুটো লিকলিকে হাত ওকে ধরতে এগিয়ে

আসছিল। পরে দেখা গেছে, ওগুলো কাঠের বাক্সের টুকরো। বই-এর শেলফ বানানো হবে বলে ছোট চাচা ছাদের কোণায় জমিয়ে রেখেছেন।

: আইভী আপা। শিপলু ফিসফিস করে বলে।

: কিরে?

: এখন যদি বাপ্পিদের সেই কালো বেড়ালটা ঝুপ করে আসে। ওটাতো ডাইনীদের বেড়ালের মতো।

: আর বলিস না শিপলু।

: বেড়ালটাকে দেখলেই আমার কেমন সন্দেহ হয়। এ পাড়ার অন্য কোনো বেড়ালের সাথে মেলে না। ছোট চাচা ওকে সাহেবদের গোরস্থানে উলু ঘাসের বনে কয়েকদিন দেখেছে। বেড়ালটার আসল মালিক ছিল মারিয়া বুড়ি।

শুনে ধক্ করে ওঠে আইভীর বুক। পাড়ার শেষ তেতলা হলুদ বাড়ির একটা ঘরে থাকতো মারিয়া বুড়ি। সংসারে কেউ নেই। কেক বানিয়ে বিক্রি করে দিন কাটাতো। চমৎকার কেক বানাতে পারতো বুড়ি। স্কুলের ক'জন ছাত্রীর সাথে একবার মারিয়া বুড়ির কাছে গিয়েছিল আইভী। কেক বানানো শেখার জন্যে। তোবড়ানো গালের বুড়ি। কিশমিশের মতো চামড়া। ওদের বলেছিল, "হাঁস মুরগীর ডিম দিয়ে অনেক কেক বানিয়েছি। কালো তিতিরের ডিম দিয়ে একবার বানিয়ে দেখাবো, কি চমৎকার হয়।"

পাড়ার লোক বলাবিল করতো, মারিয়া বুড়ির অনেক টাকা। সব জমিয়ে রাখছে।

একদিন খুব হৈ চৈ। বুড়ির ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। অনেক বেলা পর্যন্ত খোলেনি। লোকজন তখন দরজা ভেঙে দেখে মাটিতে হাত পা ছড়িয়ে চোখ উল্টে মরে আছে বুড়ি। গলার কাছে জমাট রক্ত। দেখেই মনে হয় সাংঘাতিক কিছু একটা দেখে ভয় পেয়েছিল বুড়ি।

এই ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে শিপলুর মুখে বুড়ির কথা শুনে বুকটা কেমন কেঁপে উঠলো আইভীর।

: দেখ আপা, ভেন্টিলেটারের মাঝে বসে সেই কালো বেড়ালটা। এখুনি লাফ দিলো বলে।

আর থাকতে পারলো না আইভী। সে যেন ফ্যাঁচ করে একটা শব্দ শুনলো।

: মাগো, বলে চিৎকার। ভেতর থেকে মোমাবাতি হাতে ছুটে এলেন ওদের আম্মা। সেই আলোতে দেয়ালে ছায়া বড় হয়ে লাফাতে লাগলো।

: তোদের নিয়ে আর পারা গেল না। কোথায় কারেন্ট চলে গেছে, চুপ করে বসে থাকবি। তা নয় শুরু হলো যত হৈ চৈ। লোকে ভাববে, বাড়িতে ডাকাত পড়েছে।

শিপলু চুপি চুপি উঠে যায়। রাস্তায় ল্যানসার গাড়ি থামার শব্দ। নিশ্চয়ই বনানী থেকে লিটন মামা এসেছেন। উঃ তাহলে কি চমৎকার হবে।

গল্পে কথায় এক নিমিষেই বাড়িটাকে জমিয়ে ফেলবেন লিটন মামা। কানাডায় থেকে লেখাপড়া করেন। ছুটিতে ঢাকায় এসেছেন।

: হবে না, কিচ্ছু হবে না এখানে। এতোবার কারেন্ট চলে গেলে কি হয়। একটা যেন ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাবলাম তোদের সাথে গল্প করে যাবো। তোর মার হাতের রান্না খাবো। মুগ-ডালের খিঁচুড়ি। তা এখন ভূতের মতো বসে থাকি।

হৈ চৈ করতে করতে ঢোকেন লিটন মামা। চমৎকার সুগন্ধ মেখেছেন। একদম বেল ফুলের মতো গন্ধ। শিপলু আবছা অন্ধকারের ভেতরেও দেখে সুন্দর একটি বাটিকের শার্ট পরেছেন লিটন মামা।

: আমেরিকাতে একবার মাত্র এক মিনিটের জন্যে বিদ্যুৎ বন্ধ রাখা হয়েছিল। তাও টমাস এডিসনের মারা যাবার দিন। ওর প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যে।

: কেন, বছর কয় আগে যে খোদ নিউইয়র্ক শহরে একটানা নয় ঘণ্টা ধরে কারেন্ট ছিল না। এ নিয়ে কম লেখালেখি হয়েছে পত্রিকায়। টাইম, নিউজ উইক রীতিমতো প্রচ্ছদ কাহিনি করেছিল।

এই জন্যে শিপলুকে ভালো লাগে লিটন মামার। বইপত্তর ঘাঁটে। খোঁজ খবর রাখে। নতুন কিছু একটা বললে, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে না। শিপলুর অবশ্য মেলা বই। ওর আব্বা কয়েক মাস আগে 'চিল্ড্রেনস এনসাইক্লোপিডিয়া'র পুরো সেট আনিয়ে দিয়েছেন।

বাড়ির কাজের ছেলেটা ততক্ষণে হারিকেন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। লিটন মামা বলেন, চল বাগানে যাই। ঘরের ভেতর ভালো লাগছে না।

শিপলুর আব্বার খুব বাগানের শখ। মনের মতো করে গাছ লাগিয়েছেন। এক কোণায় অর্কিডের ঘর। কাঠের ছোট ছোট বাক্স সারি

সারি ঝুলিয়ে রাখা। হিমালয়ের পাহাড়ী বনে তিনি কয়েকবার গেছেন বুনো ফুল দেখতে। অনেক প্রকৃতি বিজ্ঞানীই আসে। কিছু চারা শখ করে এনেছিলেন। শহরের আবহাওয়াতে বাঁচাতে পারেন নি। লিটন মামা বাগানে যেতে যেতে বলেন, আপা, চা পাঠাও! তারপর মুগডালের খিচুড়ি শুরু করো। সাথে কিন্তু বেগুন ভাজা চাই।

কয়েকটা বেতের চেয়ার ছড়ানো সবুজ ঘাসের উপর। চাঁদ উঠেছে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের লুকোচুরি। লিটন মামা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন আকাশের দিকে।

দেখ শিপলু, কারেন্ট চলে গেল বলেই না চাঁদটাকে এতো ভালো করে দেখছি। শহরের ক'জন আমরা চাঁদ দেখি। মাঝে মাঝে ভাবি আগের দিনের মানুষরাই বুঝি ভালো ছিল। সারাদিন ঘাসবনে শিকার খোঁজা। পাথর ছুঁড়ে পশু হত্যা। রাতের বেলায় চাঁদের আলোতে উৎসব। নদীর তীরে। পাহাড়ের নীচে। শুকনো পাতার আগুনে ঝলসানো মাংশ। রাতের পাখিরা ডেকে ডেকে প্রহর ঘোষণা করবে।

: মামা, ও মামা। তুমি কি কবি হয়ে গেলে নাকি!

একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলেন লিটন মামা। চা এসে গেল। শিপলুর আব্বাও এসে হাজির।

: কি লিটন, তোমার আবিষ্কারের কি হলো?

কি করে পেট্রল ছাড়া গাড়ী চালানো যায়, এ নিয়ে লিটন মামা ইংরেজি পত্রিকায় একবার বিরাট এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কিউবাতে আজকাল গাড়িতে পেট্রলের পরিবর্তে এ্যালকোহল দিচ্ছে। ওদেশের চিনির কারখানায় প্রচুর এ্যালকোহল উৎপন্ন হয়।

শিপলুর আব্বা সেই প্রবন্ধের কথা নিয়ে মাঝে মাঝে ঠাট্টা করেন।

: দেখবেন দুলাভাই, যেভাবে তেল সংকট বাড়ছে মানুষ প্রয়োজনেই তেলের বিকল্প খুঁজে বের করবে। এইতো জাপানের এক ডাক্তার রক্তের বিকল্প বের করেছে। দারুণ ব্যাপার।

শিপলুর আব্বা ছোট এক শিশি থেকে শাদা বড়ি ঢেলে দিলেন চায়ের কাপে।

: স্যাকারিন কিন্তু এখন পুরনো হয়ে গেছে। নতুন আবিষ্কৃত হয়েছে টিডি। এতে ক্যালরি আছে। এক বৃটিশ চিকিৎসক ডানিয়েল ১৮৫০ সালে আফ্রিকা ভ্রমণের সময়ে এক ধরনের শুঁটি জাতের ফল দেখতে পান। লাল

রঙের সেই ফল থেকেই এখন তৈরি হয়েছে চিনির বিকল্প টিডি। কানাডায় দেখে এলাম ওসবের খুব গাছ লাগাচ্ছে কৃষি বিভাগ।

আলাপ চলতে থাকে মিষ্টি নিয়ে। এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে শিপলুর এখন অনেক জানা। কিছুক্ষণ উসখুস করে বললো :

: মিষ্টি খাবার ইতিহাস কে বলতে পারবে? চার হাজার বছর আগে মিসরীয়রা শুধু খেজুর খেত। মিসরের রাজা তুতেন খামেনের সমাধির মাঝেও সেসব পাওয়া গেছে।

ঝলমল করে আলো চলে আসে। নিয়নের আলোকে ঘাসের উপর মনে হচ্ছে যেন মাখনের মতো লেপটে আছে। আইভী বেণী দুলিয়ে বলে, 'আমার নতুন তোলা গান শুনতে চাইছো না যে লিটন মামা।'

'এখুনি শুনবো। তোর মার রান্নাঘরের শেষ রিপোর্ট বল। পেটটা চুই চুই করছে। বিদেশে আধসেদ্ধ আর পানসে খাবার খেয়ে খেয়ে পেটে একেবারে চড়া পড়ে গেল। দেশে এসে তাই টক ঝাল কিছু খেতে খুব ইচ্ছা করে। আঃ কি টেস্ট যে আমাদের বাঙালি রান্নার তা বাইরে না গেলে বোঝা যায় না। কলার থোড়ের ভর্তাকেই তখন মনে হয় অমৃত।'

: খিচুড়ি শেষ। এখন ফালি ফালি করে বেগুন কাটা হচ্ছে। ঘি দিয়ে ভাজা হবে।

: তোফা। ততক্ষণ গান চলুক। যাও শিপলু, বাহাদুর, চট করে হারমোনিয়াম নিয়ে এসো। সাথে ডুগি তবলা। ঠোকাইটা আমিই দেব।

খাবার টেবিলে ধোঁয়া ভরা খিচুড়ির দিকে তাকিয়ে লিটন মামা বলেন, 'ফাস কেলাশ হয়েছে আপা। তোমার রান্না যদি আমার বাড়িঅলীকে একবার খাওয়াতে পারতাম তবে নির্ঘাৎ ভাড়া অর্ধেক হয়ে যেত। বুড়ির খুব শখ প্রাচ্যের খাবারের। লেবুর আচার বানিয়ে দিয়ো এক শিশি। নিয়ে যাবো।'

খেতে খেতেই কথাটা পাড়লেন লিটন মামা।

: বুঝলে দুলাভাই, ঢাকা থেকে একদল বিজ্ঞানী যাবে সেন্ট মার্টিনস দ্বীপে। অভিযান চালাতে। সে দলে আমার এক বন্ধু আছে। ওরা দুজন উৎসাহী ইয়াংম্যান নিয়ে যাবে। আসলে সমাজের বিভিন্ন ধরনের লোক নিয়ে এই স্টাডি দলটি তৈরি হয়েছে। আমি ভাবছি শিপলুকে পাঠাবো।

: ক'দিন থাকবে তারা সেখানে?

পানি খেতে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন শিপলুর আব্বা। আইভী আড়চোখে তাকায় শিপলুর দিকে। শিপলুর বুকটা ধুকপুক করছে। আব্বা কি রাজী হয়ে যাবেন। শিপলু যে বড় হয়ে উঠেছে এ কথাটি তো বাড়ির কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না। সব সময় চোখে চোখে রাখতে চায়। হারিয়ে যায় যদি।

: তিন সপ্তাহ থাকবে। সব খরচ সরকারের আর ইউনেস্কোর। রাজী হয়ে যান দুলাভাই। শিপলুর তো এসএসসি পরীক্ষা হয়েই গেছে। গিয়ে একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে আসুক। দেশকেও চেনা হবে।

: কথাটা ভালো বলেছো লিটন। এ দেশের দ্বীপ সম্পর্কে তো ধারণা, জেলের দল যেখানে মাছ ধরতে গিয়ে ছমাস বসতি করে থাকে। কিন্তু...

: আর কোনো কিন্তু নেই। দলের অনেকেই আমার চেনা। এছাড়া বেশ ক'জন নামী দামী অধ্যাপকও যাচ্ছেন।

খুশীতে চেয়ার ছেড়ে এখন লাফ দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে শিপলুর। ইচ্ছে করছে গ্যাস বেলুনের মতো উড়তে। আব্বা যে এতো সহজে রাজী হবেন তা ভাবতেই পারেনি। আব্বারা মাঝে মাঝে কেমন করে যে খুব হৃদয়বান হয়ে যান।

ইস, দারুণ হবে তাহলে ব্যাপারটা। সেন্ট মার্টিনস দ্বীপ। বঙ্গোপসাগরের বুকে ছোট এক দ্বীপ। দিনরাত যার চারপাশে ঢেউ আছড়ে পড়ছে। সী-গালের অবাধ ওড়াওড়ি।

যাবার আগে শিপলুকে একটা চিঠি লিখে দিলেন লিটন মামা।

: আমি ফোন করে দেব। তুমি কাল সকাল এগারোটায় কার্জন হলে ড. ফারুকের সাথে তার চেম্বারে দেখা করবে। তিনি জুলজির অধ্যাপক।

শব্দ করে ল্যানসারটা চলে গেল। মাধবীলতার ঝাড় দুলছে দমকা বাতাসে। রাতে বৃষ্টি আসবে নাকি।

সে রাতে ঘুমুতে যাবার আগে নীল সমুদ্রের মাঝে এক দ্বীপের স্বপ্ন দেখলো শিপলু।

এতোদিন পত্রিকায় দেখেছে নানা দ্বীপের ছবি। পলিনেশিয়ার তিতিরোয়া। যেখানে শ্যাওলার চাষ করে মার্লন ব্রান্ডো। নির্জন দ্বীপ ট্রিস্টান দ্য কুনহা, যেখানে বিশাল ডানার এ্যালবাট্রোসরা আসে ডিম পাড়তে। প্রবাল কীটেরা তিল তিল করে বানিয়েছে যে দ্বীপ তার নাম সেন্ট মার্টিনস। 'শো কেসে' এক টুকরো প্রবাল রয়েছে। ফুলের পাঁপড়ির মতো

ছড়ানো। প্রবাল দ্বীপে নীড় বেঁধেছে সাগর বিহঙ্গেরা। শিপলু যেন কানের কাছে আছড়ে পড়া ঢেউ এর একটানা শব্দ শুনতে পেল। দ্বীপ যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

সামনে নতুন দিন

নীলক্ষেতের জারুল গাছগুলো কি সুন্দর। চমৎকার রঙের ফুল ফুটেছে। সত্যি, ঢাকার এ জায়গাটা কতো সবুজ। এখানে এলেই মনটা ভালো হয়ে যায়। বৃটিশ আমলে ঢাকার এইসব গাছ লাগানো হয়। লর্ড প্রাউডলক নামের এক ভদ্রলোকের পরিকল্পনা এসব। তিনি বিলেতের বিখ্যাত কিউই উদ্যানের স্রষ্টা ছিলেন। সেই উনিশশো পাঁচের ঢাকা। বঙ্গ ভঙ্গ হয়ে গেছে। ঢাকা তখন রাজধানী। সাহেবদের থাকার জন্যে তৈরি হলো লাল টালির বাড়ি। লাগানো হলো রকমারি গাছ। শিপলু যেন দেখতে পায় এই শতকের শুরুতে এসব রাস্তা দিয়ে ফিটন গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন সাহেবরা। লর্ড প্রাউডলক মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছেন গাছগাছালির দিকে। পাতার ফাঁকে নতুন কুঁড়ি ফুটেছে। ঘাসের আঁশ নিয়ে উড়ছে পাখিরা।

রাস্তায় পড়ে থাকা একটা ইটে হোঁচট খেতেই শিপলু লাল রোদের দুপুরে একটি দিনে ফিরে আসে। সামনেই লোহার মস্ত গেট।

প্রাণি বিজ্ঞানী বিভাগে ঢুকে একজন পিয়নকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে, কোনার দিকে ড. ফারুকের চেম্বার। কাঁচের আলমারীতে সার সার পাখির স্টাফ মূর্তি। এক পাশে জারের ভেতরে বিভিন্ন রকম প্রাণি। একটু ঝাঁঝালো গন্ধ। পর্দা সরিয়ে ঢোকে শিপলু। চারদিকে মোটা পর্দা টাঙানো। টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। একমনে কি যেন লিখছেন ফর্শা চেহারার ড. ফারুক।

: আসতে পারি?

পুরু লেন্সের চশমার মাঝ দিয়ে তাকিয়ে ড. ফারুক বলেন, 'এসো।'

লিটন মামার দেয়া চিঠিটা পড়ে বসতে বলেন।

: আমরা এমন ছেলে চাইছি যে ঘুরে এসে তার অভিজ্ঞতার কথা লিখবে। তোমার তো লেখার অভ্যেস আছে বলে লিটন লিখেছে। নিজের দেশের কতো সম্পদ ছড়িয়ে আছে, কেউ জানে না। টেমস, আমাজান আর দানিয়ুবের খবর খুব রাখে আজকালকার ছেলেমেয়েরা। কিন্তু পদ্মা, ইছামতী, ধলেশ্বরীর খবর রাখে না। ম্যাগপাই রবিনের ছবি দেখেছে অথচ

দেশের ফুলচকি খঞ্জনাদের চেনে না। বুঝলে, আমরা চাই ছেলেমেয়েরা নিজের দেশের পশুপাখি, গাছপালা চিনুক। জানুক।

ড. ফারুকের গলায় যেন আবেগ। শিপলুর খুব ভালো লাগে।

: আমি যখন রটরডামে গবেষণা করছি তখন ছুটির দিনে চলে যেতাম বনে। দেখতাম স্কুল কলেজের ছেলেরা বাইনোকুলার নিয়ে পাখি দেখতে বেরিয়েছে। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে লতাপাতা দেখছে। বহুদিন ভেবেছি, কবে আমাদের ছেলেমেয়েরা এমনি আগ্রহ নিয়ে বেরিয়ে পড়বে।

শিপলু চুপচাপ শুনছে।

: ইলিশ মাছ কখন ডিম পাড়তে আসে, বলতে পারবে কেউ? এসব স্কুল সিলেবাসে থাকা উচিত। স্যামন মাছেরা ডিম পাড়ার জন্যে সমুদ্র থেকে কেমন করে নদীতে যায় তাই নিয়ে মেলা বই দেখেছি ওদেশে।

শিপলু ক'দিন আগেই 'হাম্পটি ডাম্পটি' পত্রিকায় স্যামন মাছের বাসা নিয়ে লেখা প্রবন্ধ পড়েছে। সাথে প্রচুর ছবি।

: সেন্ট মার্টিন্সে কেন যাচ্ছি আমরা?

: কারণ এই প্রবাল দ্বীপটিতে স্টাডি করার মেলা জিনিশ রয়েছে। ভূতত্ত্ববিদ, প্রাণিবিজ্ঞানী, উদ্ভিদবিজ্ঞানী সবাই যার যার মতো কাজ করবে। দ্বীপটির প্রাকৃতিক গঠন, কতো ধরনের প্রাণি আছে লেগুন কতো রকম সব কিছুর একটা জরীপ করতে চাই।

: লেগুন আবার কি?

: ছোট ছোট জলাশয়। সেখানে থাকে উড়ুক্কু মাছ। চিংড়িও আছে মেলা।

সত্যি! আমাদের দেশে উড়ুক্কু মাছ পাওয়া যায়। শিপলু উল্লসিত হয়। পাখা মেলে পানি থেকে লাফিয়ে উঠছে মাছ। রোদে ওদের শরীর ঝিলিক মেরে উঠছে।

: গিয়ে দেখবে আরো কতো বিস্ময় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। মালপত্র গোছগাছ করে নিও। চারদিন পর আমরা রওয়ানা দেব। রাতের ট্রেনে যাবো। যোগাযোগ রেখো।

শিপলুর ভেতরে খুশীর একটা নদী ফুলে ওঠে। এই নদী যেন তাকে অনেক দূর পর্যন্ত ভাসিয়ে নেবে। সেন্ট মার্টিন্স দ্বীপে অভিযান। নামকরা বিজ্ঞানীদের সাথে যাচ্ছে। বন্ধুরা শুনলে সব হা হয়ে যাবে।

সে রাতে শেলফ থেকে বিশ্বের সেরা অভিযান কাহিনির বইটা নামালো। পাশের বাড়ির রেডিওগ্রামে সেতার বাজছে। বইটার পাতা

ওল্টাতে থাকে। অভিযানের নেশা কতো মানুষকে ঘর ছাড়া করেছে। ফন হুম্বালটি নামের এক লোক ভেনিজুয়েলার গহীন অরণ্যে গিয়েছিলেন। সেখানকার অভিজ্ঞতার কথা বার্লিনের এক বন্ধুর কাছে চিঠিতে লিখেছেন: গত চার মাস আমরা শুধু জঙ্গলেই বাস করেছি। আমাদের আশপাশে অজস্র কুমীর, অজগর আর জাগুয়ার। খাবার বলতে কিছুই নেই। এখানে আমাদের খাবার বলতে চাল, পিঁপড়ে, কলা। কখনও বা বানরের মাংশ। সাক্ষাৎ পেয়েছি শুধু বানর সাপ আর ঝাঁকে ঝাঁকে মশা। মশার কামড়ে হাত আর মুখ ফুলে ঢোল। মশার মেঘ। রাতে মশা আর পোকামাকড়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে নিজেদের আমরা বালির নিচে কবরস্থ করে রাখতাম। আমাদের সারা শরীরের ওপর তিন ইঞ্চি বালির স্তর। নাকের ডগাটি শুধু বাইরে।

জানালার বাইরে তাকায় শিপলু। সেন্ট মার্টিন্স দ্বীপের উড়ুক্কু মাছেরা কি এখনো লেগুনের বুকে লাফ দিচ্ছে? শিপলুর সামনে এখন প্রবাল দ্বীপের দিনগুলো অপেক্ষা করছে।

রহস্যময় চিঠি

বিজ্ঞান নিয়ে গেবষণা করার জন্যে ইউনেস্কো সাহায্য করছে। এই অভিযানটি তেমনি এক প্রচেষ্টা।

সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। সব মিলিয়ে সদস্য সংখ্যা বাইশ জন। একজন ডকুমেন্টারি ছবির নির্মাতাও যাচ্ছেন। মি. মেহতা। সিলোনের লোক। দ্বীপের উপর রঙিন ছবি তুলবেন। জ্যাকেট পরা মি. মেহতাকে খুব ভালো লেগে গেল শিপলুর। অনেকটা লিটন মামার মতো। হাসিখুশি। দলের বেশির ভাগ লোককেই গম্ভীর চেহারার মনে হচ্ছে। শিপলুর বয়সী অন্য ছেলেটির নাম অয়ন। রোভার স্কাউট। কয়েকদিন আগে জাকার্তায় বিশ্ব জাম্বুরীতে যোগ দিয়ে এসেছে। অয়নের ব্যাগটিতে ওর নাম লেখা। বাড়িতে একটা ফোন করতে হবে। অয়ন তাই শিপলুর হাতে ওর ব্যাগটি রেখে পাবলিক বুথে যায়। লোকজনের ভিড়। ফেরিওয়ালাদের চিৎকার। খুব তেষ্টা পেয়েছে শিপলুর। পেপসিকোলা খেতে খেতে লক্ষ্য করে দূরে দাঁড়িয়ে একজন কালো গগলস পরা লোক তাকে দেখছে। লোকটাকে চিনতে পারে না শিপলু। আগে কখনো দেখেছে বলেও মনে করতে পারছে না।

বাড়ির লোকজন এসেছে স্টেশনে। আব্বার এক বন্ধু পাওয়া গেল বিজ্ঞানীদের মাঝে। ড. জামান। নামকরা ভূতত্ত্ববিদ। একসাথে কলেজে পড়তেন। আব্বা আলাপ করিয়ে দিলেন।

: আঙ্কলের কথা শুনবে। সমুদ্রের ধারে কখনো একলা যাবে না। দলের সাথে থাকবে।

হাসতে হাসতে বলেন ড. জামান,

: ভয় নেই। আমরা কোনো রহস্যময় দ্বীপে গুপ্তধনের সন্ধানে যাচ্ছি না। তবে ব্যাপারটার মাঝে বেশ অ্যাডভেঞ্চার আছে।

গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে। সবাই উঠে যায়। পুরো কামরা ওদের জন্যে রিজার্ভ।

একসময় ট্রেন ধীরে ধীরে চলা শুরু করে। শিপলু জানালা দিয়ে তাকায়। আইভী আপা হাত নাড়ছে। সবাই পেছনে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ কালো গগলস পরা সেই লোকটা দৌড়ে আসতে থাকে। সে এসে শিপলুর হাতে একটি খাম গুঁজে দেয়। কিছু বোঝার আগেই লোকটা আবার মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যায়। ততক্ষণে কমলাপুর স্টেশনের প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে গেছে ট্রেন। শিপলুর অবাক হয়ে যাওয়া ভাবটা তখনো কাটেনি। কে এই গগলস পরা লোক! কি দিলো তাকে। খামটা পকেটে রেখে দেয়। পরে খুলে পড়া যাবে।

চিত্র পরিচালক তার পাশেই বসেছেন। শিপলুকে চুইংগাম দিলেন। সেখান থেকে শিপলু অয়নকে দেয়। অয়ন ফিক করে হেসে ফেলে। শিপলু ইন্দোনেশিয়ার গল্প শুনতে চায়।

: তুমি কমোডো দ্বীপে গিয়েছিলে?

: না। মেলা দ্বীপ সেদেশে। ছোট বড় সব মিলিয়ে দশ হাজার।

: কমোডো দ্বীপে নাকি ড্রাগন দেখা গেছে?

: পত্রিকার ছবি আর খবর আমিও দেখেছি।

জামান চাচা একবার খবর নিলেন। রাতে ঘুমিয়ে থেকো।

মি. মেহতা পৃথিবীর কোথায় কোথায় শুটিং করেছেন তার কথা বলছেন। সারাওয়াকে গহীন জঙ্গলে ওরাং ওটাংদের ছবি তুলতে গিয়ে একবার বিপদে পড়েছিলেন।

: বুঝলে কিনা, অনেক কষ্টে খোঁজ পাওয়া গেল ওরাং ওটাংদের আস্তানার। এক আদিবাসী এসে খবর দিলো। কুয়ালালামপুর টিভি

কোম্পানির হয়ে কাজ করছি। এক ঝোপের ভেতরে টেলি লেন্স বাগিয়ে বসে আছি। কখন বেরুবে ওরাং ওটাং। হঠাৎ পেছনে মচমচ শব্দ। তাকিয়ে দেখি কলাঝোপ ভেঙে এগিয়ে আসছে ইয়া এক ওরাং ওটাং। আমার সহকারী তো টুপি ফেলেই দৌড়। আমি কোনোমতে ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে পালালাম। অবিশ্যি পরের দিন শুটিং আমি ঠিকই করেছিলাম। জীবনের ঝুঁকি নিতে না পারলে কোনো ভালো কাজ করা যায় না। আমার সে ছবি সেবার পুরস্কার পেয়েছিল।

রাত বাড়ছে। ট্রেনের দুলুনীতে অনেকেই ঘুমোবার চেষ্টা করছেন। শিপলু এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে। না, কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না। পকেট থেকে খামটি বের করে। মোটা সবুজ কাগজের একটি চিঠি। গোটা গোটা করে লেখা:

'পাথরের চোখ যার একটি
তোমার লক্ষ্য সেই লোকটি
তার কাছে আছে কিছু ম্যাপ আর ছবি
তুমি তা বুদ্ধি করে সরাবে যে সবি।
যদি পারো তবে পাবে মোটা পুরস্কার
তখন মনের আশা পুরবে তোমার।
আমাদের প্রস্তাবে রাজী হলে পর
গলাতে ঝোলাবে সবুজ রঙের কাপড়।
ঘাট থেকে পেয়ে যাবে নয়া নির্দেশ
আজকের মতো কথা এইখানে শেষ।'

বারকয়েক কবিতাটি পড়ে শিপলু। মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারে না। এ কোন রহস্যের জালে আটকালো সে। লোকটা আবার ভুল করে চিঠিটা তাকে গুঁজে দেয়নি তো। কোনো কোনো রহস্য বইতে অবশ্য এ ধরনের সংকেত ভরা চিঠির কথা পেয়েছে। কিন্তু সেগুলোর বেশির ভাগই গুপ্তধনের নিশানা। বই-এর খসখসে পাতা থেকে রহস্যের হাত উঠে আসছে নাকি! শরীরটা কেমন শিরশির করে উঠলো শিপলুর। সত্যজিৎ-এর লেখার খুব ভক্ত সে। ফেলুদার নতুন কোনো বই বেরুলেই নাওয়া খাওয়া ভুলে পড়তে বসে। আচ্ছা, এই রকম এাকটা অবস্থায় পড়লে ফেলুদা কি করতো?

ট্রেনটা একটা স্টেশনে থামে। অয়ন কেন জানি উসখুস করছে। জানালার বাইরে তাকাচ্ছে।

: কি হয়েছে অয়ন। খুঁজছো কাউকে?

: মানে... একজন লোকের একটা চিঠি দেবার কথা।

চিঠি! ধক করে উঠলো শিপলুর বুকটা।

: কিসের চিঠি!

: ব্যাপারটা আমিও ঠিক জানি না।

: সে আবার কি রকম।

: কয়েকদিন আগে নিউমার্কেটে বই কিনছি তখন একজন অচেনা লোক এসে জিজ্ঞেস করলো আমি সেন্ট মার্টিন্স দ্বীপের অভিযাত্রীদের মাঝে সিলেক্ট হয়েছি কিনা। হ্যাঁ বললাম। তখন লোকটা আমাকে অনেকগুলো নতুন বই কিনে দিয়ে বললো, এগুলো তোমার জন্যে উপহার। আমি তো নিতে চাই না। বললো, আমাদের হয়ে কিছু কাজ করে দেবে, নাও। কি কাজ বলতে জানালো ট্রেন ছাড়বার সময় একজন চিঠি দিয়ে যাবে। সেখানেই লেখা থাকবে সব। ঢাকাতে তো কেউ চিঠি দিল না। ভাবছি, এখানে কেউ দেয় কিনা।

সবগুলো কথা মন দিয়ে শুনলো শিপলু। ঠিক করলো তার চিঠি পাওয়ার কথাটা আপাতত অয়নকে জানাবে না। মাথাটা এখন স্থির রাখতে হবে। পুরো ব্যাপারটা চুপচাপ বসে ভাবার চেষ্টা করলো। লোকটা তাকে অয়ন মনে করেই যে চিঠিটা দিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অয়ন তার কাছে ব্যাগ রেখে একবার ফোন করতে গিয়েছিল। ব্যাগের উপর অয়নের নাম লেখা ছিল। সেখান থেকেই কালো গগলস-এর ভুল। তবে যতোটুকু বোঝা যাচ্ছে, অয়ন কোনো রহস্যের ব্যাপার নয়। সে নেহায়েৎই ঘটনার জালে জড়িয়ে গিয়েছিল। এখন তাকে অয়ন সাজতে হবে। চিঠি পড়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করতে হবে। দেখা যাক তারপর কি হয়।

একটা কমিকস বই-এর ভেতরে চিঠিটা রেখে মন দিয়ে পড়তে থাকে। অয়ন ওপাশে বসে ঢুলছে। ছোট্ট একটা ব্রীজ পেরিয়ে গেল ট্রেন। ওদের প্রস্তাবে রাজী হলে গলায় সবুজ কাপড় ঝুলিয়ে রাখতে বলেছে। ঘাটে নতুন নির্দেশ পাবে। মনে মনে ঠিক করে শিপলু তাই করবে সে। দেখা যাক, ব্যাপারটা কোথায় গড়ায়। রাতের সমুদ্র সাঁতরে ট্রেন তখন সাঁই সাঁই করে ছুটে চলেছে।

জেলী মাখানো, রুটি দিয়ে নাস্তা খাচ্ছিল শিপলু। রেস্ট হাউসটা চমৎকার। জানালা দিয়ে হু হু বাতাস আসে। অভিযাত্রী দলের সবাই এখানে উঠেছে। দুপুর বেলায় দ্বীপের দিকে রওয়ানা দেবে। একটি ছোট জাহাজ ঠিক করা হয়েছে। ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা আসছে শিপলুর। সমুদ্রের নীল পানি তর তর করে কেটে যাবে জাহাজ। যদি জাহাজ ডুবি হয়ে কোনো দ্বীপে আশ্রয় নেয়। যেখানে লোকজন একদম নেই। প্রাচীন জলদস্যুরা কোথাও গুপ্তধন পুঁতে রেখেছে। কোনো ঝোপের নীচে হয়তো পড়ে আছে মরচে পড়া তলোয়ার। ধুর এসব খালি গল্পের বইতেই পাওয়া যায়। অয়ন ক্যামেরার ফিল্ম কিনতে গেছে। ব্যস্ত হয়ে ঢোকেন ড. ফারুক। সাথে একজন মাঝবয়সী লোক।

: শিপলু, তোমার কাজ হবে অধ্যাপক নাওয়াজ-এর সাথে নোট করা।

নামটা চেনা মনে হচ্ছে শিপলুর। ক'দিন আগে পত্রিকায় ছবি দেখেছে। হিমালয়ের রহস্যময় তুষার মানব ইয়েতির পায়ের ছাপ তুলে নিয়ে এসেছেন বলে দাবী করেছেন।

: নাওয়াজ সাহেব একজন প্রাণিবিজ্ঞানী। ঝোঁক তার পাখিদের প্রতি। তুমি বলেছিলে পাখি দেখার ক্লাবের সদস্য হয়েছো। ওর সাথে কাজ করো। ভালো লাগবে।

চশমাটা খুলতে খুলতে বলেন নাওয়াজ সাহেবঃ তেমন আর কি কাজ। আমার সাথে নোট করবে। দ্বীপের পাখিদের জীবনযাত্রার ওপর স্টাডি করবো। পাখিদের প্রতি উৎসাহ থাকলেই চলবে।

: আপনিও এখানে নাস্তা করে নিন। আমি যাই বাজারের ব্যাপারে খোঁজ নিতে। তিন সপ্তাহের বাজার করা কম ঝামেলা নাকি। মুরগী নিয়ে নেব কয়েক ঝাঁকা। অবশ্য ওখানে তাজা মাছ পাওয়া যাবে মেলা। গলদা চিংড়ির যা এক একটা সাইজ না।

বলে আবার ব্যস্ত হয়ে চলে গেলেন ড. ফারুক। শিপলু বেয়ারাকে ডেকে নাস্তা দিতে বলে।

: আমি পত্রিকায় আপনার কথা পড়েছি। ইয়েতির পায়ের ছাপ নাকি তুলেছেন?

: অনেকেই ঠাট্টা করছে কিন্তু আমি জোর গলায় বলতে পারি ওটা ইয়েতিরই পায়ের ছাপ। সে এক থ্রিলিং ব্যাপার।

অধ্যাপক নাওয়াজের চোখ দুটো যেন খানিক চকচক করে উঠলো। হিমালয়ের দুধশাদা প্রান্তরের ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ বুঝি শুনছেন। কি দুর্গম পথ। মানুষের মেষ বসতি থিয়াং বুচির মঠ ছাড়িয়ে যাও। মাঝে মাঝে সেখানে অদ্ভুত ধরনের শিসের মতো শব্দ শোনা যায়।

: ইয়েতির পায়ের ছাপ ঠিক মানুষের মতো নয়। অনেকটা পাহাড়ী ভাল্লুকের মতো। তফাৎটা রয়েছে বুড়ো আঙুলে। বুড়ো আঙুলটা আর চারটে আঙুল থেকে আলাদা। আঙুলের মাথাটা থ্যাবড়া আর গোল।

: আচ্ছা, ইয়েতি সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? মাঝে মাঝে ফ্লাইং সসার এর মতোই এদের খবর পত্রিকায় আলোড়ন তুলছে।

শিপলু এর মধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পাহাড় চূড়ায় আতঙ্ক' উপন্যাসটি পড়েছে। সেখানে আছে হিমালয়ের অনেক ছমছম করা রহস্য।

: দেখো আমি ঠিক প্রমাণ করে বলতে পারবো না। হিমালয় হল বানর গোষ্ঠী কেন্দ্র। ওখান থেকেই বানর গোষ্ঠী পৃথিবীর সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং এমন কোনো একটা বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী দুর্গম পাহাড়ে রয়ে গেছে যাদের আমরা সন্ধান পাচ্ছি না হয়তো এরাই ইয়েতি হতে পারে। তবে এটা আমার অনুমান মাত্র।

: কি খেয়ে বেঁচে থাকে ওরা! আমি এক লেখায় পড়েছিলাম হিমালয়ে নাকি রুন নামে এক রকম শেকড় পাওয়া যায় বরফের নীচে। ওটি খেলে দীর্ঘজীবী হওয়া যায়! তিব্বতী সাধুরা ঐ শেকড় আকুল হয়ে খোঁজে।

সেন্ট মার্টিনস-এর পাখিদের রিপোর্ট আমি ইউনেস্কোর সদর দফতর প্যারিসে পাঠাবো। পৃথিবীর বন্যপ্রাণি সংরক্ষণের জন্যে ওরা অভিযান চালাচ্ছে।

: কোন কোন প্রাণি আমাদের দেশ থেকে নির্মূল হয়ে যাচ্ছে?

ডিম পোচে গরম মশলার গুঁড়ো ছড়াতে ছড়াতে জিজ্ঞেস করে শিপলু।

: বন বিড়াল, সোনালি বিড়াল, বাঘ ডাঁশ, পাহাড়ী কোয়েল। গত বছর গিয়েছিলাম তিব্বতী কালো গলার সারসদের খোঁজ নিতে। এক সময় নেপাল, ভুটান, সিকিমে গবেষণা করেছি। পাখির পায়ে রিং বেঁধে ওদের গতিপথ বোঝার চেষ্টা করেছি।

ব্যাগ থেকে একটি পত্রিকা বের করেন নাওয়াজ সাহেব। একটি রিপোর্টের দিকে আঙুল দিয়ে দেখান। পাখি বিশেষজ্ঞ ড. সলীম আলীর বোম্বের বাড়িতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিলো। তাঁর বাড়ির টেনিস কোর্টে একবার একটি ধূসর খঞ্জ ধরা পড়ো ছিলো সেপ্টেম্বরের প্রায় একই সময়ে পাখিটি ওই বাড়ির টেনিস কোর্টে ফিরে এসেছে। এইভাবে পর পর পাঁচ বছর ওই ধূসর খঞ্জনাটি সেপ্টেম্বর মাসে ড. সলীম আলীর অতিথি হয়েছিলো। জানা গেছে যে ওই পাখিটি আসতো দু'হাজার মাইল দূর থেকে।

: মাইগ্রেটেড বার্ডস। যাযাবর পাখি। হিমালয় থেকে তো প্রচুর আসে। লেজ নাচানো খঞ্জনা, পিপিট, লেজা হাঁস।

: এদের আসা যাওয়ার একটি নিয়ম আছে। উত্তর থেকে সব-চাইতে আগে আসে খঞ্জনা। সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে আসে। রমনা পার্কের আশেপাশে, ধানমন্ডি লেকের কাছে ওদেরকে বসতে দেখা যায়। সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে চলে আসে এসব পাখি। ঝাঁক বেঁধে চলাফেরা করে। তারপর সবুজ ঘাস বনের খোঁজে আরো দক্ষিণে চলে যায়। কখনো সিলোন পর্যন্ত। আবার ঘরে ফেরার সময় বাংলাদেশ হয়ে যায়। মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে চলে যায় খঞ্জনারা।

সে সময় দরজা খুলে এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। গম্ভীর চেহারা। একটু ঝুঁকে হাঁটেন। বাটিকের শার্ট গায়ে।

সেদিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললেন নাওয়াজ সাহেব,

ড. রিজভী। আমেরিকার 'নাসা'তে ছিলেন। উপগ্রহের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। উনিও যাচ্ছেন আমাদের সাথে।

ড. রিজভী কোণায় টেবিলে বসে খবরের কাগজ খুলে পড়তে লাগলেন।

বুঝলে, বিদেশে ওর খুব নাম। দেশের লোক তাকে বলতে গেলে চেনেই না। আমি হামবুর্গের এক সেমিনারে ওর বক্তৃতা শুনেছি। চমৎকার বলেন।

: কি নিয়ে বলেছিলেন?

: উপগ্রহের পাঠানো ছবির সাহায্যে খনিজ দ্রব্যের অনুসন্ধান। ব্যাপারটাতে বেশ সাফল্য দেখা গেছে। অনেক দেশই এই পদ্ধতিকে কাজে লাগাচ্ছে। কালার ছবি পাঠায় উপগ্রহ। সেই রঙের বিশ্লেষণ করে

মাটির কোন্ স্তরে কি আছে তা আবিষ্কার করা যায়। এটা খুব জটিল ব্যাপার। আমি যদ্দূর জানি ড. রিজভী ছাড়া এখানে আর কেউ এ ব্যাপারে এক্সপার্ট নেই।

শিপলু কৌতূহলী হয়ে ভদ্রলোককে দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি কাগজের আড়াল থেকে মুখই নামাচ্ছেন না।

: তবে একটা ডিফেক্ট আছে তার।

: কি?

: পেরুতে এক বিমান দুর্ঘটনায় পড়ে আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন। একটি চোখ তাঁর নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। ফলে সেখানে পাথরের চোখ লাগিয়েছেন। তাঁর বেঁচে যাওয়াটা বিস্ময়কর।

পাথরের চোখ! চট করে সবুজ চিঠির কবিতাটির কথা মনে হয় শিপলুর 'পাথরের চোখ যার একটি। তোমার লক্ষ্য সেই লোকটি।'

এই তাহলে সেই লোক! রহস্যের কুয়াশার মাঝে একটুকরো আলো যেন এসে পড়ে।

কামটের আক্রমণ

স্থানীয় পত্রিকার কয়েকজন রিপোর্টার এসেছে। তারা অভিযাত্রী দলটির পরিকল্পনা শুনতে চায়। দলের নেতা জানালেন, দ্বীপটির ব্যাপক পরিচয় নেয়াটাই উদ্দেশ্যে। সবাই জানে চুনা পাথর ভালো পাওয়া যায়, জেলেদের বসতি আছে, চিংড়ি ধরার ঘাঁটি কিন্তু পুরোপুরি জরীপ করার চেষ্টা করা হয়নি। দ্বীপটির সব রকম প্রাকৃতিক সম্পদের তালিকা প্রয়োজন। দ্বীপটিকে প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের জন্য সংরক্ষিত এলাকা হিশেবে ঘোষণার কথাও ভাবছেন। পৃথিবীর বহু দেশে এরকম অঞ্চল আছে।

প্রকৃতি যেখানে শান্ত। যান্ত্রিক সভ্যতার জটিলতা যেখানে যায়নি। তেল, ধোঁয়াতে নষ্ট হয়নি যার সবুজ। পশু পাখিরা আপন মনে বৃদ্ধি পায়। লোভী শিকারীরা এসে ওদের হত্যা করে না। পর্যটন কেন্দ্র করে সেই নিভৃত জীবন যেন তছনছ না হয়ে যায়। পাহাড়ে খাঁজে যেন পাখিরা নিরাপদে বাসা বেঁধে ডিম পাড়তে পারে।

ফটোগ্রাফাররা দলের সবার ছবি তুলে নিল ঝটপট। সবার মাঝে দাঁড়িয়ে শিপলুর নিজেকে বেশ দামী মনে হচ্ছে। আকাশী রঙের একটা গেঞ্জী পরেছে সে। অয়নের গলায় ক্যামেরা ঝোলানো।

কয়েকটি গাড়ি করে ওরা রওয়ানা দিল জাহাজঘাটের দিকে। শিপলু গলায় সবুজ রুমাল বেঁধে রেখেছে। ঘাটে নামতেই শিপলু দেখলো সামনের লম্প্যাপোস্টের নিচে একজন লম্বা লোক দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। শিপলু একাপাশে সরে আসে। মনে এখন সাহস এসে গেছে তার। জড়িয়ে গেছে সে ঘটনার জালে। ফেরার পথ নেই। লোকটি তাকে একটি বই দেয়। সাথে একটি বেতের ঝুড়ি। আনারস কলাতে ভর্তি। ভালোই হলো। জাহাজে মজা করে খাওয়া যাবে।

সবাই একে একে জাহাজে উঠে গেছে। কয়েকটা গাঙচিল তীরে পাক খেয়ে উড়ছে। আশেপাশে ছোট বড় অনেক জলযান। কয়েকটি বার্জ।

নীল আকাশে একঝাঁক শাদা পাখি উড়ছে। সজন পাখি বুঝি। জাহাজ শব্দ করে ছেড়ে দেয়। তীর আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে যায়। কয়েকজন বাইনোকুলার দিয়ে দেখছেন। শিপলু ডেকের এক কোণায় দাঁড়িয়ে। বইটি খুলতেই সেই রকম সবুজ চিঠি। তেমনি গোটা গোটা করে লেখা :

'পাথর চোখের লোকটি হলো সব খবরের মূল। এ ব্যাপারে কক্ষনো যে করবে নাকো ভুল। এখন তোমার কাজটি হবে আলাপ করে জানা। কোন বিষয়ে দক্ষ তিনি মন দিয়ে তা শোনা। দ্বীপে যাবার দুদিন পরে সন্ধ্যে বেলার দিকে। জেলে পাড়ার কেওড়া ঝোপে থাকবে মোদের লোকে।'

অয়ন সী-গালদের ছবি তুলছে।

: শিপলু, কোন পাখি নাকি আকাশে উড়তে উড়তেই ডিম পাড়ে?

: এই যা পাখিটার নাম ভুলে গেছি।

মি. মেহতা একপাশে মুভি ক্যামেরা নিয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের ফেনার ছবি তুলছেন। অয়ন কমলার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বলে 'মি. মেহতা, কোন জায়গায় স্যাটিং করে আনন্দ পেয়েছেন?

: স্পেনে। কি উজ্জ্বল রোদ। বুল ফাইটের ছবি তুলে ছিলাম।

বুনো মোষদের কোথা থেকে আনা হয় তার উপর ছবি।

শিপলুর মনে পড়লো ক'দিন আগে টেলিভিশনে মাদ্রিদের রাস্তায় বুনো মোষের ছুটোছুটির ছবি দেখেছিলো। কেমন শিং বাগিয়ে মত্ত হয়ে দৌড়াচ্ছে মোষ। লোকজন ছুটতে গিয়ে অনেক সময় গুঁতো খেয়ে মাটিতে উল্টে পড়ছে। ছবিগুলো আসছিলো বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে।

আরেকটি নতুন ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে কালিয়াকৈরের কাছে তালিবাবাদে। হঠাৎ চট করে মাথায় একটা বুদ্ধি আসে শিপলুর। ড. রিজভীর সাথে কথা বলার সুযোগ পাওয়া গেছে। উপগ্রহের মাধ্যমে কি করে টেলিভিশনে ছবি আসছে, এটা জিজ্ঞেস করেই তো আলাপ শুরু, করা যাবে। সবুজ চিঠিতে নির্দেশ আছে তার সাথে ভাব জমাতে হবে। যারা তাকে এইসব রহস্যময় চিঠি দিচ্ছে তারা যে করেই হোক ড. রিজভীর কাছ থেকে কোন গোপন তথ্য চাইছে। কি সেই গোপন তথ্য!

শিপলু এদিক ওদিক তাকিয়ে ড. রিজভীকে খুঁজে পেল না। কেবিনে আছে বোধ হয়।

জামান চাচার কেবিনেই পাওয়া গেল ড. রিজভীকে। বিশ্ববিখ্যাত ফুটবল খেলোয়ার ব্রাজিলের পেলের জীবনী পড়ছেন। তাকে দেখে জামান চাচা হাসলেন।

: কি শিপলু, কেমন লাগছে। বাড়ির জন্যে আবার মন খারাপ করছে না তো।

: কি যে বলেন চাচা। আপনারা সবাই আছেন।

: তোমার আব্বা কলেজ জীবনে চমৎকার ক্রিকেট খেলতো।

খেলার কথায় ড. রিজভী মুখ তুললেন। শিপলু বুঝলো ভদ্রলোক খেলার প্রতি আগ্রহী।

ড. রিজভীকে চেনোতো। অনেকদিন নাসায় ছিলেন। আচ্ছা বলোতো 'নাসা'র পুরো নামটা কি?

জামান চাচা এক সময় টেলিভিশনে ধাঁধার আসর পরিচালনা করতেন। বোধ হয় প্রশ্ন করার সেই অভ্যেস এখনো রয়ে গেছে।

: ন্যাশনাল এ্যারোন্যাটিক্স এ্যান্ড স্পেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশান।

চটপট উত্তর দেয় শিপলু। স্কুলের সাধারণ জ্ঞানের প্রতিযোগিতায় বরাবর প্রথম হয়েছে সে।

ড. রিজভী এবার যেন একটু হাসি মুখে তাকান শিপলুর দিকে। যাক, বরফ বুঝি এবার একটু গলছে।

: তুমি মনে হয় মহাকাশ বিজ্ঞানের ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড!

: খুব। কতো ছবি পাঠাচ্ছে যান্ত্রিক উপগ্রহগুলো। পাইওনিয়ার দশ এর পাঠানো বৃহস্পতি গ্রহের ছবি দেখলাম। কি পরিষ্কার। সেই রহস্যময় রক্ত তিলকের ছবিও আছে।

: পঁচিশ লাখ মাইল দূর থেকেও এসব ছবি পাইওনিয়ার বেতার সংকেতের মাধ্যমে পৃথিবীর মান মন্দিরে পাঠিয়েছিল।

: কি করে পাইওনিয়ারকে কার্যকর রাখা হতো?

: পৃথিবী থেকে বেতার সংকেতের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছিল। তার প্রতিটি সৌর কোষ সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করেছে। ৫৭০ পাউন্ডের এই যানটি একবার সরাসরি বৃহস্পতির কাছাকাছি তীব্র বিকিরণ বলয়ের মধ্যে পড়লো। কি উৎকণ্ঠা তখন আমাদের।

: কেন?

: এই বুঝি ধ্বংস হয়ে গেল পাইওনিয়ার। বলয়ের মাঝে ইলেকট্রন আর প্রোটনের ঝড় বইছে। মুহূর্তে যানটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ৬ কোটি ৬০ লক্ষ ভোল্টের ইলেকট্রন আর প্রোটন কণার বর্ষণ। তবে আশ্চর্য তার কোনো ক্ষতি হয়নি। ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যে ঐ ভয়াবহ এলাকা পার হয়ে গিয়েছিল।

খেতে যাবার ডাক পড়ে। কেবিন থেকে বাইরে আসার সময় শিপলু বলে 'আজকাল তো আমাদের টেলিভিশনে স্যাটেলাইট থেকে পাঠানো ছবি দেখাচ্ছে। কেমন করে এসব হয়, আমাকে বুঝিয়ে বলবেন?

শিপলু আলাপের রেশ রাখতে চাইছে।

: দ্বীপে নেমে নিই। অনেক গল্প করা যাবে।

ডেকের কাছে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে আছে শিপলু। কি রহস্যময় এই সমুদ্র। এখন যদি মৎস্যকন্যাদের দেখা যেত। সূর্যের আলোতে চিকচিক করছে তাদের আঁশ। নীল নদের জেলেদের জালে কয়েক বছর আগে তিনটি মৎসকন্যা ধরা পড়েছিল।

সেই রূপকথার গল্প। হান্স এন্ডারসনের লেখা। রূপোলি চাঁদের আলোতে পালতোলা জাহাজে বসে গান গায় সোনালি চুলের রাজপুত্র। সেই গানের সুর আলতো করে ছড়িয়ে যায় সমুদ্রের বুকে। সেই সুর গিয়ে বুঝি ধাক্কা দেয় মৎস্যকন্যাদের পুরীতে। তাই ওরা আকুল হয়ে সাঁতরে ভেসে ওঠে জাহাজের কাছে। এই রূপকথার গল্প নিয়ে একটা রঙিন ছায়াছবি দেখেছিল শিপলু। এতো মন ছুঁয়ে যাওয়া ছবি।

এক সময় সেন্ট মার্টিন্স দ্বীপ চোখে পড়ে। অধ্যাপক নাওয়াজ সাহেব সেদিকে তাকিয়ে বলেন 'কেওড়া আর গরাণ গাছ লাগাতে হবে প্রচুর'।

জেলেরা নৌকো নিয়ে মাঝ সমুদ্রে যাচ্ছে মাছ ধরতে।

জাহাজ থামতেই কয়েকজন লোক দৌড়ে এলো।

: সাহেব, আপনাগো লগে ডাক্তার আছে? ওষুধ আছে? একজনের পা কামটে লইয়া গেছে।

ডিঙ্গির বুকেই শোয়ানো রয়েছে লোকটি। জাহাজ থেকেই দেখা যায়। পুরো পাটাই হাঙ্গর কেটে নিয়ে গেছে। হাঙ্গরকে এখানকার লোক বলে কামট। চুপিসারে এরা আসে।

দৃশ্যটা দেখে শিউরে উঠলো শিপলু।

প্রবাল দ্বীপে এসে প্রথমেই দেখলো কামটের আক্রমণ।

সাগর দানো

আকাশটা হঠাৎ হয়ে এলো লিচু ফলের মতো ফ্যাকাসে। সারেং বলল, বৃষ্টি আসতে পারে। শিপলু সবার সাথে নেমে আসে জাহাজ থেকে। শহরের ধূলোবালি নেই। পেট্রোলের ধোঁয়ায় দূষিত বাতাস নেই। তাজা বাতাসের ঝাপটায় প্রবাল দ্বীপ গাছের সবুজ পাতা নেড়ে যেন বলছে 'এসো এসো।'

একদল জেলে চলেছে মাছ ধরতে। ভরাট গলায় গান গাইছে একজন। মি. মেহতা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন রোদ থাকলে ছবি তুলতাম। জেলেদের ছবি তুলতে ভালো লাগে। বহু সমুদ্রের মাছ ধরার ছবি তুলেছি।

ক্যারিবিয়ান সাগরের নিগ্রো জেলেরা মাছ ধরতে গিয়ে কান্নাভেজা গান গায়। বলে, পানি থেকে দিনরাত এতো রুপোলি ফসল তুলি তবু আমাদের ওয়ালো পাতার ঝুপড়িতে মিটমিটে অন্ধকার। চকচকে মাছ খেয়ে শহরের বাবুরা খুশি। আমাদের ছেলেমেয়েদের উদোম গা রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে যায়।

শিপলুর মনটা একটু উদাস হয়ে যায়। পৃথিবীর সব দেশের দুঃখের ভাষা বুঝি একরকম। কোথায় সেই ক্যারিবিয়ান সাগর। হাভানা বন্দরের আলো দেখা যায় দূর থেকে। মাছের নেশায় তরতরিয়ে কতগুলো নৌকো যাচ্ছে, এইসব ছবি দেখে শিপলু।

মি. মেহতাকে তখন গল্পের নেশায় পেয়েছে। উড়ন্ত শাদা ডানার একটা বড় পাখি দেখতে দেখতে বলেন, কালো মানুষদের দুঃখ

অন্যরকম। তাদের গানে তাই যন্ত্রণা। কষ্টের ঝলক। আমেরিকার নিগ্রোরা এখন তাদের আদি ইতিহাস জানতে চাইছে। কোন দেশের মাটিতে তাদের শেকড় তাই জানতে অস্থির হয়ে উঠেছে। সেদিন একটা বই পড়লাম। রুটস। আলেক্স হেলির লেখা। সারা পৃথিবীতে তোলপাড় ফেলে দিয়েছে এই বইটি। এর কাহিনি নিয়ে বারো ঘণ্টার ছবি হয়েছে। দেখলে চোখ ভিজে আসে।

নীল সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে শিপলু যেন একটু অন্যরকম হয়ে যায়। হয়তো এখানকার খোলা পরিবেশটাই তাকে এমন করে তুলেছে। শহরের লাইব্রেরিতে বসে বই পড়লে এতো অস্থিরতা জাগে না। কিন্তু এখানে এসে কেন অন্য প্রান্তের মানুষদের জন্যে মন টানছে। খোলা আকাশের নীচে, প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়ালে মানুষ কি অন্য রকম হয়? কে জানে!

শিপলু প্রশ্ন করে।

রুটস বইটির নায়ক কে?

: কুনটা কিনটে। আমেরিকার নিগ্রো আলেক্স হেলি নিজেদের পূর্ব পূরুষদের ইতিহাসকে খুঁজতে গিয়ে হাজির হলেন সুদূর জাম্বিয়ার জুফুরে গ্রামে। ১৭৫০ সালে যেখান থেকে কুনটাকে শাদা মানুষেরা ক্রীতদাস হিশেবে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল। কতো দেশ ঘুরে হেলি গিয়ে হাজির সেই ছায়াঘেরা জুফুরেতে।

জুফুরে নামটি যেন শিপলুকে এক আধো আলোছায়ার পৃথিবীতে নিয়ে যায়। মি. মেহতা ছবির পরিচালক। কথা বলেন এমন করে যাতে চোখের সামনে ছবি ফুটে ওঠে।

: সেই যে গ্রাম জুফুরে। মন্দ কিছু হলে, রোগ শোক দেখা দিলে ছাগল ষাঁড়ের বলি দেয়া হতো। পুরোহিত ঢাক পিটিয়ে মন্তর পড়তেন। খরা হলে মানুষদের কষ্ট। বৃষ্টির জন্যে তখন নাচ। গাঁয়ের মানুষরা ভয় করতো টুব্বাকে। সোনালি চুলের শাদা মানুষ ওরা। গ্রাম পুড়িয়ে দেয়। লোকদের ধারণা কালো মানুষদের অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয় 'জং সাং ডু' নামের এক জায়গায়। গাঁয়ের কেউ হারালে একটি শাদা মোরগ জবাই করা হতো। যদি মোরগটা মুখ থুবড়ে বুক মাটিতে পেতে মৃত্যু বরণ করে, তখন আশা থাকে সে ফিরে আসবে। কিন্তু মোরগটা যদি পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে পিঠ ঠেকিয়ে মরে যায়, তখন আর আশা নেই। এমনি করে একদিন হারিয়ে ছিল কুনটা কিনটে।'

মি. মেহতার কণ্ঠস্বরকে তখন দূরাগত মনে হয়। কয়েকটা লাল কাঁকড়া ওদের দেখে পালালো।

দ্বীপের লোকজন অবাক চোখে শহর থেকে আসা দলটিকে দেখছে। এমনভাবে আর কেউ এখানে আসেনি। মাঝে মাঝে শহর থেকে মাছের বেপারী আসে। কয়েকজন ছাত্র এসেছিল একবার চুনা পাথরের নমুনা দেখতে। কিন্তু এই রকম নামকরা লোকদের কোনো দল আসেনি। কতো দেশ বিদেশ ঘোরা বিজ্ঞানীদের দল। থাকবে কোথায় তারা? সারা দ্বীপে সে রকম থাকার ব্যবস্থা যে নেই। দলের সাথে আছে তাঁবু। লটবহর একদম কম না। কয়েক খাঁচা পশু আনা হয়েছে। এখানকার পরিবেশে ওদের চাষ করা যায় কিনা, সেটা দেখাই উদ্দেশ্য।

: এই হচ্ছে লেগুন।

যেতে যেতে শিপলুকে দেখায় ড. ফারুক। চিকচিকে রোদ পড়ে ঝলকাচ্ছে। হঠাৎ পানিতে কাঁপন তুলে লাফ দেয় উড়ুক্কু মাছ। অয়ন ঝট করে ছবি তুলে নেয়। সেদিকে মুগ্ধ চোখে তাকায় শিপলু।

এক জায়গায় কয়েকটি লোক মাটিতে ঝুঁকে কি যেন তুলছে।

শিপলু এগিয়ে দেখে শামুক তুলছে।

জামান চাচা তাই দেখে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। জাপানে ছিলেন অনেকদিন। শামুক তার চেনা খাবার।

চমৎকার খাবার। সামুদ্রিক শামুক কাঁচাই খাওয়া যায়। নুন আর লেবুর রস দিয়ে জড়িয়ে সুরুত করে টান মারলেই হলো। ঠিক মনে হবে কচি তাল শাঁস খাচ্ছো।

শিপলু জানে, ঢাকা শহরের অনেক চীনে রেস্তোরাঁতে শামুকের স্যুপ পাওয়া যায়।

জামান চাচা ওদের কাছ থেকে কিছু শামুক হাতে তুলে নিলেন।

: এদের চাষ করলে ভালো আয় হবে।

: কেমন করে হবে শামুকের চাষ?

: গরমের দিনে শামুক গুলোকে ছায়াঘেরা স্যাঁতস্যাঁতে মাটিতে ছেড়ে দিতে হবে। মাটি থাকবে ঝুরঝুরে। খেতে দিতে হবে বাঁধাকপির পাতা, শ্যাওলা। এগুলো খেয়ে শামুকরা মোটাতাজা হয়ে মাটির নীচে ঢুকে যাবে। শীতের শেষে মাটি খুঁড়ে ওদের তুলে আগুনে ঝলসে নিলেই হলো।

ড. রিজভীকে দেখার চেষ্টা করে শিপলু। কালো চশমা পরে হাঁটছেন। শামুক তোলা দলের একজন লোক কেমন জুলজুল করে তাকিয়ে আছে শিপলুর দিকে। লোকটার ভুরুর কাছে মস্ত কাটা দাগ। গলায় হাড়ের মালা। সবুজ ফতুয়া গায়।

: কেমন লাগতাছে দ্বীপ?

লোকটা জিজ্ঞেস করে শিপলুকে।

: চমৎকার।

: আমার নাম পাতু বাউরী।

: ও।

লোকটা এবার ফিসফিসিয়ে বলে : সবুজ চিঠি পাইছেন তো। আমি জানি।

সবুজ চিঠি। মাথাটা ঝন করে উঠলো শিপলুর।

: আমি মাঝে মাঝে দেখা দিমু। পরে কথা অইবো।

বলে চট করে গাছপালার আড়ালে মিলিয়ে গেল লোকটা।

ব্যাপারটা কাউকে বলাও যাচ্ছে না। নিজে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। ফেলুদার অবশ্য এই সমস্যা ছিল না। অয়নকে এখন এসব বলতে সাহস হচ্ছে না। যে দল তাকে দু'বার সবুজ চিঠি দিয়েছে, তাদের সাথে পাতু বাউরীর সম্পর্ক রয়েছে। এই দ্বীপেও তাহলে রহস্যের জাল ছাড়ানো। এখানে আসার দু'দিন পর সন্ধেবেলায় কেওড়া ঝোপে সেই দলের লোক তার জন্যে অপেক্ষা করবে। নতুন নির্দেশ দেবে। শিপলু মনে মনে ঠিক করে আজকে রাতের মধ্যেই ড. রিজভীর কাছ থেকে কিছু খবর নিতে হবে।

খোলা জায়গায় কয়েকটি তাঁবু খাটানো হলো। বেশ শক্ত তাঁবু। মৌচাকের গজারী বনে স্কাউট ক্যাম্পে শিপলু অনেকবার থেকেছে। সবচে ভালো লাগতো তাঁবু জলসা। এখানেও কি তা হবে?

মোট তাঁবু হয়েছে ছয়টা। শিপলু আর অয়ন রয়েছে মি. মেহতার সাথে। ছবি তোলার একগাদা যন্ত্রপাতি।

দলের নেতা সবাইকে জানিয়ে দিলেন কয়েক গ্রুপে ভাগ হয়ে দ্বীপটি ঘুরে দেখার জন্য। সন্ধেবেলায় সবাই মিলিত হবে আলোচনার জন্য। শিপলু গেল ড. রিজভীর গ্রুপে।

গরম চা তৈরি হয়ে গেল চট করে। সাথে কেক, কলা।

ড. রিজভী একটু খুড়িয়ে হাঁটেন। পেরুর বিমান দুর্ঘটনার ফলে হয়তো। মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে আসলে মানুষরা নিশ্চয়ই অন্য ধরনের হয়ে যায়।

ড. রিজভী হাঁটতে হাঁটতে বললেন, এখানকার চিংড়ি খুব টেষ্টফুল। চলো, আমরা কোন জেলে পাড়ায় যাই। রাতে চিংড়ির মগজ দিয়ে চমৎকার একটা খাবার রাঁধবো। সায়াম দ্বীপের এক ডাক্তারের কাছে শিখেছিলাম।

কয়েকটা কাদাখোঁচা তিরতির করে পালিয়ে গেল। দ্বীপটি নির্জন। এদিকটায় লোক বসতি খুব কম।

সামনেই জেলেপাড়া। থিকথিকে কাদা। পাতা দিয়ে বানানো ছোট ছোট ঝুপড়ী। দড়িতে সার সার মাছ শুকাতে দেয়া হয়েছে। শুটকী মাছের বিরাট চালান যায় এখান থেকে। ছোট ছেলে মেয়েরা হই হল্লা করে খেলছে।

: এখানকার জেলেরা বহু রকমের মাছ ধরে। চিংড়ি, পমফ্রেট, লাল ভেটকী, সারমাই, ইলিশ, চাঁদা। চাঁদা মাছ দেখতে রূপোর টাকার মতো গোল। এদিকে যে কোনো সময় জাল ফেললেই কিছু না কিছু চাঁদা উঠবে। এই মাছ থেকে তৈরি হয় ফিশ মিল বা মাছের গুঁড়ো। হাঁস মুরগীর খাবার।

লোকটি মহাশূন্য থেকে উপগ্রহের পাঠানো ছবির পাশাপাশি জলের রূপোলি ফসলের মেলা খবর রাখে বোঝা যাচ্ছে।

: আমরা এসেছি বাগদা চিংড়ির খোঁজে। বঙ্গোপসাগরের টাইগার প্রণের নামে পৃথিবীর মৎস্য রসিকদের জিভে জল এসে যাবে। যা চাহিদা।

ওদের দেখে এক বুড়ো জেলে বেরিয়ে আসে।

: কি চান বাবু? গলদা চিংড়ি আছে? বসেন। মাছ নিয়ে এখুনি ফিরবে।

বুড়ো একটা হোগলা পাতার চাটাই নিয়ে আসে।

: আর সুখ নাই। মাছ মারতে এখন ডর লাগে।

: কেন?

: সাগর দানো আইছে।

সাগর দানো! সে আবার কি?

: গেল মাসে আমাদের একটা নৌকারে ডুবাইয়া দিল। এক জন কোনোমতে ফিরা আইতে পারছিলো। হে কইলো আন্ধারের মইধ্যে কি আলোর ছটা! চক্ষু যেন ঝলসাইয়া যায়। আমরা কালা কইতর বলি দিলাম। সাগরে ভাসাইলাম বলি দেওয়া কইতর। তবু সাগর দানোর ডর আছে।

ড. রিজভী ভাবলেন, দ্বীপের অশিক্ষিত জেলেরা এ রকম আজগুবি গল্প বলেই থাকে। শিপলুর মনে হলো, মাছ ধরতে গিয়ে কোনো কিছু দেখে ভয় পেয়েছে জেলেরা।

দূর থেকে দেখা গেল জাল কাঁধে করে জেলেদের ফিরতে। বাচ্চারা ছুটে গেল।

ঝাঁকা ভর্তি বাগদা চিংড়ি এসেছে। ডালা সরাতেই ড. রিজভীর চোখ দুটো চকচক করে উঠলো।

হলদে, নীলচে, পাঁশুটে আর চকোলেট রং এর ডোরাকাটা বাগদা। কোন কোনটা এক ফুটের মত লম্বা। জীয়ন্ত চিংড়িগুলো লাল শালুকের মতো। কিছু সবুজ রং এর চিংড়িও আছে। এদের বেশির ভাগই বিদেশে রফতানি হয়ে যায়। অন্য দেশের ট্রলার এসে আমাদের সমুদ্র সীমা থেকে মাছ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে।

পাহারা দেবার কোনো ব্যবস্থা নেই। প্রতি বছর এ ভাবে লক্ষ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বাংলাদেশ। এ নিয়ে ইদানীং পত্র পত্রিকায় খুব লেখালেখি হচ্ছে।

একজন জেলে জাল ছড়াতে ছড়াতে বল্লো, গগন খুড়া কাইল রাইতে নাহি সাগর দানোর লাল চক্ষু দেখছে উত্তর পাড়ার মানুষ।

বৃদ্ধ গগন জেলে ফিসফিসিয়ে বলে 'সামনের পূর্ণিমার রাইতে আবার কালা কইতর বলি দিতে অইবো।'

ড. রিজভী বেশ কিছু চিংড়ি কিনলেন। সন্ধ্যের আবছা অন্ধকার দ্বীপে ছড়িয়ে পড়েছে। পাখিরা ফিরছে নীড়ে। ওরা তাড়াতাড়ি হেঁটে আসছে। শিপলু দেখলো সামনের ঝোপটা থেকে সাঁৎ করে একটা মুখ সরে গেল। আবছা আলোর মাঝেও মুখটাকে চিনালো শিপলু। পাতু বাউরী।

রাতের অতিথি

চিংড়ি মগজ দিয়ে রান্নাটা খেতে খুব মজার হয়েছিল। ছোটবেলায় শিপলুর শখ ছিলো গরম ভাতের সাথে চিংড়ির মগজ মেখে খাবার। ভাতের রং

লাল হলে দলা দলা করে খেত। আব্বা আজকাল বাজার থেকে চিংড়ি কেনেন না। সব নাকি বিদেশে রফতানী হয়ে যায়। অল্প যা পাওয়া যায় তারও আকাশ ছোঁয়া দাম। গুলশান বনানীর বিদেশি দূতাবাসের গাড়িগুলো এসে সেগুলো কিনে নিয়ে যায়।

তাঁবুর বাইরে শোঁ শোঁ করে বাতাস বইছে। অয়ন চকচকে চোখে বলে, নিজেদের মনে হচ্ছে জাহাজ ডুবির পর সুইস ফ্যামিলী রবিনসনের মত। আর শহরে যাবো না। বুনো ফলমূল খাবো। মাছ ধরে ঝিনুক দিয়ে চেছে চেছে আগুনে ঝলসে খাবো। আর যদি হঠাৎ করে ক্রুসোর মত কয়েকটা পাহাড়ী ছাগল পেয়ে যাই তবে তো কথাই নেই।

শিপলু ড. রিজভীর মুখোমুখি বসেছে। কালো চশমাটা খুলছেন না। পাথরের একটি চোখ এমনিভাবে ঢেকে রেখেছেন।

: ড. রিজভী, ভূ-উপগ্রহ ছাড়া হলো কবে?

অয়নও এসে বসেছে পাশে। ড. রিজভী কফি বানাচ্ছেন। সুগন্ধে তাঁবুটা ভরে উঠেছে।

তোমাদের খুব কৌতূহল দেখছি। সব ব্যাপারে কৌতূহল থাকা ভালো। সাধারণ জ্ঞানের দিক থেকে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা অনেক খোঁজখবর রাখে। আমেরিকায় তোমার সমবয়েসী একটা ছেলে যতো খবর রাখে তোমরা তার চাইতে অনেক বেশি রাখো। আমেরিকায় থাকার সময় দেখেছিলাম ওরা শুধু নিজেদের খবর রাখে। পাশাপাশি আমাদের ছেলেরা অনেক দেশের খবর রাখে। অথচ ওদের খবর পাওয়ার কতো সুবিধে। দিনরাত চলছে টেলিভিশন। হরেক রকমের বিশ্বকোষ বেরুচ্ছে দেদার। কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করছে জীবন। স্কুলে আছে ক্লোজ সার্কিট টিভি। ভিডিও ক্যাসেট বিক্রি হয় শাক-সবজীর মতো।

অয়ন বলে : বোধহয় বেশি প্রাচুর্য্যের মাঝে থাকলে মানুষের কৌতূহল কমে যায়। অনায়াসেই যখন সবকিছু পাওয়া যায় তখন আগ্রহটা তেমন থাকে না।

: আমরা জানতে চাইছিলাম স্যাটেলাইট সম্পর্কে।

শিপলু প্রসঙ্গ পাল্টাতে চায়। ওর মাঝে সবুজ চিঠির লাইন গুনগুন করে, পাথর চোখের লোকটি হলো।

সব খবরের মূল,
এ ব্যাপারে কক্ষনো যে
করবে নাকো ভুল'

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে ড. রিজভী বলেন 'স্যাটেলাইট। ভূ-উপগ্রহ। ১৯৪৫ সালে এক আমেরিকান সায়েন্স ফিকশান লেখক আর্থার সি. ক্লার্ক প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের কল্পনা করেন। তাঁর ধারণা ছিল, রকেটের সাহায্যে মহাশূন্যে যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে মহাশূন্যে স্টেশন স্থাপন করা। আর উপগ্রহকে রিপিটার হিশেবে ব্যবহার করা। তারপর এই নিয়ে চললো প্রচুর গবেষণা। ১৯৫৭ সালে প্রথম উপগ্রহ নিক্ষেপ করা হলো। আজকাল মানুষের কত কল্যাণে এসেছে উপগ্রহ।

ড. রিজভী ওদের দু'জনকেও কফি দিলেন।

: বহু রকমের উপগ্রহ আছে। যোগাযোগ, ব্রডকাষ্ট, আবহাওয়া নেভিগেশন, ভূ-সম্পদ অনুসন্ধানকারী উপগ্রহ। আমাদের বঙ্গোপসাগরের উপকূলে যে নতুন ভূমি জেগে উঠেছে ১৯৭২ সালের শেষের দিকে ভূ-সম্পদ অনুসন্ধানকারী উপগ্রহের পাঠানো ছবি থেকেই তা জানা গেছে। এ ছাড়া কক্সবাজারের এক বিরাট এলাকায় মূল্যবান খনিজ পাওয়ার সম্ভাবনার কথাও জানা গেছে।

বিস্মিত হয়ে শুনছে শিপলু আর অয়ন।

: এর পুরো নামই. আর. টি. এস উপগ্রহ। ১৯৭২ সালের ২৩শে জুলাই নিক্ষেপ করা হয়েছে।

ড. রিজভী সুটকেস থেকে কাগজ বের করে তার উপর ছবি এঁকে বোঝাতে থাকেন।

: এটি পৃথিবীকে একটি বৃত্তাকার পথে প্রায় ১০৩ মিনিটে উত্তর থেকে দক্ষিণে একবার করে প্রদক্ষিণ করে। ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীকে প্রায় ১৪ বার প্রদক্ষিণ করে। উপগ্রহের ওজন প্রায় ১৯৬৫ পাউন্ড। প্রতিদিন সমগ্র পৃথিবীর ৭৫২ টি ছবি তুলছে। প্রতিটি ছবি ১১৬/১১৫ মাইল মাপের হয়ে থাকে। এই উপগ্রহের উঠানো ছবি আর তথ্য প্রেরক যন্ত্র দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে স্টেশনগুলোতে পাঠানো হয়। আমি নতুন কিছু ছবি পেয়েছি। তাতে বঙ্গোপসাগরের কোনো কোনো এলাকায় মাছের ঘাঁটি আছে তার সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। এখানে আসার উদ্দেশ্য সে সম্পর্কে ভালো করে খোঁজ নেয়া। এবার ফিরে সরকারকে প্ল্যান দেব। সমুদ্রে মাছ সংগ্রহের জন্যে আমাদের বিরাট ট্রলার বহর তৈরি করতে হবে। প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে এই মাছ শিল্পের। বাগদা চিংড়ির বিশাল ঘাঁটি পেলে তো কথাই নেই। আর জানো তো, চিংড়ি যে উপকূলে থাকে সেখানে তেল পাবার সম্ভাবনাও খুব বেশি। ইন্দোনেশিয়াতে তাই হয়েছে।'

ড. রিজভীর চোখে তখন স্বপ্ন। অতল সমুদ্রের নীচে ঝাঁক বেধে চলেছে বাগদা চিংড়ির দল। লাখো লাখো চিংড়ি। মূল্যবান এসব সম্পদ গোপনে হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। চুপিসারে আসছে অন্য দেশের ট্রলার।

রাত অনেক হয়েছে।

অয়ন ক্যাসেটে মিউজিক শোনে। স্পেনের মিউজিক। পাহাড়ী এলাকার সুর। যেন ঘোড় সওয়ারের দল পুরনো দুর্গের পাশ দিয়ে, জলপাই বনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। সোনালি রোদের ঢেউ-এর মতো মিউজিকটা। মি. মেহতা তাই শুনে বলেন, আমার নতুন ছবিতে এরকম সুর ব্যবহার করবো।

ড. রিজভীও আছেন তাদের তাঁবুতে।

শিপলুর ঘুম পাচ্ছে। সুরটা শুনতে শুনতে একসময় সে ঘুমের সমুদ্রে ডুবে গেল।

সকালে ড. রিজভী গম্ভীর মনে জানালেন রাতের বেলা তাঁবুতে চোর ঢুকেছিলো। ঘুম ভেঙে যাওয়াতে পালিয়েছে। রাতে ঝিপঝিপে বৃষ্টি হয়েছিল। তাঁবুর বাইরে এসে শিপলু দেখে মানুষের পায়ের ছাপ। ফেলুদা হলে কিভাবে দেখতো। দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করে লোকটির একটি পায়ে চারটে আঙ্গুল। ভেজা মাটিতে চারটি আঙ্গুলের ছাপ দেবে আছে।

ট্রলারের বন্দি

সকালের দিকে ড. রিজভী বেরিয়ে গেছেন। যাবার সময় তাড়াহুড়ো করে ডাইরিটি সুটকেসে রেখে যান নি। বাতাসে ডাইরির পাতা উড়ে যায়। কিছুক্ষণ আগের লেখা কয়েকটি লাইন চোখে পড়ে :

'রাতে চোর কিসের জন্যে এসেছিল বুঝতে পেরেছি। বহু টাকার লোভ দেখিয়েও ওরা জিনিশটা আদায় করতে পারবে না। জিনিশটা সব সময় আমার সাথে সাথেই থাকে। কেউ তা খুঁজে পাবে না।'

রোদ উঠেছে ফকফক করে। সকালের নাস্তা খেয়ে অভিযাত্রী দলটি দ্বীপের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়লো। শিপলু চলেছে ড. ফারুকের সাথে। এক খাঁচায় চারটে র‍্যাকুন এনেছেন তিনি। র‍্যাকুন হলো ধূসর কটা রঙের দুফুট লম্বা মাংসাশী নিশাচর ভালুক শ্রেণীর প্রাণি। বেড়ালের মতো এদের ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া লম্বা ল্যাজ। ভালো সাঁতার জানে। চাঁদের আলোয় মাছ, ব্যাঙ ধরে খায়। পাখি, ডিম, পোকা, ইঁদুর ধরে খায়। এদের বৈশিষ্ট্য

হলো, মাংশ খাবার আগে পানিতে টুপ করে ধুয়ে নেয়। ড. ফারুক ভাবছেন, এই প্রবাল দ্বীপে র‍্যাকুনের চাষ করা গেলে মন্দ হয় না। এদের মাংশ খুব স্বাদ। পশম দামী।

দ্বীপে আসার দু'দিন হলো আজ। সন্ধ্যেবেলায় যেতে হবে কেওড়া ঝোপের কাছে। ভেতরে ভেতরে চাপা উত্তেজনা বাড়ছে শিপলুর।

সারাদিন দ্বীপের এদকি-সেদিক ঘুরলো। কতো রকমের পাখি। স্নাইপই রয়েছে হরেক জাতের। এক জায়গায় দেখে পোষা ভোঁদড় দিয়ে মাছ ধরছে কয়েকজন লোক। ওদের মধ্যে পাতু বাউরী আছে। শিপলুকে দেখে তেমনি জুলজুল করে তাকায়। শিপলু হঠাৎ দেখে পাতু বাউরীর বা পায়ের একটা আঙ্গুল নেই। চারটে আঙ্গুল।

: কি সাহেব? নতুন খবর কিছু পাইলেন? আইজ সইন্ধা বেলায় কিন্তু খবর চাই।

পাতু বাউরী তেমনি সাপের মতো হিসহিসিয়ে কথা বলে।

: কেওড়া ঝোপটা কোনদিকে?

: পূর্ব দিকে। সুপারী বাগানের পিছে।

বিকেল বেলায় শিপলু পকেটে একটা ছবি আর টর্চ নেয়। ছুরিটাকে মোজার ভেতরে লুকিয়ে রাখে। চেক দেশের এক কিশোর গোয়েন্দার ছবিতে এইভাবে ছুরি লুকিয়ে রাখতে দেখে ছিল। কাউকে এখন কিছু বলার দরকার নেই। কোনো কিছুতে ভয় পাবার মত ছেলে নয় সে।

জামান চাচা কোত্থেকে এক ব্যাগ চাঁদা মাছ নিয়ে এসেছেন। বাবুর্চিকে মাছ ভাজার কথা জোরে জোরে বলছেন।

শিপলু সুপুরি বাগানের দিকে বেরিয়ে যায়। সমুদ্রের বুক থেকে কলকল করে বাতাস ভেসে আসছে। একজন লোক ক্ষেত থেকে মরিচ তুলছিল। সুপুরি বাগানের কথাটা বলতেই রাস্তা দেখিয়ে দেয়।

সন্ধ্যার অন্ধকারে জোনাক জ্বলছে। জায়গাটা খুব নির্জন। ঐতো কেওড়া ঝোপ। অন্ধকারেও বুঝতে পারে এক টুকরো লাল আগুনের টিপ জ্বলছে আর নিভছে। কেউ সিগ্রেট টানছে। শিপলু গিয়ে ওখানে দাঁড়ায়।

একজন যুবক দাঁড়িয়ে। চেকশার্ট। চোখগুলো ছোট ছোট।

: এসেছেন। আমার সাথে এখন যেতে হবে।

: কোথায়?

: বড় সাহেবের কাছে। আপনাকে নিয়ে যাওয়াই আমার কাজ।

: চলো।

শিপলুর কোনো ভয়ডর নেই। জুডোতে কালো বেল্ট পেয়েছে। খানিক হেঁটে যেতেই ঢালু জমি। তারপর সমুদ্র।

গাছপালার ভেতরে একটা স্পিড বোট দেখা যায়। চকচক করছে।

: আসেন।

শিপলু স্পিড বোটে উঠে আসে। শব্দ করে বোটটা চলতে থাকে। একটা খাঁড়ির ভেতর দিয়ে যাচ্ছে বোটটা। মিনিট দশেক চলার পর একটা দুর্গম এলাকায় যেন এসে পড়ে। চারদিকে ঘন জঙ্গলের মত। ঝিঁঝি ডাকছে। তার মধ্যে দপ করে তীব্র লাল আলো জ্বলে ওঠে। এটাই তাহলে জেলেদের সেই সাগর দানো!

শিপলু দেখে বোটটা একটা ট্রলারের কাছে এসে থামে। ট্রলারটা এমন ভাবে ঝোপের মাঝে রাখা যাতে বাইরে থেকে একদম দেখা যায় না।

চেক শার্ট পরা লোকটা পাখির ডাকের মত শিস দেয়। সাংকেতিক শব্দ। ট্রলারের একটা কেবিনের দরজা খুলে যায়। সেখান থেকে ঝপাৎ করে দড়ির একটা সিঁড়ি ঝুলিয়ে দেয়া হয়। শিপলু তরতর করে উঠে যায়। লোকটা হাসিমুখে শুধু বলে 'সাবাশ।' ট্রলারটা বিদেশি। একজন লোক অন্ধকার ফুঁড়ে যেন এসে বলে : ভেতরে যান।

শিপলু দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে।

আবছা আলো। চেয়ারে একজন লোক বসে আছে। মঙ্গোলিয়ান ধাঁচের মুখ। ভাবলেশহীন চোখ।

লোকটি শিপলুকে দেখে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে কথা বলে

তোমার মতো সাহসী ছেলে পেয়ে আমি খুব খুশী হয়েছি। ঠিক ছেলেকেই নির্বাচন করতে পেরেছি আমরা। ড. রিজভীর কাছে যে সমুদ্রের মাছের ঘাঁটির ম্যাপগুলো আছে তা কাল এনে দিতে হবে। তাহলে অনেক পুরস্কার।

চট করে পুরো ব্যপারটা বোঝার চেষ্টা করে শিপলু। এরা বিদেশি মাছ ধরার দল। অবৈধভাবে বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশ করেছে। গোপনে ট্রলার ভর্তি করে মাছ নিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্র লুণ্ঠনকারী।

একটা লোক বড় একটি বাটি নিয়ে ঢোকে। ধোঁয়া উঠছে। বাটিটা লোকটির সামনে রাখে। চাকা চাকা মাংশ ভাসছে। শিপলু বুঝতে পারে

হাঙ্গরের মাংশ খাচ্ছে লোকটা। শিপলুর জন্য আসে ঠাণ্ডা কমলার রস। বাদাম। হাঙ্গারের মাংসে কিছুটা এমোনিয়ার গন্ধ থাকে। তাই রান্নার আগে দুধে ডুবিয়ে নিতে হয়। তাতে গন্ধটা চলে যায়।

: বলো, কবে দেবে ম্যাপটা? কালকেই দাও। আমরা কাল এখান থেকে চলে যেতে চাই।

: আমার কাছে তো ম্যপ নেই।

: জানি। তুমি আর রিজভী তো এক তাঁবুতেই থাকো। আজ রাতেই সরিয়ে ফেল।

ভূ-উপগ্রহের ছবি। মাছের বিশাল ঘাঁটিগুলোর সন্ধান আছে যাতে। কোটি কোটি মাছ। বাগদা চিংড়ি। সন্ধান পেলে সব লুটে নিয়ে যাবে এই বিদেশিরা। নিজেদের দেশ বঞ্চিত হবে এক বিরাট সম্পদ থেকে।

চট করে সিদ্ধান্ত নেয় শিপলু।

: ম্যাপ তোমাদের কিছুতেই দেব না।

লোকটার চোখ দুটো যেন আরেকটু ছোট হয়ে যায়।

: বখশিস প্রচুর টাকা।

: কিছুতেই না।

লোকটা এবার চাপা গলায় বলে 'তাহলে তোমাকেও এখান থেকে যেতে দেয়া হবে না। কারণ তুমি আমাদের খবর জেনে গেছ। তোমাকে মাঝ সমুদ্রে নিয়ে হাঙ্গর দিয়ে খাওয়াবো। কাল সকালে ড. রিজভীর কাছ থেকে ঐ ছবি আর ম্যাপ আমি নিজেই ছিনিয়ে নিতে পারবো। আমার পোষা বিষাক্ত কাঁকড়া যখন ড. রিজভীর কণ্ঠনালী চেপে ধরবে তখন কি উনি আর আমাদের ম্যাপটা না দিয়ে পারবেন? লোকটা অবশ্য টেটিয়া। তবে তার ওষুধ আছে আমার কাছে। তুমি এখন বন্দী। বোকা ছেলে কোথাকার।

তারপর লোকটা দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বলে। একজন বেঁটে মত লোক এসে শিপলুর কাঁধ শক্ত করে ধরে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যায়। বাইরে চাঁদের আলোতে শিপলু দেখে পাতু বাউরী এক কোণায় দাঁড়িয়ে আছে। বিদেশিদের চর হয়ে কাজ করছে এরা।

শিপলুকে কোণার ঘরটায় ঢুকিয়ে দরজা দড়াম করে বন্ধ করে দেয়। একরাশ অন্ধকারে ডুবে যায় শিপলু। সে এখন ট্রলারের ভেতরে বন্দী। অভিযাত্রী দলের কারো কাছে খবর দেবার কোন উপায় নেই। নিশ্চয়ই এতোক্ষণে তার জন্যে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণের মাঝেই শিপলুর চোখে অন্ধকারটা সয়ে আসে। চারদিকে কেমন মাছের আঁশটে গন্ধ। শরীর গুলিয়ে আসতে চায়।

খানিক পর কয়েকজন লোকের কথাবার্তা শোনা যায়। শিপলু মোজার ভেতরে হাত দিয়ে দেখে। ছুরিটা ঠিকই আছে। কান খাড়া করে কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করে। লোকটা নির্দেশ দিচ্ছে স্পিড বোট রেডি করতে। এখুনি বোধহয় রওয়ানা দেবে ড. রিজভীর খোঁজে। গলা শুনে বোঝা যাচ্ছে মরিয়া হয়ে উঠেছে। হামলা চলবে আজ রাতেই। কাল সকালের মধ্যেই বোধহয় এখান থেকে ট্রলার নিয়ে চলে যাবে ওরা।

তারপর? মাঝ সমুদ্রে শিপলু হবে হাঙ্গরের খাদ্য। লোকটার কথায় বুঝতে পারলো, ট্রলারে মাত্র তিনজন লোক রয়ে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে থাকে শিপলু।

কিছুক্ষণ পর স্পিড বোট চালু করার শব্দ শোনা যায়।

শিপলু কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। তারপর দরজা ধাক্কাতে থাকে। একজন লোকের গলা শোনা যায়।

: কি হয়েছে? ধাক্কাচ্ছো কেন?

আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে। পানি খাবো।

মনে হলো লোকটা কি যেন ভাবছে।

: দাঁড়াও। আনছি।

শিপলু মোজার ভেতর থেকে ছুরিটা খুলে এক কোণায় দাঁড়িয়ে রইলো। লোকটার হেঁটে আসার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বাতির আলো যেন দুলতে দুলতে আসছে।

ক্যাঁচ করে শব্দ। তালা খোলা হচ্ছে। দরজাটা খুলতেই বাতির আলোতে শিপলু দেখলো একটা হিংস্র মুখ। লোকটা কিছু বোঝার আগেই নিপুণভাবে ছুরিটা উড়িয়ে মেরেছে শিপলু। লোকটার হাতের কনুইতে বিঁধে গেল ছুরিটা। একটা চাপা আর্তনাদ করে সেখানেই বসে পড়লো লোকটা। শিপলু ছুটে গিয়ে লোকটার ঘাড়ের রগে আঘাত করে। ব্যাস, এবার ঘণ্টা কয়েকের জন্য অজ্ঞান হয়ে থাকো বাছাধন। পা টিপে টিপে সামনে এগুতে থাকে শিপলু। একটা লোক টুলে বসে ঢুলছে। বিদেশি। হাতে স্টেনগান। নেশা করেছে বোধহয়।

শিপলু একটা কাঠ ছুঁড়ে মারে। লোহার রেলিং-এ ঠং করে শব্দ হয়। লোকটা ঝিমুনির মাঝেই উঠে দাঁড়িয়ে দেখতে যায় শব্দটা কোত্থেকে হলো। শিপলু পেছন থেকে চুপিসারে গিয়ে কারাতের এক কায়দায় লোকটাকে ফেলে দেয়। গোঁ গোঁ করতে থাকে লোকটা। শিপলু তাড়াতাড়ি লোকটার মুখে কাপড় গুঁজে দেয়। কোনা থেকে দড়ি এনে ওর হাতগুলো কষে বাধ। ততক্ষণে নেশা ছুটে গেছে লোকটার। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছে শিপলুকে। শিপলু স্টেনগানটা তুলে সামনে যেতে থাকে।

ট্রলারের তিনজনের দুজনই এখন পরাস্ত। বাকি রয়েছে একজন। খটখট শব্দ হচ্ছে। বাকি একজন বোধহয় এদিকেই আসছে। সাঁৎ করে এক পাশে সরে গেল শিপলু। ম্লান আলোতে দেখলো পাতু বাউরী আসছে। শিপলু স্টেনগান তাক করে বলল 'পাতু বাউরী, এক গুলিতে মাথা ফাঁক করে দেব। জলদি আমাকে বোটে করে নিয়ে যাও।

পাতু বাউরী যেন ভূত দেখছে। ভয়ার্ত চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

: তোমাকে বাঁচাতে এখন কেউ আসবে না। দুটোকেই শেষ করে দিয়েছি।

পাতু বাউরীকে শিপলু ভয় দেখাতে চাইছে। কথাটায় কাজ হলো। পাতু বাউরী কাঁপা গলায় শুধু বল্লো 'আসেন।'

'কোন রকম চালাকি করার চেষ্টা করলে একদম ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।'

পাতু বাউরীর পেছন পেছন স্টেন হাতে শিপলু। স্পিড বোটে উঠে স্টার্ট দেয়। শিপলু স্টেন তাক করে ধরে আছে।

সুপুরি বাগানের কাছে এসে থামতে বলে শিপলু। ও যেন একটা বিপদের আভাস পাচ্ছে। বোটটা আস্তে আস্তে তীরে এসে লাগে। যন্ত্রটা থামবার সময়েই শিপলু পাতু বাউরীর ঘড়ের রগে তেমনি করে আঘাত করে। বোটের বুকেই লুটিয়ে পড়ে পাতু বাউরীর অজ্ঞান শরীরটা।

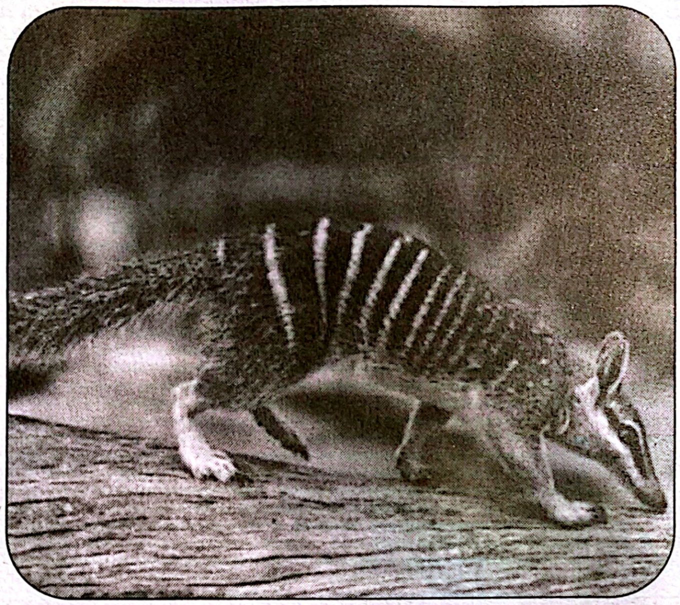
এক লাফ দিয়ে তীরে নামে শিপলু। চাঁদের আলোতে সব কিছু ফকফক করছে। কয়েকটা রাতচরা পাখি ডেকে উঠলো। পথ এবার চেনা। ছম ছম করে বাতাস বইছে। শিপলু সুপুরি বাগানের ভেতর দিয়ে হাঁটা শুরু করলো।

কিছুদূর যেতেই দেখলো সামনের ঝোপের কাছে দুটো পা দেখা যাচ্ছে। শাদা প্যান্ট পরা। তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে দেখে ড. রিজভীর প্রাণহীন দেহটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। গলার কাছে কালচে রক্তের দাগ। বিষাক্ত পোষা কাঁকড়া দিয়েই কি তাহলে হত্যা করা হয়েছে ড. রিজভীকে! কিন্তু ম্যাপ! ম্যাপ কি নিয়ে গেছে ওরা। হঠাৎ ড. রিজভীর ডাইরির একটা পাতার কথা মনে হলো শিপলুর। 'জিনিশটা সব সময় আমার সাথেই থাকে।'

ম্যাপটা কোথায় রেখেছেন ড. রিজভী।

কি একটা কথা মনে হওয়াতে ড. রিজভীর চোখের দিকে তাকায় শিপলু। চাঁদের আলোতে বাঁ দিকের পাথরের চোখটা জ্বলজ্বল করছে। সেটা একটু চাপ দিতেই খুলে আসে। চোখের গর্তটা অন্ধকার। সেখানে ছোট্ট এক রোল ফিল্ম। ম্যাপটা তাহলে মাইক্রোফিল্ম করে এখানেই রেখেছিলেন ড. রিজভী।

শিপলুকে এখন তাঁবুতে যেতে হবে। যে করেই হোক আজ রাতের মধ্যেই বিদেশি ট্রলারকে ধরতে হবে।



বিরল প্রাণীর খোঁজে

গাছের কাছে, পাখির কাছে

আবহাওয়া এখন হঠাৎ করে যেন পাল্টে যেতে শুরু করেছে। চারপাশের পরিবেশের দিকে তাকালে এই পরিবর্তনটা সহজেই বোঝা যায়। আকাশ হয়েছে ঘন নীল। অপরাজিতা ফুলের মতো রং। পেঁজা তুলো মতো ভেসে যায় মেঘ। বিকেলের পর থেকেই রোদের ঝাঁজ কেমন কমে আসতে শুরু করে। নরম হয়ে আসছে রোদ। চিলচিলে ভাবটা তেমন আর নেই। সবচাইতে মন উতল করা ব্যাপারটি ঘটছে বাতাসের বেলায়। হঠাৎ করে উত্তর থেকে বইতে তাকে সিরসিয়ে হাওয়া। বাতাসে তখন আলতো শীতের আমেজ। এ রকম বাতাসের স্পর্শে পিকুর মন কি রকম যেন উদাস হয়ে যায়। হু হু করে ওঠে বুকের ভেতরটা। মনে হয় কোন উধাও মাঠের মাঝখানে একাকী গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। তখন গাছগুলো থেকে অবিরাম পাতা ঝরে। ওর আব্বার চাকরির সুবাদে বিভিন্ন বনে জঙ্গলে কেটেছে দিনগুলো। থেকেছে নিরিবিলি অঞ্চলে। বেশিরভাগ সময় কাঠের বাংলোতে। কখনো রাতেরববেলায় হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেলে দেখেছে জানালার কাচের শার্সিতে মুখ ঘষছে মায়া হরিণ। তাদের কাজল কালো চোখে কিসের যেন আকুতি। উত্তুরে বাতাসের ঝাপটায় বাংলোবা-ড়ির কাঠের রেলিং-এ শব্দ ওঠে। রাতচরা পাখির ডাক শুনে মনে হতো ছানা হারিয়ে মা পাখিরা বুঝি কাঁদছে। নাকি ডিমখেকো সাপেরা নিঃশব্দে

হামলা করেছে ওই পাখিদের বাসায়। মনে হয় সরল গাছের ছায়ায় ছায়ায় হারিয়ে যাওয়া সেই নিরিবিলি মফস্বল শহর কাঁকনপুরের কথা, সেখানকার মিশন স্কুলের টুলবেঞ্চির দিনগুলো। লাল টালির ছাদের বাংলো ধাঁচের বাড়িগুলো। গেটগুলোতে লতিয়ে রয়েছে মাধবী লতার ঝাড়। টুকটুকে লাল ফুল। উজ্জ্বল কলাবাতির গাছ। কাঁকনপুরে সবসময় বইতে থাকে পাশের বনভূমি থেকে ছুটে আসার উত্তর দক্ষিণের এলোমেলো হাওয়া। সেই গানটার কথা মনে হতো। পাগল হাওয়া, কি আমার মতো তুমিও হারিয়ে গেলে। মিশন স্কুলের ঘণ্টা বাজতো। টং লিং। টং লিং। সাইকেলে যেতে যেতে ফাদার রোজারিও হাসিমুখে বলতেন, কি রকম আছো পিকু? ভালো তো।

খাগড়াছড়ির লেবুবনে দুস্পপ্রাপ্য রঙিন ভিমরাজ পাখি দেখা। বাতাসে রেশমি ফিতে মতো উড়ছে ভিমরাজের দিঘল লেজ। লেবুবনে যেন আলো ঝালর ঝুলছে। সুন্দরবনে দশ ধরনের মাছরাঙাদের খুঁজে পেয়ে দারুণ রকমের উল্লসিত হওয়া। বাদাবনের ফাঁকে ফাঁকে মাছরাঙাদের ডানার ঝিলিক সে কখনো ভুলতে পারে না। এতো আশ্চর্য সুন্দর রঙের পালক। সবচাইতে চমৎকার ছিল লাল মাছরাঙা। একবার অবাক হয়ে গিয়েছিল কালো টুপি মাছরাঙাদের দেখে। নতুন প্রজাতির পাখি চেনার মাঝে রয়েছে এক ধরনের উত্তেজনা। ওই পাখিগুলো ছিল বেগুনি নীল রঙের ঝলমলে পাখি। মাথায় ভেলভেট কালো টুপি। ঘাড়ে সাদা কলার। গায়ের উপর দিকে পালক বেগুনি নীল। ডানায় সাদা ছোপ। নিচের দিকে সমস্ত পালক ফিকে লালচে হলুদ। দূরবিন দিয়ে ভালো করে পাখিটাকে লক্ষ্য করেছিল পিকু চোখের সামনে রঙের রোশনাই। বনের পাখিরা যেন তার জীবনে একরাশ ভালোলাগা হয়ে এসেছে। পাখিদের বিচিত্র ভুবন পিকুকে ক্রমাগতভাবে পরিবর্তিত করে। গজনির পাতাঝরা শালবনে সন্ধান পেয়েছিল বাদামি খরগোশের। আদিবাসী একটি ছেলে তুলতুলে খরগোশটাকে ধারালো শিক দিয়ে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করছিল। পিকুর শরীরে ছিটকে পড়েছিল রক্ত। এই দৃশ্যটা তাকে বহু দিন বিষণ্ন রেখেছিল। তারপরও বন মানে সবুজ স্মৃতি। বিভূতিভূষণের কিছু লেখা তার মুখস্ত ছিল। ... কি অপরূপ সবুজের সমুদ্র চারদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে। অরণ্যের অস্পষ্ট সীমারেখা পর্যন্ত বিস্তৃত থৈ থৈ করিতেছে। এক এক জায়গায় ফাঁকা জঙ্গলের দিকে বনের কি অনুপম

শোভা। মানুষের চোখে আড়ালে সভ্য জগতের সীমা হইতে বহু দূরে এতো সৌন্দর্য কার জন্য যে সাজোনো'। কোন কারণে মন খারাপ হলে পিকু এসব রঙিন স্মৃতির মাঝে অনায়াসে ডুব দেয়। খুব ছোটবেলায় মাকে হারিয়ে পিকু জঙ্গলের গহীণ পথে ঘুরে ঘুরে বড় হয়েছে। ওর বন্ধু তাই হরেক রকমের পাখি আর গাছপালা।

খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসা বাতাস যেন পিকুকে জানিয়ে দেয় ঋতু পরিবর্তনের কথা। এই চমৎকার সময়টুকু পিকু অনুভব করতে চায়। এই এলোমেলো বাতাস। ঝরা পাতার শব্দ। গাছের মগডালে লেগে থাকা শেষ বিকেলে যাই যাই রোদ। বুনোহাঁসের ডানায় কাঁপন লাগিযে এসে যায় নতুন ঋতুর খবর।

রবীন্দ্রনাথের গল্পের কিশোর বলাই যেমন ঘাসের মাঠে গড়াগড়ি দিয়ে ঘন সবুজ স্পর্শকে অনুভব করতে চাইতো। ঘাসের মাঠে গড়াগড়ি দিয়ে ঘন সবুজ স্পর্শকে অনুভব করতে চাইতো। ঘাসের ডগা ঘাড়ে, শরীরে কোমলভাবে সুরসুরি দেয়। বলাই এর রোমকূপে সেই নরম স্পর্শ। বলাই যেন সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে ঘাস হতে চাইতো। ওই গল্পটি পড়ার সময় রীতিমতো শিহরিত হয়েছিল পিকু। ওর তখন মনে হয়েছিল, বলাই এর মতো সেও যে হারিয়ে যেতে চায় সবুজ ঘাসের দেশে।

দিঘল ঘাসবন পিকুকে সহজেই আকর্ষণ করে। শীতের দুপুরে লংলাবানের বাংলোতে লরা ইঙ্গলস ওয়াইল্ডারের 'ঘাসের বনে ছোট্ট কুটির' পড়ে রীতিমতো আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। সে ছিল এক ঘোরলাগা অনুভূতি। প্রেইরির দিগন্ত বিস্তৃত ঘাসবনের বিবরণ তাকে ভীষণভাবে আলোড়িত করে।

ওই কুটিরের সামনের শিমুল গাছের ডালে এসে বাসা বাঁধে চুনি কপোল মৌটুসি। বাতাসে যখন সরসর করে চেঁচোবন দুলতো তখন পিকু ভাবতো সে বুঝি প্রেইরির সোনালি গমক্ষেতের পাশে লরাদের কাঠের কুটিরে রয়েছে। মার্ক টোয়েনের 'টম সয়ার' পড়েও পিকুর দুরন্ত অভিযানে যাবার ইচ্ছে জাগে। মাধবকুন্ডে খুঁজে বের করে পাহাড়ি গুহা। মশাল জ্বালিয়ে যার ভেতরে গিয়েছিল। গভীর খাদের পিচ্ছিল পথ দিয়ে বুনোলতা ধরে ধরে হেটে যাওয়ার ভেতরে প্রচণ্ড উত্তেজনা অনুভব করে। নিজেকে কখনো ভাবে টম। আবার কখনো কাঠের ভেলায় চেপে খরস্রোতা সোমেশ্বরী নদী পাড়ি দেয়া। দুঃসাহসী হাকল বেরি ফিনের

মতো। যেতে যেতে জঙ্গলের ভেতরে। গাছের ডালে হনুমানের লাফ। জিনসের প্যান্ট হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে রেখেছে ফিনের মতো। মাথায় ঘাসের টুপি। নিজেই লগি ঠেলে ভেলাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

এভাবে বনের নিরিবিলি বাংলোতে শীতের দুপুরে পড়া বইগুলো পিকুকে অনায়াসে অন্য জগতে নিয়ে যেত।

পশু পাখির লাল তালিকা

মিরপুর চিড়িয়াখানা ওদের ফ্লাটবাড়ি থেকে একেবারে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বের মাঝে। মাস কয়েক হলো পিকুর আব্বা বন বিভাগের কেন্দ্রীয় দপ্তরে বদলি হয়ে এসেছেন। চাকরি জীবনের পুরোটা সময় ছিলেন বনাঞ্চলে। উপকূলীয় বনাঞ্চলেও কেটেছে অনেক দিন। বঙ্গোপসাগরের বুকে জেগে ওঠা নতুন ভুমিতে কেওড়া বন সৃষ্টি করেছেন। ঢাকায় এসে ওরা এই ফ্লাটবাড়িটিতে উঠেছে।

মিরপুর চিড়িয়াখানার লেকে প্রতি বছর শীতের অতিথি পাখিরা প্রচুর আসে।

ঢাকার এই ফ্লাটবাড়ির ছয় তলার বাসিন্দা হয়ে পিকু যেন খাঁচায় আটকানো পাখি হয়ে গেল। চার দেয়ালের মাঝে বন্দি জীবন। বারান্দায় ঝোলানো অর্কিডের ঝাড় মনে করিয়ে দেয় বুনোলতার কথা। চুনতির বনে সোনালুর লতা জড়ানো এক সারি গাছ পালার ধূসর বাকলের গন্ধ পিকুকে আচ্ছন্ন করেছিল। সেই গন্ধটাকে দীর্ঘদিন ভুলতে পারেনি পিকু। শহরের পোড়া তেলের গন্ধ যখন চোখে জ্বালা ধরিয়ে দেয় তখন সেই বনজ গন্ধের কথা ভেবে খানিকটা উন্মনা হয়। এতোগুলো বছর সে কাটিয়েছে অরণ্যের মাঝে। গাছগাছালি আর ঝোপঝাড়ের বুনো গন্ধের ভেতরে কেটে গেছে দিনগুলো। খোলা প্রান্তরে ছুটোছুটি করেছে। বনমোরগের মতো সতেজ ভঙ্গিতে ছুটে গেছে। ভোরে আলোতে পাতকোয়ার ডিম দেখেছে পাতার আড়ালে। গাছের খোঁড়ল থেকে সোনালি হলুদ স্যাকরা পাখির ইতিউতি তাকানোর ভঙ্গি দেখেছে খুব কাছ থেকে। বুক ভরে টেনে নিয়েছে জংলা জায়গার টসটসে গন্ধ। লতাপাতার নিবিড় ভুবনে কেটে গেছে দুরন্ত ছেলেবেলা। কতো দিন গাছের নিচে শুয়ে থেকে পাতার ফাঁকে আকাশ দেখেছে। বনজ গন্ধ তাকে তীব্রভাবে টানে। যান্ত্রিক শহরের কালো ধোঁয়া কেমন ক্লান্ত করে ফেলে। পিকু আকুল হয়ে ফিরে পেতে চায় ফেলে আসা

অরণ্যের সেই ঝাঁঝালো গন্ধ। তবু ভালো, কমপিউটারে ইন্টারনেটের সংযোগের জন্য সে এখনো পুরেপুরিভাবে অরণ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নি। তার প্রিয় শখ হচ্ছে ব্রাউজিং করে পৃথিবীর বিভিন্ন বনাঞ্চলের আর অরণ্যভুমি সম্পর্কিত ওয়েবসাইট খোঁজা। তথ্য জানা।

অনেকগুলো বছর তাদের বিভিন্ন বনে থাকতে হয়েছে। লাওয়াছড়া বনে থাকার সময় পিকু পাখি দেখার প্রতি আগ্রহী হয়। এই চমৎকার শখটি যেন তার জীবনের ধারাটিকেই বদলে দিলো। দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নেয়ার মধ্যে সেই খুঁজে পেতে উত্তেজনা। বিভিন্ন স্থানে তার নাম ছড়িয়ে গেল কিশোর গোয়েন্দা পিকু হিসেবে। দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় চলে যেতে তার কোন ভয়ডর নেই। আলুটিলার রহস্যময় পাহ-াড়ি গুহার ভেতরে সে ঢুকে গেছে অনায়াসে। ভয়ঙ্কর বিশাল সাপের আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছে কয়েকবার। সাতছড়িয়ে জঙ্গলে এক বাঁদমি ভালুক থাবা দিয়ে তার কাঁধের কিছুটা মাংস ছিড়ে নিয়েছিল। নীলকমল চরের সৈকতে একবার বিচিত্র এক সামুদ্রিক প্রাণীর আক্রমণের শিকার হয়েছিল। হলুদ ডোরাকাটা চিতি দাগের অক্টোপাসের মতো এক প্রাণী। তাকে লেজের ঝাপটা দিয়ে বেলাভূমিতে ফেলে দেয়। নির্জন সৈকতে সেবার পিকু ছিল একা। তার কাছে ছিল লম্বা কিরিচ। সেটা বের করে অদ্ভুত আকৃতির প্রাণীটার চুষনি লাগনো পা সে ঘ্যাচ ঘ্যাঁচ করে কেটে ফেলে দেয়। প্রাণীটা তখন অন্য শুড়গুলো দিয়ে পেচিয়ে ধরে পিকুকে। আপ্রাণ চেষ্টা করে পিকু প্রাণীটার শুড়ের বাঁধন থেকে বেরিয়ে আসতে। এক সময় হিংস্র প্রাণীটিকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে সক্ষম হয় পিকু। সেদিন নীলকমল সৈকতে পিকুর বিচিত্র এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

সোমেশ্বরীর খরস্রোতা নদীতে ভেসে একবার সে উপস্থিত হয়েছিল মানুষ বলি দেবার কপিল মুনির মন্দিরে। লাল চোখের ভয়ংকর চেহারার এক কাপালিক খড়গ হাতে অনেক দূর পর্যন্ত তাকে তাড়া করেছিল। সেবার বুনোলতা ধরে ঝুলে জলে পাহাড়ি খাদ অবলীলায় পেরিয়ে এসেছে পিকু। তার ওই অভিযানের কথা শুনে বন্ধুরা পিকুর নাম দিয়েছিল টার্জান বালক। কতো যে রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে গেছে পিকুর এই জীবনে। আত্মীয়রা বলে, আসলে পিকু হচ্ছে অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়। আশ্চর্য এক ক্ষমতা আছে তার। কোন ধরনের রাজ্যের গোয়েন্দা কাহিনী পড়ে পড়ে বুদ্ধিকে শাণিত রাখতে চায়। কোনান ডয়েল আর আগাথা ক্রিষ্টি তার প্রিয়

লেখক। যে কোন জটিল সমস্যার সমাধান করতে উদ্যোগী হয়। পাখি দেখার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবার পর পিকু যেন জীবনে উত্তেজনার নতুন এক খোরাক খুঁজে পেল। তার এই আগ্রহের কথা জেনে জাপান থেকে টুনু মামা চমৎকার একটি 'আশাহি পেনট্যাক্স' ক্যামেরা উপহার পাঠায়। সাথে কয়েক ধরনের দামি জুম লেন্স। ক্যামেরার সাথে পাঠানো চিঠিতে টুনু মামা লিখেছিল, আশা করি এই জুম লেন্স তোমাকে অনেক দূরের পাখিদের কাছাকাছি নিয়ে যাবে। খুব ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করে পাখিদের ছবি তুলবে। হয়তো কোনসময় তোমার লেন্সে ধরা পড়তে পারে দুর্লভ প্রজাতির কোন পাখি। নিজেকে সবসময় প্রস্তুত রাখবে অপ্রত্যাশিত কোন আনন্দের জন্য।

টুনু মামার পাঠানো ক্যামেরাটি সেই থেকে পিকুর কাছে প্রিয়। যেমন প্রিয় বাইনোকুলার। লাওয়াছড়ার গহীণ বনে এরপর নিয়মিত ক্যামেরা নিয়ে যেত পিকু। ঝোপের ভেতরে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতো দূরের গাছে বসা পাখিদের ছবি তোলার জন্যে। সে যে কী উত্তেজনা। পাখিদের নীড়ে ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা। শুনশান বন। কখনো রঙিন পালকের ঝিলিক। ঘন পাতার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে পাখি। জুম লেন্স এ নিখুঁতভাবে চোখে পড়ছে পাখিদের পালকের বৈচিত্র্য।

পিকুর টুনু মামা নিজেও একজন নামকরা বার্ড ফটোগ্রাফার। ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিতে তার বেশ কটি দুর্লভ পাখির ছবি ছাপা হয়েছে। তার তোলা কচ্চ এলাকার ফ্লেমিঙ্গো উপনিবেশের ছবি আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত হয়েছিল। টুনু মামার আসল নাম শাহান মাহমুদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের মেধাবী শিক্ষক ছিলেন। এখন কাজ করছেন আইইউসিএন এর জাপান অফিসে। ওয়ার্ল্ড কনজারভেশন ইউনিয়ন নামের এই সংস্থাটি পৃথিবীর দুর্লভ পশুপাখিদের সম্পর্কে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করে। প্রতি বছর বিলুপ্ত হওয়ার পথে রয়েছে যেসব প্রাণী তাদের তালিকা প্রকাশ করে। ওই তালিকার নাম 'আইইউসিএন রেড লিষ্ট'। বিপন্ন প্রাণীদের লাল তালিকা। লাল মানে এই প্রাণীগুলোর অস্তিত্ব প্রচণ্ড হুমকির মুখে।

টুনু মামা পিকুকে একটা কাজ দিয়েছেন। বাংলাদেশের শীতের অতিথি পাখিদের ছবি তোলা তাদের সম্পর্কে তথ্য জানিয়ে টোকিয়োতে তার কাছে পাঠানো। অনেক সময় পায়ে আংটা লাগানো পরিযায়ী পাখি

পাওয়া যায়। এ থেকে তাদের যাত্রাপথ সম্পর্কে ধারণা হয়। তাদের সংস্থা থেকে যাযাবর পাখিদের ভ্রমণ পথ দিয়ে শিগগিরই একটি বই প্রকাশিত হবে।

২০০2 সালের প্রকাশিত 'লাল তালিকা'য় রয়েছে সাইগা হরিণ, ব্যাকট্রীয় উট আর ইথিওপীয় ইঁদুরের নাম। এই তিনটি প্রাণীর সংখ্যাই কমতে কমতে এখন শেষ হয়ে যাওয়ার কাছাকাছি এসে পৌছেছে।

কাছের পাখি, দূরের পাখি

পিকুদের ফ্লাটবাড়িতে ইন্টারনেটের ব্রড ব্যান্ড পদ্ধতির সংযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। এখন সে ইচ্ছেমতো ব্রাউজিং করে বন্য প্রাণী সম্পর্কিত ওয়েবসাইট খোঁজে। তার দারুণ রোমাঞ্চ লাগে দুর্লভ জাতের কোন প্রাণী আর পাখির ছবি দেখলে।

পিকু এর মাঝে তার তোলা অনেকগুলো ছবি টোকিওতে পাঠিয়ে দিয়েছে। টুনু মামা জানিয়েছে, পিকুর পাঠানো পাখির ছবিগুলো আর তথ্য বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। ই-মেইল করে শিগগির ফলাফল জানিয়ে দেবেন। হয়তোবা পিকুর পাঠানো ছবিতে রয়েছে দুর্লভ প্রজাতির কোন পাখি। যা দেখে চমকে যাবেন সংস্থার বিশেষজ্ঞরা। ভাববেন, এখনো তাহলে টিকে রয়েছে এসব পাখি। লাল তালিকাতে উঠে যাবে সে পাখির নাম আর ছবি।

পিকুর ঘরে দুটো কমপিউটার। একটায় সে আমজাদ আলী খাঁর সরোদের সিডি চালিয়ে দেয়। অন্য কমপিউটারের সামনে বসে ব্রাউজিং করতে থাকে আইইউসিএন এর ওয়েবসাইটে। নতুন আর কি তথ্য তাতে সংযোজিত হয়েছে।

কিছুক্ষণের মাঝেই কমপিউটারের মনিটরে ভেসে উঠলো রঙিন ছবি আর তথ্য। বঙ্গোপসাগরের সবুজ কাছিম আর সুন্দরবনের সবুজ ব্যাঙ বিরল হয়ে আসছে। সেন্ট মার্টিনস দ্বীপে সবুজ কাছিমের ডিম নষ্ট করা হচ্ছে। মেছো কুমির ঘড়িয়াল একেবারে বিলুপ্তি পথে। রাজশাহীর পদ্মার কোন কোন চরাঞ্চলের কাছে গোটা পাঁচেক ঘড়িয়াল রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। টাংগুয়ার হাওরের সোনালি মেছো ঈগলও এখন বিরল শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। মিষ্টি পানির দেরপদ শামুক গত দুবছরে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

সাম্প্রতিক অনেকগুলো বৃক্ষলতা ও প্রাণী বিলুপ্তির সম্মুখীন। গত ২০০০ সালের চাইতে এর সংখ্যা ১২১ টি বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে প্রজাতি বিলুপ্তির হার স্বাভাবিক মাত্রার চাইতে এক থেকে দশ হাজার গুণ বেশি। একুশ শতকের প্রথম কয়েক দশকের মাঝেই বহু প্রাণী হারিয়ে যেতে পারে।

পৃথিবীর প্রাইমেট বা বনমানুষ গোষ্ঠীর প্রজাতিগুলোর এক তৃতীয়াংশ গুরুতর বিলুপ্তির হুমকির সম্মুখীন। গত তিন বছরের এ হুমকির সম্মুখীন প্রজাতির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভিয়েতনাম ও চীনের প্রাইমেটদের অবস্থা সবচাইতে ঝুঁকির মুখে।

এই বিলুপ্তির জন্য মুলত দায়ী মানুষ, নগরায়ন, বন ধ্বংস। পৃথিবীর প্রাণ বৈচিত্র্যের জন্য এক বড় হুমকি।

বাংলাদেশে দেখা যেত এমন এক সারস প্রজাতির তথ্য পেয়ে যায় পিকু।

শীতের অতিথি পাখি 'ডেমোসিল সারস'। পত পত শব্দ তুলে দলে বেঁধে নীল আকাশে উড়ে। তখন মুক্ত আকাশে দেখা দেয় এক অপূর্ব দৃশ্য। ওই সময়ে যেন ছবির মতো সাজানো গোছানো হয়ে ওঠে গোটা আকাশ।

ডেমোসিল সারসের ওজন তিন থেকে সাড়ে তিন কেজি। উচ্চতায় আড়াই ফুটের কাছাকাছি। বুদ্ধিমান বিচক্ষণ শক্তিসম্পন্ন এই পাখি দুরন্ত এবং চালাক। মাথা ও গলা কালো রঙের। গায়ের পালকের রং ধূসর ছাইয়ের মতোন। চোখের নিচের সাদা লম্বা পালক আছে। গলার নিচ হতে বুক পর্যন্ত কুচকুচে কালো রঙের পালক আছ। পেছনে আছে বাদামি ছাই রঙের লম্বা কাস্তে আকারের কয়েকটি পালক। স্ত্রী এবং পুরুষ ডেমোসিল সারস পাখি দেখতে প্রায় এক রকমের। ক্রোক ক্রোক শব্দে ডাকাডাকির মাধ্যমে এরা নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে। দলবদ্ধভাবে বসবাস করতে অভ্যস্ত ডেমেসিল সারস বেশিরভাগ সময় পানিতে কাটায়। জরুরি প্রয়োজনে ডাঙ্গায় ওঠে। মাটিতে থাকে। এই পাখি প্রকৃতিতে গম ও ধানসহ বিভিন্ন মাসের দিকে তিন থেকে চারটি ডিম দেয়। ২৮ থেকে ৩০ দিনে বাচ্চা ফোটে। বাচ্চা তিন হতে ছয় মাস পর্যন্ত মায়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে।

স্পর্শকাতর পাখি ডেমোসিল সারস দুর্লভ এবং বিপন্ন প্রজাতির । এই পাখির চলনে বলনে থাকে রাজকীয় ভঙ্গিমা। নিজেরাই নিজেদের পছন্দ মতো বিচরণভূমি নির্ধারণ করে নেয়। গাছ গাছালি লতা পাতা দিয়ে বাসা তৈরি করে। সাধারণত সকালে খায়। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শিকারে ব্যস্ত থাকে। দুপুরে বিশ্রাম নেয়। প্রাকৃতিক পরিবেশে এরা রাতে বড় বড় নদী কিংবা জলাশয়ে বিচরণ করে সময় কাটায়।

মঙ্গোলিয়া, বার্মা এবং চীনের বনাঞ্চলে ওদের আদি নিবাস। বাংলাদেশে এক সময়ে ডেমোসিল সারস দলবেঁধে ঝাঁকে ঝাঁকে বেড়াতে আসতো শীতের শুরুতে । আবার শীত শেষে চলে যেতো আপন ঠিকানায়। কিন্তু এখন আর সেই দৃশ্য নেই। পাখি শিকারিদের নির্মমতার শিকার হওয়ার কারণে ডেমোসিল সারস আসে না তেমন একটা।

বুনোহাঁসের ডানা

হঠাৎ পিকুর চোখ গেল জানালার বাইরে। ঝকঝকে নীল আকাশ। যেন দোয়াতের কালি ঢেলে দেয়া হয়েছে। পিকু দেখলো আকাশ পথে সারিবেঁধে উড়ে যাচ্ছে। বুনোহাঁসের একটি ঝাক। ওই পাখিদের চিনতে পারলো পিকু। এগুলো হচ্ছে রাজমনি হাঁস। এদের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে টাডোনা টাডোনা। সিডিতে আমজাদ আলী খাঁর সরোদের ধ্বনি তখন জলাভূমির ঢেউ হয়ে যেন দুলছে। পিকুর কাছে বুঝি মনে হলো ফ্লাপবাড়িটির মাঝে তার ঘর এখন আশ্চর্যজনক ভাবে এক জলাভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অবিরাম ঢেউ উঠছে, নামছে। যেন ডাকছে দূরাগত পাখিদের। বুনোহাঁসদের দেখে পিকুর চোখে মুখে তখন আনন্দের আভা ছড়িয়ে যায়। শীতের আমেজ তখন এই পাখিরা ডানায় কাঁপন তুলে এসে গেছে। ঠিক সময়ে খবর পেয়ে যায় তারা। এই হাঁসগুলো এখন নামবে মিরপুরের লেকে। পেছনে পেছনে আসছে আরো কয়েকটি ঝাঁক। বাইনোকুলার ফোকাস করে দেখতে থাকে পিকু। রাজমনি হাঁসের কপাল আর ঠোঁট ঘন লাল। মাথা ও কণ্ঠদেশ বোতল সবুজ। ডানায় আড়াআড়িভাবে কালো রেখা। কোমর ও লেজ সাদা। পাখিগুলোর উড়ার সময় এই বৈপরীত্য চোখে পড়ে।

এখন দ্রুতলয়ে বেজে চলেছে সরোদের ধ্বনি। যেন সোনালি রোদের আলো লেগে চিকমিক করছে জলাভূমির ঢেউ। এই ঢেউতে ভেসে ভেসে

যাওয়া যাবে অনেক দূর। শব্দ শুনে তার ইমেজ কল্পনা করা পিকুর এক শখ। টুনু মামা তার মাঝে এই শখটির জন্ম দিয়েছে। বেটোভেন আর মোৎসার্ট এর সিম্ফনি শুনিয়ে বলেছে ধ্বনি তরঙ্গের উপযোগী ছবিগুলো কল্পনা করতে। মিউজিক বাড়িয়ে টুনু মামা বলতো, এই যে পিকু, ভাবোতো এখন কি মনে হচ্ছে তোমার কাছে। আমার মনে হচ্ছে একটি বিশাল হ্রদের মাঝে রাজহাঁসেরা ভেসে যাচ্ছে। হ্রাসের টলটলে নীল পানি। এই যে রাজহাঁসেরা উড়ে চলেছে। সোনালি গমক্ষেতের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। লাইলাক আর টিউলিপের ঝলমলে ক্ষেত পেরিয়ে যায়। অজস্র টিউলিপ দুলছে বাতাসে। দুলছে। দুলছে। এমন করে বলতো টুনু মামা যে পিকুর জানালার কাছে তখন মনে হতো চোখ বন্ধ করে সে সত্যি সত্যি ওই রকমের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে। এই ঢেউতে বুঝি ভেসে যাওয়া যাবে অনেক দূর। পিকু জানালার কাছে ঝুঁকে মুগ্ধ চোখে দেখতে থাকে রাজমনি হাঁসদের ঝাঁককে । ভাবে এখনি ই-মেইল করতে হবে টুনু মামাকে। জানাতে হবে ঢাকার আকাশে শীতের অতিথি বৈত্রিরে ছোঁয়া। এসে গেছে দূরের বরফঢাকা অঞ্চল লাদাকের পাখিরা। তিব্বতের মানস সরোবর আর লাদাক হলো রাজহাঁসদের বাসভূমি। একথা জেনে খুব খুশি হবেন টুনু মামা। কাল সকালেই সে মিরপুর চিড়িয়খানার লেকে যাবে পাখিগুলোর ছবি তুলতে।

হঠাৎ পিকুর মনে হলো এই পাখিটির অন্য একিট নাম সে দেখেছে ড. রেজা খানের বইতে। সেখানে বলা হয়েছে সাকো। ড. রেজা খানের পাখি বিষয়ক লেখা পিকুর কাছে ভীষণ প্রিয়। তাকে একবার সুন্দর চিঠি লিখেছিলে রেজা খান। রেজা খানের এক আত্মীয় বান্টি তার ঘনিষ্ট বন্ধু পিকুর পাখি দেখা অভিযানের এক উৎসাহী সঙ্গী। চমৎকার শিস দিতে পারে বান্টি । বনে ওর শিস শুনে পাখিরাও প্রতি উত্তর দেয়। কি করে যে বান্টি পাখিদের ডাক অমন হুবহু নকল। করে বান্টিকে তখুনি ফোন করলো পিকু।

: বান্টি, দারুণ একটা খবর।

: কি খবর! এতো খুশি যে।

: খুশি হবো না। একটু আগে রাজমনি হাঁসদের বেশ কটি ঝাঁককে উড়ে যেতে দেখলাম।

: রাজমনি হাঁস ! খুব সুন্দর দেখতে।

: মিরপুরের লেকে এসেছে। প্রতি বছরই আসে। এ বছর মনে হলো একটু আগের দিকেই যেন এসে গেছে।

: আবহাওয়া জগতেও এখন অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে।

: তোর আত্মীয় ড. রেজা খান কিন্তু এই পাখিদের নাম দিয়েছিল সাকো।

: মনে পড়েছে। এই জানিস, রেজা আঙ্কেল কিন্তু এখন ঢাকায়।

: সত্যি! উনি না দুবাই চিড়িয়াখানাতে কাজ করেন।

: সেখানকার কিউরেটর। কদিন আগে এসেছেন। কাজ বিকেলে তার বক্তৃতা রয়েছে আমাদের দেশের এক দুর্লভ পাখি সম্পর্কে।

: কোথায়?

: পরিবেশ সাংবাদিক ফোরামের কার্যালয়ে। আমি যাবো শুনতে। যাবি নাকি?

: যাবো না মানে। আচ্ছা বান্টি, এ রকম একটা খবর তুই আমাকে এখনো জানাসনি। ভালো করেই জানিস দুর্লভ পাখিদের ব্যাপারে আমি কতোটা ইন্টারেস্টেড।

: জানাতাম বন্ধু জানাতাম। এখুনি জানাতাম। ফোনের কাছ আসামাত্রই তোর টেলিফোন পেলাম। এই ব্যাপারটিকে বলতে পারিস টেলিপ্যাথি।

: বান্টি, আমি কিছুক্ষণের মাঝেই তোর বাসায় আসছি। একসাথে যাবো।

পিকু ফোন ছেড়ে তাকায় আকাশের দিকে। রাজমনি হাঁসদের ঝাঁকটি এতোক্ষন বোধহয় ঝুপ ঝুপ করে নেমে পড়েছে চিড়িয়াখানার লেকে। বান্টি তাকে চমৎকার এক খবর দিয়েছে। ড. রেজা খান আজ বাংলাদেশের এক দুর্লভ পাখির সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দেবেন।

এই পাখিটির নামও তাহলে এক সময় উঠে যাবে লাল তালিকায়।

দুর্লভ কালো তিতির

পরিবেশ সাংবাদিক ফোরামের কার্যালয়ে পিকু আর বান্টি এসে তাদের আরো কজন বন্ধুর দেখা পেল। এদের সবাই 'পাখি দেখা ক্লাবে'র সদস্য। ড. রেজা খান বান্টিকে দেখে পিঠ চাপড়ে দিলেন।

: কি খবর ইয়াংম্যানদের। কেমন চলছে তোমাদের পাখি দেখার আন্দোলন?

: ভালো। আপনিতো চলে গেলেন সেই ধু ধু মরুভূমির দেশে।

: শিগগিরই ফিরে আসবো। আসলে কি জানো, দুবাই এর শেখ পরিবারের এক প্রভাবশালী সদস্য আমাকে খুব ভালো জানে। তার উৎসাহে পৃথিবীর অনেক বনাঞ্চলে যেতে পারছি পশু পাখি সংগ্রহের জন্যে। তো ভাবলাম এ সুযোগটাকে কাজে লাগাই।

: কিন্তু আমরা যে আপনাকে ভীষণভাবে মিস করছি।

: ফিরে এসে তোমাদের নিয়ে.আবার ঘুরব। বনে পাহাড়ে যাবো। ওপাশ থেকে পিকু বলে,

: মহারাষ্ট্রের নীলগির পাহাড়ে ড. সালিম আলীর সাথে যেভাবে ঘুরতেন। পিকুর দিকে হাসিমুখে তাকান রেজা খান।

: তুমি দেখছি এ খবরটা জানো।

বান্টি উৎসাহ ভরা মুখে বলে,

: ও আমার বন্ধু পিকু। পাখির ছবি তোলে।

ড. রেজা খানের মনে পড়ে পিকুর কাছে লেখা তার চিঠির কথা।

: পিকু, তুমি একবার লাওয়াছড়া বনের বেশ কিছু পাখির ছবি আর খবর আমাকে পাঠিয়েছিলে।

: আপনিও উত্তর দিয়েছিলেন।

বান্টি বলে,

: জানো রেজা আঙ্কেল, পিকুর কাছে লাওয়াছড়া বনের বেশ কিছু অচেনা পাখির ছবি আছে। আমরা পাখিগুলোর পরিচয় জানতে পারছি না।

: সাথে আছে নাকি ছবিগুলো?

পিকু জানায় আছে।

: ঠিক আছে। অনুষ্ঠান শেষ হলে একসাথে বসবো। তখন ছবিগুলো দেখিয়ো।

কৌতূহলী দর্শকে ততক্ষণে কার্যালয় ভরে গেছে। ড. রেজা খানের বক্তব্য শুনতে অনেকেই আগ্রহী। অল্প সময়ের নোটিশে এতো লোকের উপস্থিতি দেখে খুশি হন ফোরামের সভাপতি। অনেক কিশোর ছেলে এসেছে। প্রসন্ন চিত্তে সকলের দিকে তাকান ড. রেজা খান। পাখি

সম্পর্কে এ দেশের মানুষের আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে। বেশ কটি পাখি দেখার ক্লাব তাদের কার্যক্রম নিয়মিত চালিয়ে যাচ্ছে। এদেশের শীতকালীন জলচর পাখি শুমারি শুরু হয়েছে। এসব বিষয়ে শিশু কিশোরদের আগ্রহ রেজা খানকে সবচাইতে বেশি মুগ্ধ করেছে। মনে আছে, সত্তরের দশকে যখন পাখি দেখার কথা বলতেন তখন অনেকেই অবাক চোখে তাকাতো। ভাবটা এ রকম, পাখি দেখা আবার একটা শখ হয় কি করে! সেই অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

ড. রেজা খান প্রথমে বেশ কিছু তথ্য জানালেন। বাংলাদেশে বর্তমানে ৬ শ প্রজাতির পাখি রয়েছে। এর মধ্যে আবার ২ শ প্রজাতি অতিথি পাখি হিসেবে পরিচিত। ৬ থেকে ১০ প্রজাতির পাখি ইতোমধ্যেই এদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বেশ। কয়েকটি প্রজাতি এখন বিলুপ্তির পথে।

এক সময় মধুপুরে শালবনে সবুজ ময়ূর দেখা যেত। সারা দেশে হাড়গিলা পাখি সংখ্যা ৬/৭ টির বেশি হবে না। দ্রুত কমে যাচ্ছে ধনেশ পাখি, গাঙচিল, ভুবন চিল। হরিয়াল, কুটুম পাখি কমে যাচ্ছে আশংকাজনকভাবে।

এরপর ড. রেজা খান জানালেন দুর্লভ পাখি কালো তিতিরের কথা। 'শেখ ফরিদ' বলেও পাখিটির পরিচিতি রয়েছে। একসময়ও এ ধরনের তিতির প্রচুর দেখা গেলেও এখন শুধুমাত্র টিকে রয়েছে পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়ার একটি গ্রাম তেলিয়াপাড়ার কাজী বাড়ির জঙ্গলে। ওই জঙ্গলটি প্রায় ৭ একর জমি জুড়ে। এখানকটা ছাড়া আর কোথাও বর্তমানে শেখ ফরিদ পাখি নেই। মধুপুরের জঙ্গলে ষাটের দশকে দিকে এ পাখিকে দেখা যেত। সত্তরের দশকে সাভার এলাকায় এ ধরনের একটি পাখি ধরা পড়েছিল। সেই পাখিটিকে সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিজ্ঞান যাদুঘরে।

ড. রেজা খান কিছু মন খারাপ করা তথ্য দিলেন। তেঁতুলিয়ার কেউ কেউ জাল দিয়ে শেখ ফরিদ ধরে জবাই করে খায়। জঙ্গল থেকে ডিম এনে কেউ ভেজে খেয়ে ফেলে। কেউ আবার মুরগির ডিমের সাথে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটায়। শেখ ফরিদের বাচ্চারা ডিম ফোটার সাথে সাথেই জঙ্গলে দৌড়ায়। ড. রেজা খান কালো তিতিরের বেশ কয়েকটি স্লাইভ দেখালেন। পিকুর মনে হলো এ ধরনের পাখি সে যেন সাতছড়ির চা

বাগানে দেখেছে। ড. খান বললেন, তেলিয়াপাড়ার কাজী বাড়ির ওই বাগানটি জীববৈচিত্র্যে ভরা এক অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ। এ বনে এখনও অনেক দুর্লভ বন্যপ্রাণী রয়েছে। এই মূল্যবান বনকে আমাদের রক্ষা করা উচিত।

ড. রেজা খান যখন এসব বলছিলেন তখন পিকু যেন আর সেই ছোট ঘরটিতে-বসে নেই। তার সামনে থেকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় হলঘরের ইঁটের দেয়াল। কংক্রিটের প্রাচীর্ হারিয়ে যায় ধূসর শহর। একটি বিশাল, সবুজ বেলুনে চেপে সে যেন ভেসে যায়। ভাসতে ভাসতে এসে নামে নরম গাছগাছালি। ডালপালা, পাতা সরিয়ে সরিয়ে সে ঢুকছে। আবছা অন্ধকার বনের ভেতরে। আঁকিবুকি করছে জালিকাটা রোদ। অসংখ্য পাখি ডাকছে কিচিমিচির করে। কতো ধরনের গাছপালা। কোথাও লতাপাতার ঠাসবুনোট। পিকুর নাকে আসে বনজ গন্ধ। আচ্ছন্নের মতো বনের ভেতরে হেঁটে চলেছে পিকু। তার সামনে দিয়ে রঙিন লেজ নাচিয়ে উড়ে যাচ্ছে একটা ঝুঁটিঅলা পাখি।

রহস্যময় লোক

বান্টির ধাক্কায় সম্বিৎ ফিরে পায় পিকু।

: এই পিকু, কি ভাবছিস?

: না কিছু না।

: কেমন ঝিম মেরে আছিস।

: ধ্যুস।

: যাই বল, রেজা আঙ্কেল কিন্তু ভারি সুন্দর করে কথা বলে। এমন করে বলে যেন মনে হয় চোখের সামনে বুঝি ওই দৃশ্যটা দেখছি।

: সত্যি তাই। তবে আমার মনে হয়, এই ধরনের কালো তিতির আমি সাতছড়ি চা বাগানে দেখেছি।

: মনে আছে তো, রেজা আঙ্কেলকে তোর তোলা পাখির ছবিগুলো দেখাতে হবে।

আলোচনা শেষে কৌতূহলী কিশোররা ঘিরে ধরলো ড. রেজা খানকে। তারা আরো কিছু জানতে চায়। আজকের বক্তৃতায় যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয়েছে তারা।

: এই শেখ ফরিদ পাখির নাম কি তাহলে শেষ পর্যন্ত আইইউসিএন এর লাল তালিকাতে উঠবে?

ড. রেজা খান পিকুর প্রশ্নটির শুনে একটু যেন অবাক হলেন।

: এই লাল তালিকায় কথা তোমরা জানো নাকি?

: জানি। এটাকে নিয়ে রীতিমতো পর্যালোচনা করি।

: বাংলাদেশের কালো তিতিরের নাম উঠতে পারে। তবে আসামের মনিপুরের জঙ্গলে এ প্রজাতির এখনো বেশ কিছুর রয়েছে।

: মনিপুরের জঙ্গলে ওই পাখিরা কোথায় থাকে?

: কেইবুন নামজাও জাতীয় উদ্যানে।

নামটি সাথে সাথে নোট করে নেয় পিকু। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সে। কয়দিন পরেই ওই উদ্যানে যাবে। তাদের পাখি দেখার দলের পাঁচ জন সদস্য ভারতের সাত বোন বলে পরিচিত রাজ্যগুলো ভ্রমণের অনুমতি সংগ্রহ করে রেখেছে।

একজন প্রশ্ন করে,

: পাখি দেখার আন্দোলনকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়?

ড. রেজা খান প্রশ্নটি শুনে খুশি হলেন।

: এ ধরনের কোনো একটা সংস্থার কথা জানাবেন?

: এইতো কাছাকাছির মধ্যে রয়েছে কোলকাতার প্রকৃতি সংসদের কথা। আনন্দের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা হচ্ছে এই সংসদের উদ্দেশ্য। আমি এদের সম্পর্কে জানি। এরা নিয়মিতভাবে আমার কাছে ওদের বুলেটিন পাঠায়। প্রতি মাসের এক রবিবারের কোলকাতার কোনো জায়গায় পাখি দেখার কাজ সফল করে। বছরে একবার প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ক্যাম্পের আয়োজন করে। সুন্দরবনে পক্ষী সমীক্ষা চালিয়েছে। অযোধ্যা পাহাড়ে মেরুদণ্ডী প্রাণী সমীক্ষা করেছে। শীতকালীন পরিযায়ী পাখি গণনা করেছে। এসবের জন্য চাই পাখি দেখার ও চেনার উৎসাহ। ৬ ও ৭ অক্টোবর তারা পাখি দিবসের আয়োজন করে। বোটানিকাল গার্ডেনে প্রকৃতি সংসদ এ দুটি দিন সবাইকে ডাক দেয় পাখি দেখা ও চেনার জন্য। তোমরাও ইচ্ছে করলে এ ধরনের কার্যক্রম হাতে নিতে পারো।

পিকু সবাইকে শুনিয়ে জোরে জোরে বললো,

: দি আইডিয়া! এবার আমরা বার্ষিক ক্যাম্পটি করব তেলিয়াপাড়ার মাঠে। আর কাজী বাড়ির জঙ্গলে করব পাখি দেখার অভিযান।

হলঘরে বসে বেশ কিছুক্ষণ ধরেই অদ্ভুত চেহারার একটি লোকের কার্যকলাপ লক্ষ করছিল পিুক আর বান্টি। মঙ্গোলিয়ান ধাঁচের চেহারা।

ডান চোখের নিচ দিকে গভীর কাটা দাগ। জুলজুলে ধূর্ত চাউনি। লম্বাটে। মুখের গড়ন। লোকটার পরনে সবুজ জামা। কমলা রঙের টাই। টাইয়ে পান্ডার ছবি। ইংরেজিতে লেখা পান্ডাকে রক্ষা করুন। কি রকম করে যেন চারপাশের সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছিল। তার হাতে সনি কোম্পানির ছোট আকারের শক্তিশালী ভিডিও ক্যামেরা। দীর্ঘক্ষণ ধরে অনুষ্ঠানে ছবি তুলেছে। ড. রেজার বক্তব্য রেকর্ড করেছে।

বান্টির কাছে মনে হলো এ ধরনের সমাবেশে লোকটিকে যেন ঠিক মানাচ্ছে না। পিকু ভাবলো লোকটি হয়তো কোনো বিদেশি পত্রিকার প্রতিনিধি। রহস্যময় লোকটি হঠাৎ করে সরে গিয়ে বারান্দার এক কোণায় দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোনে কার সাথে দাঁড়িয়ে গেল। পিকু আর বান্টি লোকটিকে মোটেই বুঝতে দিলে না যে তারা তার প্রতিটি কার্যকলাপ লক্ষ করছে। পিকুর ষষ্ঠইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠেছে। এক ধরনের বিপদের আশঙ্কা করছে সে। কোনো বিপদ ঘনিয়ে আসার আগে কি করে যেন সে বুঝতে পারে। ওর কাছে লোকটিকে রীতিমতো অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে।

পিকু যখন তেলিয়াপাড়ার গ্রামে বার্ষিক ক্যাম্প করার প্রস্তাব করছিলো অদ্ভুত লোকটি তখন তার সমস্ত কথা ভিডিওতে ধারণ করে। বান্টি বুঝতে পারল না পিকুর এ প্রস্তাব এতো গুরুত্বের সাথে ধারণ করার মতো কি আছে। পিকুর প্রস্তাব শুনে 'পাখি দেখার ক্লাবে'র সদস্যরা এক সাথে সোল্লাসে চিৎকার করে ওঠে। ইফতি গান ধরে 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা'।

অচেনা পাখির খোঁজে

পিকু অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করছে ড. রেজা খানকে লাওয়াছড়া বাগানে তার তোলা অপরিচিতি পাখিগুলোর ছবি দেখানোর জন্য। অনেক কষ্ট করে এই ছবিগুলো তুলেছিল। সে কাটাঝোপে লেগে হাত-পা ছিঁড়ে গিয়েছিল। খানিক পর ড. খান ভিড়মুক্ত হলেন।

: রেজা আঙ্কেল, পিকুর তোলা ছবিগুলো দেখবেন না?

: কই দেখি।

প্রথম ছবিটিকে দেখেই বললেন,

: এতো নীলাম্বরি। হিমালয়ের উপরিস্তরের বাসিন্দা পাখি। শীতকালে নেমে আসে বাংলাদেশের সমতলে। খুবই নিভৃতচারী পাখি। শীতের শুরুতে সবার অলক্ষ্যে আসে। আবার বসন্তে নিভৃতে বিদায় নেয়। অনেক ধন্যবাদ পিকু যে তুমি এই পাখিটির ছবি তুলতে পেরেছো। সহজে কিন্তু এদের দেখা পাওয়া যায় না। এ হচ্ছে ব্লু হসলিং থ্রাস। সাধারণ লোকজনের কাছে এটা অজ্ঞাত এক পাখি।

পিকুর তোলা ছবিতে পাখিটিকে যেন জীবন্ত মনে হয়।

: দেখো, এর মাথা নীলচে কালো। দেহের উপরের পালক রুপোলি নীল। লেজ, কাঁধ, কপাল উজ্জ্বল নীল। ডানার পালক ঝকঝকে নীল। তাতে সাদা বুটি। অরুণাচলের জঙ্গলে এদের বেশি দেখা যায়। জলা জায়গা পছন্দ করে। পানির ধারাস্রোতের কাছাকাছি বাসা বানায় এরা।

আরেকটি পাখির ছবি দেখে বললেন,

: এটা কালো পিঠ চেরা লেজ। টার্ভিনি উপগোত্রের পাখি। শরীর শ্লেট কালো। কপালে সাদা প্যাঁচ। মাথার মুকুট চকচকে কালো। পেট থেকে দেহের নিচটা ধপধপে সাদা। থাকে জলার ধারে। জলজ পোকামাকড় খায়। পাহাড়ি ঝর্ণাতে তিরতির করে হেঁটে হেঁটে খাবার খোঁজে। ইংরেজিতে এর নাম 'ব্লাক ব্যাকড ফ্রকটেইল'।

পিকুর কাছে সেটি ছিল চমৎকার একটি দিন। ওর অভিজ্ঞতার ঝুলিটি আরো সমৃদ্ধ হলো। তার প্রিয় এক ব্যক্তিত্ব ড. রেজা খানের সান্নিধ্যে থেকে এতোক্ষণ যেন গহীন বনের পথে পথে ঘুরেছে। গিয়েছে জলাভূমির কাছে। নলখাগড়ার বনে দেখেছে বুনোহাঁসের বাসা। মায়া লাগছে কালো তিতিরের জন্য। মাত্র গুটিকায় এ জাতের পাখি এখন তেলিয়াপাড়ার জঙ্গলে কোনোমতে টিকে রয়েছে। হিংস্র মানুষ তাও থাকতে দেবে না। কিছু লোভী লোক জাল দিয়ে এগুলো ধরে জবাই করে খাচ্ছে। কালো তিতিরের ডিম ভেজে খেয়ে ফেলছে। বনবিড়াল পাখির ডিম খাবার জন্যে পাখি বাসায় হামলা চালায়। পাখি ডিম খাবার জন্য মানুষ লোভ চকচকে চোখ নিয়ে জঙ্গলের ভেতরে ঝোপেঝাড়ে, গাছের খোড়লে পাখির ডিম খোঁজে। মানুষ কি নিষ্ঠুর প্রকৃতির।

এ রকম ভয়াবহ অবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে।

পিকুর বুকের ভেতরটায় তখন রিনরিন করতে থাকে কষ্ট যন্ত্রণার এক নীল অনুভূতি। কাঁকনপুরের বব চুলের কিশোরী টুমপা সরল চোখ মেলে

বলতো, জানো পিকু, পাখিদের ডিম ভেঙে গেলে আমার যে কী রকম দারুণ কষ্ট হয়। ডিমের কুসুম পড়ে থাকে মাটিতে। ওই থলথলে পদার্থের দিকে তাকিয়ে ভাবি, একটা পাখির ছানা আকার দিতে পারতো সেখান থেকে। এসব কথা শুনে পিকুর চোখ তখন ছলছল করতো।

সেই টুমপা ক্যানসারে ভুগে একদিন হুট করে মরে গেল।

: বুঝলি বান্টি, কালকেই 'পাখি দেখার ক্লাব'র সভা ডাক। ক্যাম্প করতে শিগগিরই যাবো তেলিয়াপাড়াতে।

বান্টি আর পিকু দেখে ওই মঙ্গোলিয়ান ধাঁচের অদ্ভুত চেহারার লোকটি দ্রুতগতিতে নেমে গিয়ে রাস্তার ওপাশে ট্যাক্সি ষ্ট্যান্ডে দাঁড়ানো একটি হলুদ ক্যাব-এ উঠে পড়ে। পিকুর সিক্সথ সেন্স প্রবলভাবে কাজ করছে। কি মনে হওয়াতে সে হলুদ ক্যাব-এর নাম্বারটা টুকে রাখে।

তিলাকির ডেরায়

কাকের ডানার মতো সন্ধ্যের অন্ধকার চারপাশ ঘিরে রেখেছে। বান্টি থাকে উত্তরা। কাল বিকেলে 'পাখি দেখার ক্লাব'র বাকি তিন জন সদস্য মিশন, ইফতি আর বুলুকে পিকুদের বাসায় উপস্থিত করাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে যায়। প্রাইম বাসে করে যাবে। পিকু নিজেই গাড়ি চালাতে থাকে। এলিফ্যান্ট রোডের মোড়ের কাছে যানজট। রাস্তার একপাশে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে শীতের পাখি বিক্রি করছে। এ সময় দেখা যায় পাখি বিক্রেতা লোকগুলোকে। পাখিগুলো মাথা ঝুলে আছে নিচ দিকে। কেউ পাখিদের উঁচু করে ধরে আছে। কেউ দড়িবাঁধা পাখিগুলোকে ঝোলাচ্ছে। কেউ হাঁস, হাঁস বলে চিৎকার করছে। রাস্তার আলোতে চকচকিয়ে উঠছে কোনো কোনো পাখির নীলাভ শরীর। পিকুর গাড়িটা জ্যামে পড়ে থামতেই এক পাখি বিক্রেতা যুবক তার দিকে দৌড়ে আসে। যুবকটি জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়। হাতে ধরা পাখিগুলো ধরে ঝোলাতে থাকে পিকুর কাচের সামনে। নিয়ন আলোতে রাস্তাঘাট ঝলকাচ্ছে।

পিকুর একেবারে চোখের সামনে পাখিগুলো। বিক্রেতার গালে লাল জড়ুল।

: নেন স্যার। একেবারে তেলতেলে পাখি।

পাখিগুলোকে দেখে দারুণভাবে চমকে ওঠে পিকু। একি দেখছে সে! বিক্রেতার হাতে ঝুলছে সেই কালো তিতির। শেখ ফরিদ পাখি। একটু আগে যাদের রঙিন স্লাইড দেখিয়েছেন ড. রেজা খান। দুঃখভরা কণ্ঠে বলেছেন বিরল প্রজাতির এই পাখিগুলোকে কিভাবে জবাই করে ফেলা হচ্ছে। আশ্চর্য, এই লোকটার হাতে এসব দুর্লভ পাখি এলো কি করে? ড. খান অবশ্য জানিয়েছিলেন, তেলিয়াপাড়ার কিছু লোক জাল দিয়ে এসব পাখি ধরছে। তাদের হয়তো এখানে সাপ্লাই দিয়েছে। যুবকটি কেমন ফিসফিস করে বলে,

: নেবেন স্যার? এসব পাখি কিন্তু সহজে পাওয়া যায় না। অন্য কারো কাছে পাবেন না।

চট করে কি যেন ভেবে নেয় পিকু।

: কতো দাম?

: জোড়া পাঁচশ।

: ক জোড়া আছে?

: দু জোড়া। এক হাজার টাকা।

: আটশতে দেবে?

: এক দাম নয়শ।

: ঠিক আছে। আমার কাছে এখন এতো টাকা সাথে নেই। কাছেই আমার বাসা। তুমি চল আমার সাথে। টাকাটা দিয়ে দেবো।

বিক্রেতা রাজি হয়। সে ভাবতেই পারেনি এতো সহজেই এ দামে পাখিগুলোকে বিক্রি করতে পারবে। গাড়ির দরোজা খুলে দেয় পিকু। পেছনের সিটে উঠে বসে যুবকটি।

: আপনি স্যার পাখি চেনেন। সহজে এসব পাখি পাওয়া যায় না। খেতে খুব টেস্ট হবে স্যার।

: না স্যার,

: তবে যে বললে খুব টেস্ট।

: ও আমরা পাখি দেখলেই বুঝতে পারি। খেতে হয় না। আমরা স্যার গরিব মানুষ। এসব পাখি খাওয়া কি আর আমাদের ভাগ্যে আছে।

পিকু গাড়ি চালিয়ে সোজা ধানমন্ডি থানায় চলে আসে। যুবকটি কেমন ঘাবড়ে যায়। পিকু যুবকের কলার চেপে ধরে গাড়ি থেকে নামায়। কয়েকজন লোক ছুটে আসে ছিনতাইকারী নাকি। ততক্ষণে ভীষণ ভয়

পেয়ে গেছে যুবকটি। এ আবার কোন ঝামেলা শুরু হলো। পিকু লোকটিকে টেনে নিয়ে গিয়ে সোজা ওসি সাহেবের কামরায় ঢোকে।

: ওসি সাহেব, এই লোকটি বেআইনিভাবে বন্যপ্রাণী বিক্রি করছে।

ওসি তখনো বুঝতে পারছেন না ঠিক কী করবেন।

পিকু বুঝতে পারলো বন্যপ্রাণী আইন সম্পর্কে ওসিকে বলে কোনো লাভ হবে না।

পিকু ওসির টেবিল থেকে ওর বড় খালু সাউথের ডিআইজি-কে ফোন করে সব খুলে বলে। জানায়, লোকটি দুর্লভ পাখি বিক্রি করছে। দুস্প্রাপ্য পাখি চোরাচালানের দল এখন এ অঞ্চলটিকে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করছে।

লোকটিকে আটকালে হয়তো গ্যাংটার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

পিকুর বড় খালু বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। তার কাছে এ ধরনের কিছু খবর ছিল। পরিবেশ আইন সমিতি থেকে কয়েক দিন আগে তাকে এ সম্পর্কে পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করা হয়েছিল। পিকুর একরোখা স্বভাব সম্পর্কেও জানেন তিনি। দুর্লভ প্রজাতির পাখি ধরা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। এ সম্পর্কে তাদের কাছে সার্কুলার রয়েছে। তিনি ওসিকে নির্দেশ দিলেন পাখি বিক্রেতাকে গ্রেফতার করার জন্য।

স্বয়ং ডিআইজির কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে তখন রীতিমতো তৎপর হয়ে উঠে ওসি। পিকুর দিকে তাকিয়ে বলে,

: আপনি দেশের সাংঘাতিক একটা উপকার করেছেন। এভাবে রাস্তাঘাটে দুর্লভ পাখি বিক্রি করছে। আজই সবক'টাকে ধরে আনবো।

বিক্রেতার পেটে রুল দিয়ে গুতো মেরে হুংকার ছাড়েন।

: জানিস, তুই কতো বড় ক্রাইম করেছিস? তোকে এখন সোজা চৌদ্দ শিকেয় ঢোকাবো।

আমার এরিয়াতে এ রকম ডেঞ্জারাস অপরাধ।

যুবকটি তখন ওসির পায়ের কাছে বসে পড়ে।

: আমাকে মারবেন না স্যার। আমি কি পাখিগুলো ধরেছি নাকি?

: তবে কে ধরেছে?

: আমি পেয়েছি তিলাকির কাছে থেকে। সেই তো সাপ্লাই দেয়।

পিকু বুঝতে পারলো এবার হয়তো গ্যাংটির কোনো সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। ওসিকে বলে,

: তিলাকিকে এখুনি ধরার চেষ্টা করুন।

ওসি বুঝতে পেরেছে ডিআইজির আত্মীয় এই তরুণের কথা না শুনলে ঝামেলা হতে পারে। এই সন্ধ্যেবেলায় দু জোড়া ছোট আকারের কালো পাখি যে তাকে এমন একটা ঝামেলায় ফেলে দেবে তা তিনি ভাবতে পারেন নি। থানার অন্যরাও অবাক হয়। পাখি বিক্রির জন্য গ্রেফতার হওয়ার ঘটনা এখানে আর হয়নি। ওসি যুবকের চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতে থাকে।

: কোথায় থাকে তোমার তিলাকি?

: কাটাবন বস্তিতে।

: তার ঘাঁটি চেন?

চিনি স্যার। ওখান থেকেই তো আমরা পাখি পাই।

: চলো আমাদের সাথে। কোনো চালাকি করলে কিন্তু ছাতু বানিয়ে দেব।

সে রাতেই পিকু পুলিশ নিয়ে কাঁটাবন বস্তিতে যায়। ঝুপড়ির ভেতরেই ছিল তিলাকি। গ্রেফতার করা হয় তাকে। ঝুপড়ির ভেতরে পাওয়া যায় কয়েক খাঁচা ভর্তি বিচিত্র ধরনের পাখি। এই পাখির নাম উঠেছে লাল তালিকায়। পুলিশের জেরার মুখে তিলাকি জানায় 'শেখ ফরিদ' পাখিগুলো সে তেলিয়াপাড়া থেকে এনেছে। ঝুপড়ির কোণার দিকে তাকায় পিকু। জায়গাটা কেমন খাপছাড়াভাবে উঁচু হয়ে আছে। একটা কাঠের খাঁচার ভেতরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে একটা প্রাণী। নাকে বোটকা গন্ধ এসে লাগে। টর্চের আলো ফেলতেই দেখে একটা বাঘের বাচ্চা পড়ে আছে। প্রাণীটাকে ইনজেকশন দিয়ে অজ্ঞান করে রাখা হয়েছে। আজ রাতেই হয়তো এটাকে পাচার করে দেয়া হতো। বন্যপ্রাণী চোরাচালানের তালিকায় রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মূল্য সবচাইতে বেশি। এই প্রাণী ধরা মারাত্মক অপরাধ। তিলাকির ভাবলেশহীন চেহারা। পেছনে আরো দুটো খাঁচা রয়েছে। টর্চের আলোতে খাঁচার আটকানো প্রাণীগুলোকে চিনতে পারলো পিকু। মনিপুরের দুষ্প্রাপ্য নাচুনে হরিণ। ওদেরকেও অজ্ঞান করে রাখা হয়েছে। পিকু বুঝতে পারলো তিলাকি ভয়ঙ্কর শ্রেণীর অপরাধী। হাতকড়া পরা অবস্থায় তিলাকিকে তোলা হয় পিকআপ ভ্যানের পেছনে। এদের এখন নিয়ে যেতে হবে মিরপুর চিড়িয়াখানার হাসপাতালে।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত বারোটা বেজে যায় পিকুর। বেশ বড় একটা ধকল গেল আজ। বাসায় এসে শোনে বান্টিদের বাড়ি থেকে বেশ কয়েকবার ফোন এসেছে। বান্টির বাবা তাকে খুঁজছে। বান্টিদের বাসায় তখনি ফোন করে পিকু। বান্টির বাবা ধরেন।

: আঙ্কেল, আমাকে খোঁজ করছিলেন?

বান্টির বাবার উদ্বিগ্ন কণ্ঠ শোনা যায়।

: পিকু, বান্টি কি তোমার সাথে এখন রয়েছে?

: নাতো আঙ্কেল। বান্টি তো সেই কখন বাসে করে বাড়ি চলে গেল। সে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা আগের কথা।

: তাই নাকি! বান্টি যে এখনো বাসায় ফেরেনি।

: বলেন কি!

বান্টির বাবার গলা কেঁপে ওঠে।

: কোনো এ্যাকসিডেন্ট হলো নাতো আবার?

: আমি অন্য বন্ধুদের বাসায় খোঁজ নিচ্ছি। আপনি হাসপাতালে খোঁজ নিন।

আমি কিছুক্ষণের মধ্যে আসছি।

পিকুর বাবা ঘরে এসে ঢোকেন।

: কি হয়েছি পিকু? কোন দুঃসংবাদ।

: বাপি, বান্টি এখনো বাসায় ফেরে নি।

: তুমিও তো এইমাত্র এলে। বান্টি থাকে উত্তরায়। যেতে সময় লাগবে না।

: বান্টি বাড়ি রওয়ানা হয়েছিল পাঁচ ঘণ্টা আগে। একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার জন্য আমার আজ আসতে দেরি হয়েছে।

পিকু তার কমপিউটার চেক করে। টুনু মামার পাঠানো ই-মেইল দেখে খুশি হয়। তার পাঠানো শীতের পাখিদের ছবির মধ্যে একটি ছিল বিরল প্রজাতির সাইবেরিয়ান সারস। সমস্ত পৃথিবীতে এ ধরনের পাখি এখন মাত্র কয়েকটি টিকে আছে। তার তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে পাখিটির ছবি পিকু তুলেছিল তেঁতুলিয়ার মহানন্দা নদীর কাছে। তাদের সংস্থার কর্মকর্তারা অনুরোধ করেছে পিকু যেন এ বছর আবার সেখানে গিয়ে দেখে সাইবেরিয়ান সারসেরা ফিরে এসেছে কিনা। এই সারসদের ভ্রমণ

পথে জানতে তারা আগ্রহী। ভারতের রাজস্থানের ভরতপুর কেঁওলাদেও পাখিরালয়ে এরা নিয়মিতভাবে আসে।

পিকুর এই কৃতিত্বের জন্য সংস্থা তাকে পুরস্কৃত করতে চায়। জুনিয়র ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফি টিভি চ্যানেলের একজন প্রতিনিধি হিসেবে তাকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। ওই চ্যানেলের দিল্লি প্রতিনিধি বিশ্ববিখ্যাত প্রামাণ্য চিত্র নির্মাতা রঘু রায় তার সাথে শিগগিরই যোগাযোগ করবে।

টুনু মামার ই-মেইলটি পেয়ে পিকু রোমাঞ্চিত হয়। একটা ভালো লাগার অনুভূতি ছড়িয়ে যায় তার মাঝে। আবার ফোন আসে বান্টিদের বাড়ি থেকে। কোন হাসপাতাল থেকে বান্টির খোঁজ পাওয়া যায় নি।

রাত একটা বেজে গেছে। পিকুর বাবা গম্ভীর মুখে বসে আছেন।

: বান্টির কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। তাহলে।

: আশ্চর্য লাগছে আমার কাছে। বান্টি কখনো এতো রাত পর্যন্ত বাইরে থাকে না।

: তুমি কিন্তু আবার এতো রাতে বেরিয়ো না। যা করার কাল সকালে করো।

লাইট নিভিয়ে দেয় পিকু। বারান্দায় ঝোলানো অর্কিডের ঝাড় ঢেকে যায় অন্ধকারে। ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায় পিকু। শুনশান করছে চারপাশ। বান্টির জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে। হঠাৎ করে তার বিকেলে দেখা সেই অদ্ভুত চেহারার লোকটার কথা মনে হয়। যার মুখ মঙ্গোলিয়ান ধাঁচের। তার বক্তব্য ধারণ করেছে ভিডিওতে। লোকটির চাউনি ছিল অস্বাভাবিক। আবার ফোন বেজে ওঠে। এতো রাতে কেন ফোন করলো। পিকুর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হয়। তার কাছে মনে হলো এ ফোনের মাঝে হয়তো কোনো রহস্যের ইঙ্গিত থাকবে। ফোনটি স্বাভাবিক হবে না। ফোন তোলে পিকু।

: হ্যালো কে?

ওপাশ থেকে একটা ভরাট গলা শোনা যায়।

: তুমি নিশ্চয়ই পিকু।

: জ্বি, আপনি কে বলছেন?

: মনে করো আমি তোমার একজন বন্ধু। শুভাকাঙ্ক্ষী।

: বন্ধু...মানে?

: ধরো আমি তোমার পাখিবন্ধু। কারণ পাখিদের নিয়েই হচ্ছে আমার কাজ। আমি জানি তুমি রেয়ার বার্ডসদের ছবি তোল। এদেশের অনেক বনের পাখিদের ছবি তুলেছো তুমি।

: আপনি কি করে এসব জানেন?

: জানতেই হয়। আমি তোমার অনেক খবর জানি। এও জানি তোমার বন্ধু বান্টি এখনও পর্যন্ত বাড়ি ফিরে যায়নি।

: মানে!

: মানে যেতে পারেনি। কারণ তাকে আমার লোক আটকে রেখেছে।

পিকুর চিন্তাশক্তি সজাগ হয়ে ওঠে। মারাত্মক কোনো ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হলেই তার চিন্তা করার ক্ষমতা একটা ধারাবাহিক পথ ধরে এগুতে থাকে। পরপর ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর ভেতর থেকে নিজস্ব আশ্চর্য এক ক্ষমতায় যোগসূত্র খুঁজে বের করে ফেলতে পারে। আজকের বিকেলের পর থেকে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো ছায়াছবির মতো তার সামনে ভেসে ওঠে। সে বেশ বুঝতে পারে, বান্টির অপহরণকারী লোকটির সাথে আজ বিকেলে দেখা সেই মঙ্গোলিয়ান চেহারার অদ্ভুত লোকটির কোনো সম্পর্ক রয়েছে।

পিকু শান্ত গলায় বলে,

: বান্টিকে যে অপহরণ করেছি তাকে কিন্তু আমি চিনতে পেরেছি।

ওপাশের কণ্ঠস্বরে অবাক হওয়ার স্পর্শ।

: কি রকম!

: অপহরণকারী সেই লোক যে আজ বিকেলে ভিডিওতে আমাদের ছবি তুলেছে। তার পরনে সবুজ জামা। কমলা রঙের টাই। জামায় লেখা রয়েছে 'পাণ্ডাদের রক্ষা করুন।' ওই লোকের সাহায্যে আপনি কিডন্যাপ করিয়েছেন।

: বুদ্ধিমান ছেলে। আমি জানি তুমি খুব সার্প। তবে এতোটা সার্প সেটা ধারণা ছিল না।

: বান্টিকে আপনি আটকে রেখেছেন কেন?

: তোমার কাছ থেকে একটা জিনিস আদায় করার জন্য।

: কি জিনিস?

: তোমার তোলা দুর্লভ পাখিদের ছবি আর তথ্য নিয়ে তৈরি সিডিটি আমার প্রয়োজন।

: কি করবেন তা দিয়ে?

: সিডিটি হাতে পেলে তারপর জানাবো। আমার চমৎকার একটা পরিকল্পনা সবার জন্য সেটা হবে একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

: সিডিটি পেলে আপনি বান্টিকে ছেড়ে দেবেন?

: অবশ্যই। আমি এক কথার মানুষ। আমার কথা কোনোরকম নড়চড় হয় না।

: কিভাবে সিডিটি আপনার কাছে পৌছাবো?

: আজ ভোর ঠিক ছটার সময় বোটানিকাল গার্ডেনের টং ঘরের সামনে গেলে এক বোরকা পরা মহিলাকে দেখবে। তার সামনে রাখা প্লাস্টিকের লাল পাত্রে সিডিটি রেখে আসবে। এর ঠিক আধ ঘণ্টা পর তোমার বন্ধু বান্টিকে পাবে ঝাউ বাগানের লোহার বেঞ্চিতে। আমার নির্দেশ মতো ঠিকঠাক কাজ করলে কোনো অসুবিধে হবে না। তবে কোনো রকমের চালাকি করার চেষ্টা করছো কি ভয়ঙ্কর বিপদ ডেকে আনলে। তোমার ডিআইজি খালুকে জানিয়েও কোনো লাভ হবে না।

: সিডি পাওয়ার জন্য আমাকে ধরলেই তো হতো। বান্টিকে কেন?

: টার্গেট তুমিই ছিলে। কিন্তু ঝামেলা তো তৈরি করলে তুমি। তিলাকিকে এরেস্ট করালে। পুলিশের সাথে রইলে অনেকক্ষণ। তার পরিকল্পনা বদলে তোমার পরিবর্তে বান্টিকে কিডন্যাপ করলাম।

পিকু বুঝলো বান্টিকে আটকে রেখে তার উপর এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। ভয়ানক ধূর্ত এই লোকটি। তিলাকি সম্পর্কে জানে। তিলাকির সাথে হয়তো কোনো যোগাযোগ আছে। এর ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কভাবে এগোতে হবে।

: ঠিক আছে। আমি সিডিটি আপনাকে পৌছে দেবো। ঠিক ভোর ছটায় আমি যাবো বোটানিকাল গার্ডেনে। আশা করি আপনিও কথা রাখবেন।

: যথা সময়ে তার প্রমাণ পেয়ে যাবে। তুমি তো আবার এ্যাডভেঞ্চার প্রিয় ছেলে। এ ব্যাপারটিকে আবার কোনো এ্যাডভেঞ্চার মনে করে যেন অগ্রসর হয়ো না। তাহলে পরিণাম হবে মারাত্মক। বান্টিকে জীবিত অবস্থায় ফিরে পাবে না। শুভ রাত্রি।

লোকটি ফোন রেখে দেয়।

হারিয়ে যাওয়া পাখি

রাত ক্রমশ গভীর হচ্ছে। দূরে কুকুরের ডাক শোনা যায়। নৈশ প্রহরী ডেকে গেল রাস্তা দিয়ে।

ঘুম আসছে না পিকুর। রহস্যের এক জালে সে ধীরে ধীরে জড়িয়ে যাচ্ছে। ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে খুব দ্রুতগতিতে। বোঝা গেল, ভয়ঙ্কর স্বভাবের এক লোক তাদের অনুসরণ করেছে। চাইছে তার তোলা দুর্লভ পাখির ছবির সিডি। নিজেকে আবার পরিচয় দিচ্ছে পাখিবন্ধু হিসেবে। আসলে কি উদ্দেশ্য লোকটির?

টুনু মামার পাঠানো ই-মেইলের কপি টেবিলের উপর। জাপানের আইউসিএন সংস্থা তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে সাইবেরিয়ান সারসের ছবি তুলে পাঠানোর জন্য। জুনিয়ার ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফি টিভি চ্যানেলের প্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছে। দিল্লি থেকে এ বিষয়ে বিখ্যাত রঘু রায় শিগগিরই তার সাথে যোগাযোগ করবেন।

দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকায় পিকু। রাত তিনটে। বোঝা যাচ্ছে আজ রাতে আর ঘুম আসবে না। ভোর ছটায় সিডি নিয়ে যেতে হবে বোটানিকাল উদ্যানে। কেন তার কাছ থেকে এই সিডিটি নিতে চাইছে? ড্রয়ার খুলে সিডিটি বের করে কমপিউটারের সিডি প্লেয়ারে ঢুকিয়ে দেয়। লাওয়াছড়া, লংলা, সাতছড়ি, চুনতির বানর জাতীয় প্রাণীদের ছবি। সেখানকার গভীর জঙ্গলে হঠাৎ করে দেখতে পেয়েছিল ওই ধরনের বহু বর্ণের বানর। এর আগে কখনো এ ধরনের বানর দেখেনি সে।

এতো উত্তেজনার মাঝেও টুনু মামার ই-মেইলটি তাকে বেশ উৎফুল্ল করে তোলে। তার কাজের স্বীকৃতি দিয়েছে আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংস্থা। পিকু কৃতজ্ঞ জাপানি সংস্থাটির কাছে। কমপিউটার অন করে ইন্টারনেটে ব্রাউজিং করে পিকু জাপানি আইইউসিএন ওয়েবসাইটে ঢুকলো। সাইবেরিয়ান সারস সম্পর্কে যদি কোনো তথ্য পাওয়া যায়। মনিটরে ফুটে ওঠে নানা তথ্য।

ওয়েবটির শিরোনাম : পাখি পর্যবেক্ষণ, সহৃদয় মানুষের স্নিগ্ধ শখ। ইয়ুমিকো সংস্থার একজন কর্মী। ইংল্যান্ড ভ্রমণের সময় দেখেছে পাখি পর্যবেক্ষকদের। তার মন্তব্য, আমাকে তারা ভীষণ আকর্ষণ করেছিল। তাদের পাখি পর্যবেক্ষণের শখ একই সাথে আমার কাছে যেমন নতুন তেমনি মুগ্ধকর মনে হয়েছিল।

১৯৩৪ সালে প্রকৃতিবিদ গোদো নাকানিশি তৈরি করেন আশাহি পাখি পর্যবেক্ষণ সমিতি। পৃথিবীর ৮,৬০০ রকমের ভিন্ন প্রজাতির পাখির মাঝে প্রতিটির শতকরা ৬টি পাখি জন্ম জাপানে অথবা জাপান থেকে তারা দেশান্তরিত। জাপানে বাসা বাঁধা প্রজাতির সংখ্যা ২৫৭। যাদের মধ্যে ১০

প্রজাতির পাখিকে পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যাবে না। জাপানের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশ হচ্ছে পাখিদের স্বর্গ। অন্য দেশের সারস, সাইবেরিয়ান সারসের দল এবং উত্তর এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া থেকে নানা পাখি এসে জাপানের হনশুর পাহাড়ি অঞ্চল,হ্রদে এসে আশ্রয় নেয়। বিশ্রাম করে। হোক্কাইডোর জলাশয় ভরা এলাকাগুলোতে আসে পাখির দল। আসে শিকোকু এবং কায়াশুতে। হনশুর মনোরম হ্রদ, পাহাড়বেষ্টিত অঞ্চল, গাছপালাপূর্ণ জায়গা এ সমস্ত পাখিদের বিশ্রাম ও বাসা বাঁধার জায়গা। কোকাইনের মন্তব্য, সারা সপ্তাহের ক্লান্তি দূর হয়ে যায় যখন সপ্তাহের শেষে পাখি পর্যবেক্ষণ করতে আসি। প্রশ্ন ছিল, কিসের জন্য পাখি পর্যবেক্ষণের এই কাজে ছড়িয়ে পড়া। কেউ কেউ শুধুই অদ্ভুত শখের জন্য। কিন্তু বেশিরভাগেই আশা করেন নতুন পাখি আবিষ্কারের, যাতে তাদের নাম বেঁচে থাকে অয়দূব সোসাইটির নথিপত্র অথবা আন্তর্জাতিক কোনো প্রকৃতি সংক্রান্ত সংস্থার ইতিহাসের পাতায়।

জাপানের শহুরের বহু লোকের এই বিশ্বাস রয়েছে যে, একজনের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য এবং প্রকৃতির স্বাস্থ্য পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

এই সংস্থা পৃথিবীব্যাপী পাখি গণনায় সাহায্য করছে। যে সব দেশান্তরিত প্রজাতির পাখিরা জাপানে বাসা বেঁধেছে তাদের ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ করবে।

মূল কাজ হবে পাখিদের সম্বন্ধে এবং প্রকৃতিতে তাদের ভূমিকার ব্যাপারে আরো মানুষকে সতর্ক করা।

দেয়াল ঘড়ির টিক টিক শব্দ শোনা যাচ্ছে। রাত তিনটা পঁচিশ । বাকি রাতটা বন্যপ্রাণী বিষয়ক ওয়েবসাইট দেখে কাটিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় পিকু। ভোর সাড়ে পাঁচটায় তার সিডিটি নিয়ে বেরুবে।

ড. রেজা খান জানিয়েছিলেন বাংলাদেশের দুর্লভ কালো তিতির প্রজাতির বেশ কিছু পাখি এখনো টিকে আছে মনিপুরের কেইবুন নামজাও জাতীয় উদ্যানে। সেখানে শিগগিরই যাবার পরিকল্পনা রয়েছে তার ।

ভারতের দুর্লভ পাখিদের ওয়েবসাইটে পিকু চোখ রাখে। সে দেশের সবচাইতে দুস্প্রাপ্য পাখিগুলো হলো:

১. পাহাড়ি বটের। লম্বায় ১০ ইঞ্চি। একে শেষ দেখা গেছে ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে নৈনিতালের কাছে। এদের দেখতে পাওয়া যেত ঘাসের জঙ্গলে। ৫-৬টির দলে থাকতো। মানুষ যখন ওদের কাছাকাছি যেত তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু উড়ে গিয়ে ঘাসের বনে আবার লুকাতো। এই প্রজাতি

পাখিদের মাত্র ২০টিকে দেখা যায় পৃথিবীর বিভিন্ন যাদুঘরে। প্রবাল লাল ঠোঁট ছিল ওদের বিশেষত্ব।

২. নুকরি। লম্বায় ১০ ইঞ্চি। ১৯০০ সালে গোদাবরি উপত্যকাতে এদের শেষ দেখা দেখা গেছে।

৩. শাকনাল। গোলাপি শির। লম্বায় ২৪ ইঞ্চি। শেষ দেখা গেছে বিহারে দ্বারভাঙ্গা জেলাতে ১৯৩৫ সালের জুন মাসে। ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কোলকাতার পাখির বাজারে পাওয়া যেত। বাসস্থান ছিল হিমালয়ের তরাই অঞ্চল ও মনিপুর।

ওয়েবসাইটে চোখ রেখে পিকু এতক্ষণ ঘুরে বেড়িয়েছে পাখিদের বিচিত্র ভুবনে। ভোর হয়ে আসছে। খানিকপরেই যেতে হবে মিরপুর বোটানিকাল উদ্যানে। রহস্যময় পাখি বন্ধুর কাছে পৌছে দিতে হবে তার তোলা পাখিদের সিডি। কি করবে লোকটা ওই সিডি দিয়ে।

টুনু মামার দেয়া কাজটা এখনো শেষ হয়নি। বাংলাদেশের শীতের অতিথি পাখিদের আরো ছবি তুলতে হবে। মিরপুরের লেকে গিয়ে তুলতে হবে রাজমনি হাঁসদের ছবি।

ড. রেজা খান জানিয়েছিলেন কোলকাতার 'পাখি সংসদ' থেকে এ ধরনের পাখির শুমারি করা হয়েছে। সম্প্রতি তারাও একটি ওয়েব খুলেছে। ব্রাউজিং করে সেই ওয়েব খুঁজে নেয় পিকু ভোর হওয়া পর্যন্ত এভাবে সময় কাটাতে চায় ওয়েব থেকে এ সংক্রান্ত তথ্য জেনে। কোলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানার লেক, লবণ হ্রদের নলবন আর সাঁতরাগাছি পাখিরালয়ে শীত পড়লেই ভিড় করে পরিযায়ী পাখিরা।

ডিসেম্বরের শুরু থেকেই চিড়িয়াখানার জলায় হাঁসেরা আসতে শুরু করে। এর শতকরা ৯৫ ভাগই হচ্ছে সরাল। আসে অল্পসংখ্যক নাকতা আর বড় দিঘর। গত শীতে সেখানে ৪ হাজার পাখি এসেছিল। এর মধ্যে বড় সরালও ছিল। লবণ হ্রদের নলবনে আড়াই হাজারেরও বেশি খুন্তে হাঁস এসেছিল। প্রকৃতি সংসদের সদস্যরা সেখানে একজোড়া নীলশিরে খোঁজ পেয়েছিল। শহরটি সবুজ হওয়ার সাথে সাথেই ফিরে এসেছে শহরের বুক থেকে হারিয়ে যাওয়া পাখিরা।

আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে সাঁতরাগাছি পাখিরালয়ের দূরত্ব ৮ থেকে ১০ কি.মি.। বিশাল ঝিল। ঝিলের অনেকটা স্থান জুড়ে রয়েছে বড় বড় গাছ। যেগুলো হলো শীতের অতিথি। পরিযায়ী পাখিদের থাকার মতো উপযুক্ত পরিবেশ।

সাইবেরিয়া আর তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে এখানে যেসব পাখিরা আসে তার তালিকা হলো: সরা, বড় দিঘর, নীলশির, গিরিয়া, হাঁস, খুঁন্তে হাঁস, নাকতা, বালি হাঁস। এসব পরিযায়ী পাখিরা খায় উদ্ভিদের কচিপাতা, শস্যদানা। ছোট মাছ, শামুক, ঝিনুক। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে দলবেঁধে এরা চলে আসে পাখিরালয়ে। সন্ধ্যে হওয়ার আগেই ওরা ফিরে যায় আশেপাশের গ্রামে। বড় বড় গাছে আশ্রয় নেয়।

ফিরে এলো বান্টি

ভোর হয়ে আসছে। আকাশের রং হয়ে যাচ্ছে কচি লেবু পাতার মতো। ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা। পিকু সিডিটি নিয়ে ঘর থেকে বের হয়। ফ্লাটবাড়ির দারোয়ান পিকুকে এতো ভোরে বেরুতে দেখে একটু অবাক হয়। রাস্তায় তেমন লোকজন নেই। কয়েকজন প্রাতঃভ্রমণকারী দ্রুতগতিতে হেঁটে যাচ্ছে। কেউ কেউ জগিং করছে। বোটানিকাল উদ্যানেও যাচ্ছে কয়েকজন। রাস্তায় ইরতিজা চৌধুরী সাহেবের সাথে দেখা। ওদের ফ্লাটবাড়ির তিন তলার বাসিন্দা। সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার। মাথায় ক্যাপ। জগিং করছিলেন। পিকুকে দেখে থামলেন।

: এই যে পিকু, তোমাকে এখন থেকে যেন রোজ জগিং করতে দেখি। জগিং না করলে স্বাস্থ্য একদম ঠিক থাকবে না। আজকালকার ছেলেরা কি অলস হয়ে যাচ্ছে নাকি?

: জ্বি।

: তুমি না সেদিন বলেছিলে, আমাকে তোমার তোলা রেসাস বানরের ছবি দেবে। আমাদের বুলেটিনের আগামী সংখ্যায় ছাপতে চাই।

পিকু জানে ইরতিজা চৌধুরী একটি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ক্লাবের উপদেষ্টা।

পিকুও ইরতিজা চৌধুরীর হাঁটার সাথে সাথে তাল মিলিয়ে চলছে।

: তুমি যেন ছবিটা কোথায় তুলেছিলে?

: কুলাউড়ার শাকেরা চা বাগানে।

: রেসাস হচ্ছে লজ্জাবতী বানর। রেয়ার প্রাণী। আমাদের দেশে হয়তো কয়েকটা আছে।

বন্যপ্রাণী বিষয়ে ইরতিজা চৌধুরীর প্রচণ্ড উৎসাহ সম্পর্কে পিকু জানে। বাংলাদেশের বানর প্রজাতি সম্পর্কে বিদেশি জার্নালে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন। নাফ নদীর তীরের কাঁকড়াখেকো বানর সম্পর্কে লিখেছেন। তাকে একবার বলেছিলেন প্রকৃতিবিজ্ঞানী গোলাপচন্দ্র ভট্টাচার্যের কথা। তার বিশেষ ঝোক বানর প্রজাতি সম্পর্কে। পিকুর হঠাৎ মনে হলো তার সিডিতে পাখির সাথে বহু বর্ণের কয়েকটি বানরের ছবিও রয়েছে। সিডির আরেকটি কপি রয়েছে তার কাছে। ওই বানরের ছবিগুলো আজই দেখাবে চৌধুরী সাহেবকে।

: আঙ্কেল, আজ বিকেলে আমি আপনাকে নতুন ধরনের বানরের ছবি দেখাবো।

: ওকে বয়, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

ইরতিজা চৌধুরী চলার গতি বাড়িয়ে ডান দিকে চলে গেলেন। ঘড়ি দেখে পিকু। ছটা বাজতে তখনো মিনিট দশেক বাকি। বোটানিকাল উদ্যানে ঢোকে। দূরে টং ঘরটা দেখা যাচ্ছে। চারপাশের গাছপালা থেকে ভেসে আসছে পাখিদের কিচির মিচির ডাক। পাতাকাঁপানো বাতাস বইছে। একঝাঁক সরাল উড়ে গেল একজন বয়স্ক লোক বাইনোকুলার দিয়ে সামনের বড় গাছটায় দিকে তাকিয়ে আছেন। পিকু ভাবলো, লোকটা আবার পাখিবন্ধুর এজেন্ট নয় তো। পাখি দেখার ভান করে আসলে হয়তো তাকেই দেখছে।

টং ঘরের সামনে দেখে ঠিকই বোরকা পরা এক মহিলা বসে রয়েছে। সামনে প্লাস্টিকের লাল পাত্র। পিকু সেখানে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে সিডিটি বের করে পাত্রে রেখে দেয়। বোরকা পরা মহিলা কিছু বলে না। সিডি রেখে পিকু ওখান থেকে সরে যায়। রহস্যময়' লোকটির কথামতো আধ ঘণ্টা পর যাবে ঝাউবনে। পিকুর মনে হচ্ছে ওর সমস্ত গতিবিধি ঝোপের আড়াল থেকে কেউ যেন লক্ষ করছে। লোকটি তাকে শাসিয়েছিল, কোনো ধরনের চালাকির আশ্রয় না নেয়ার জন্য। অর্থাৎ কোনোভাবেই কাউকে কিছু খবর দেয়া যাবে না।

সাড়ে ছটার সময় ঝাউবনে গিয়ে দেখে একটা লোহার বেঞ্চিতে মূর্ছিতে অবস্থায় পড়ে আছে বান্টি। একটা ছোট ছেলে জানালো কিছুক্ষণ আগে দুজন লোক এসে একে এখানে রেখে গেছে। পিকুকে বাগানের একজন কর্মচারী চেনে। ব্যাপারটা দেখে সে দৌড়ে আসে। বান্টিকে

বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য পিকু তার সাহায্য চায়। ঘটনা দেখে বাগানের আরো কজন কর্মচারী এগিয়ে আসে। একজন বান্টির চোখে মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়।

কেউ কেউ বলাবলি করছি, মাস কয়েক আগে এই ঝাউবনে একটি ছেলের লাশ পাওয়া গিয়েছিল। ছুরির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ছিল লাশটি।

বান্টির জ্ঞান তখনো ফিরে আসেনি। একজন জিজ্ঞেস করে, মেরে ফেলেনি তো?

পিকু বান্টির নাকের কাছে হাত রাখে। নিঃশ্বাস পড়ছে। লোকজনের ভিড় বাড়তে থাকে। পিকুকে জেরা করছে অনেকে। এর মধ্যে মোবাইলে বান্টিদের বাসায় ফোন করে দিয়েছে পিকু।

পাখিবন্ধুর ফাঁদ

বিছানায় চুপচাপ শুয়ে রয়েছে বান্টি। ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়েছেন। জ্ঞান ফিরে এসেছে বান্টির। গত রাতের ঘটনার কোনো কিছুই সে মনে করতে পারছে না। শুধু এটুকু মনে আছে প্রাইম বাস থেকে নেমে বাড়ি ফিরছিল। বাসে পাশের সিটে বসা গলায় লাল মাফলার ঝোলানো লোকটা অহেতুকভাবে তার সাথে গল্প করতে চাইছিল। একবার পকেট থেকে চুইংগাম বের করে চুষতে থাকে। বান্টি আগের ষ্টপেজে নেমে যায় লোকটি। নিরিবিলি সড়ক দিয়ে বাসায় ফিরছিল বান্টি। হঠাৎ একটা মাইক্রো এসে থামে তার পাশে। দুজন লোক ঝট করে বেরিয়ে তার মুখে কাপড় চেপে ধরে। মাথাটা একবার দুলে উঠলো। এরপর আর কিছু মনে নেই বান্টির। ডাক্তার জানিয়েছেন, ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করা হয়েছিল বান্টিকে।

বান্টির বাবা মা খুব ঘাবড়ে গেছেন। তাদের অমন সোজা সরল ছেলের যে কোনো শত্রু থাকতে পারে সেটা তাদের ধারণা ছিল না।

: পিকু, তুমি থাকায় বেশ সাহস পাচ্ছি। যা করলে আমাদের জন্য।

: আর কোনো ভয় নেই খালাম্মা। বান্টির এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। ওকে ছোট মুরগির স্যুপ খেতে দিন। শরীরের উপর মেলা ধকল গেছে। আমি আবার বিকেলের দিকে আসব।

বাসায় ফিরতেই পিকুর ঘরে ফোন বেজে ওঠে। গত রাতের সেই রহস্যময় কণ্ঠস্বর। পাখিবন্ধু।

: অনেক ধন্যবাদ পিকু। তুমি কথা রেখেছ। আমি তোমার সিডিটি পেয়েছি। বান্টিকে নিশ্চয়ই ফেরত পেয়েছো।

: সে জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ।

: আমরা কিন্তু তোমার বন্ধুটির কোনোরকম ক্ষতি করিনি। শুধু অজ্ঞান করে রেখেছিলাম।

: শারীরিক ক্ষতি করেন নি তবে মানসিক ক্ষতি করেছেন।

: বোঝা যাচ্ছে ও তোমার মতো অত শক্ত মানের অধিকারী নয়।

: আপনি বলছিলেন সিডি পাওয়ার পর ওটা আপনার কি প্রয়োজন তা জানাবেন।

: অবশ্যই আমি জানি তুমি অনেকদিন থেকে এদেশের বিভিন্ন বনের আর দ্বীপের পাখিদের ছবি তুলেছো। এর মধ্যে রয়েছে অনেক বিচিত্র ধরনের পাখি। বিরল শ্রেণীর পাখি। যেগুলোর ছবি সহজে কোথাও পাওয়া যায় না। অনেক চেষ্টা করেও পাইনি আমি। অথচ আমার প্রচণ্ড দরকার এসব অচেনা, অজানা বিরল পাখিগুলোর ছবি। যা একমাত্র তোমার কালেকশনে আছে বলে আমার ধারণা।

: কি করবেন আপনি এসব ছবি দিয়ে?

: আমার পরিকল্পনাটি হচ্ছে এই শহরে একটা থ্রি-ডির থিয়েটার হল তৈরি করা। যেখানে হলোগ্রাফি পদ্ধতিতে আমি পাখিদের এক জীবন্ত ভুবন গড়ে তুলব। ভারচুয়াল রিয়ালিটির প্রয়োগে সেই হলে সৃষ্টি করব পাখিদের এক আশ্চর্য জগৎ। আর আমি চাই সেই বিচিত্র পাখিগুলো হবে এ দেশের। এজন্য আমার ছবিগুলোর দরকার ছিল। ওখান থেকে ইমেজ স্ক্যানিং করে বিশেষ এক প্রযুক্তিতে আমি হলোগ্রাফির এক মায়াময় পৃথিবী তৈরি করব। তোমরা সেখানে গিয়ে যেন এক জীবন্ত পাখিদের রাজ্যে চলে যাবে।

এমন ডিজিটাল এফেক্ট থাকবে সেখানে যে মনে হবে পাখিগুলো বুঝি তোমাদের চোখের সামনে ডানা মেলে উড়ছে। এ ধরনের থিয়েটার হল শুধু আছে সিঙ্গাপুরের বিজ্ঞান জাদুঘরে। যার নাম অমনি থিয়েটার।

তোমাকে আবার অনেক ধন্যবাদ পিকু।

ফোন রেখে দেয় পাখিবন্ধু। পিকুর মনে হলো লোকটির কণ্ঠস্বরে কোনো প্রত্যয় ছিল না। থ্রি-ডির থিয়েটার হল বানাবার এক চমৎকার গল্প হয়তো শুনিয়ে দিল। লোকটি এতোক্ষণ সম্ভবত তার সাথে মিথ্যে বলে গেছে। হলোগ্রাফি পদ্ধতিতে পাখির ভুবন বানাবার পরিকল্পনার জন্য এতো রকমের ষড়যন্ত্র করার প্রয়োজন পড়ে না। কি সেই উদ্দেশ্য?

লোকটির বাংলা উচ্চারণও অন্য ধাঁচের। আসাম অঞ্চলের টান রয়েছে। লাওয়াছড়া বাগানের একজন প্রহরী ছিল মনিপুরি। সে এ ধরনের টান মিশিয়ে কথা বলতো।

পাখি বন্ধু কি তাহলে মনিপুরি?

বিরলতম বানর

বান্টির অপহরণের সাথে সেই মঙ্গোলিয়ান চেহারার ভিডিওগ্রাফার লোকটি জড়িত। কি মনে হওয়াতে ডাইরি খোলে পিকু। হলুদ ক্যাবের নম্বটা দেখে নেয়। তাকে এখনি যেতে হবে সেই ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে।

ট্যাক্সি স্টান্ডে গিয়ে ডাইরিতে লেখা নাম্বারের গাড়িটির খোঁজ করে। একজন ক্যাব চালক জানায় ঐ নাম্বারের গাড়ির মালিক হচ্ছে জুবায়ের। এ মুহূর্তে গাড়িটি স্ট্যান্ডে নেই। গাজীপুর গেছে। সন্ধ্যের দিকে আসতে পারে। পিকু তার মোবাইল নাম্বারটি দিয়ে বলে জুবায়ের ফিরে এসে যেন তাকে রিং করে। জরুরি ব্যাপার।

তিন তলার বা দিকের ফ্লাটের কলিং বেল টিপতেই ইরতিজা চৌধুরী দরজা খুলে দিলেন।

: আরে পিকু, এসো এসো।

: আমি আপনার কথা মতো বানরের ছবিগুলো এনেছি আঙ্কেল।

: ফাইন। চলো আমার কমপিউটারে চালিয়ে দেখি।

পিকু ভাবতেই পারেনি সিডিটি চালিয়ে এতোটা চমকে যাবেন ইরতিজা চৌধুরী। গভীর আগ্রহে তিনি তাকিয়ে রয়েছেন মনিটরের দিকে। লাওয়াছড়ার গহীন জঙ্গলে পিকুর তোলা বহু বর্ণ বানরের ছবি। তিনি বিড়বিড় করে বলছেন,

: স্ট্রেঞ্জ! একি সত্যি। এ ধরনের দুষ্প্রাপ্য বানরের ছবি তুমি কোথা থেকে যে তুললে!

পিকুর মনে পড়লো লাওয়াছড়া জঙ্গলের সেদিনের সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা।

: বুঝলেন আঙ্কেল, এমন ঘটনা আমিও আগে দেখিনি। বিচিত্র রকমের বানর! একেক সময় বানরগুলোর রং একেক রকম হয়ে গেল। বহুরূপী বানর মনে হলো।

: আমি যে ভাবতেই পারছি না ব্যাপারটা। তুমি সাংঘাতিক একটা কাজ করেছো। পৃথিবীর সবচাইতে দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির বানরের ছবি

তুলতে পেরেছো। তার মানে এই ধরনের বানর আছে লাওয়াছড়াতে। এ ধরনের একটি মাত্র বানরের সন্ধান পাওয়া গেছে ব্রাজিলের এক দ্বীপে। ভাবতে পারছো ব্যাপারটা। তোমার এই খবর প্রকাশিত হলে পৃথিবীর তাবৎ প্রাণীবিজ্ঞানীদের মাঝে রীতিমতো সাড়া পড়ে যাবে। দাঁড়াও আমি এখনি চেক করছি।

ইরতিজা চৌধুরী বিশ্ব বন্যপ্রাণী সংস্থার ওয়েবসাইট খোলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা বানরের ছবি খুঁজে নেন।

: দেখো পিকু, তোমার তোলা ছবির সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে। এর নাম হচ্ছে কালো মুখের টামারিন। সম্পূর্ণ নতুন প্রজাতির এই বানর জাতীয় প্রাণীর প্রথম সন্ধান পাওয়া যায় দক্ষিণে ব্রাজিলের উপকূল থেকে কিছুটা দূরের সুপারগুই দ্বীপে। প্রচণ্ড লাজুক প্রাণী। এখন পর্যন্ত এদের একটি মাত্র ছবি তুলতে পেরেছেন জিগ কচ। এটাই হচ্ছে সেই ছবি। আর তুলতে পেরছো তুমি। জানোত এই ধরনের বানরের প্রচুর দাম। প্রাণী হিসেবে বিরলতম। এ যে রীতিমতো হৈ চৈ ফেলে দেবার মতো ঘটনা। আমাদের লাওয়াছড়া বনে সন্ধান পাওয়া গেছে টামারিন প্রজাতির বানরের! আশ্চর্য ব্যাপার। ব্রেভ পিকু আমি এখনি জানিয়ে দিচ্ছি বিশ্ব বন্য প্রাণী সংরক্ষণ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে।

ইরতিজা চৌধুরীকে যথেষ্ট উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

সন্ধ্যার দিকে মোবাইলে জুবায়েরের ফোন পেয়ে ট্যাক্সি ষ্ট্যান্ডে চলে গেল পিকু। তার জন্য অপেক্ষা করছিল জুবায়ের। পিকু জুবায়েরকে ডেকে এক পাশে নিয়ে যায়।

: জুবায়ের আপনার কাছে আমি একটা তথ্য জানতে চাইছি।

: বলুন।

: গত শুক্রবার সন্ধার দিকে এক বিদেশি লোক এখান থেকে আপনার গাড়িতে ওঠে। তার সাথে ভিডিও করার যন্ত্রপাতি ছিল।

একটু ভাবে জুবায়ের। তাকে চিন্তিত দেখায়।

: মনে পড়ছে। চাইনিজ মার্কা চেহারা।

: ঠিক।

: বলতে পারেন ঐ লোকটাকে কোথায় নামিয়ে দিয়েছিলেন?

পিকুর দিকে তাকায় জুবায়ের। এ কথা কেন জানতে চাইছে। পিকু বুঝতে পারলো জুবায়ের খানিকটা দ্বিধায় পড়ে গেছে। জুবায়েরের কাছে

চাইনিজ ধরনের লোকটাকে গাড়িতে সেদিন বেশ অস্থির মনে হয়েছিল। পিকু তাকে আশ্বস্ত করে।

: এই ঠিকানা জানালে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। ঐ ভদ্রলোক আমাদের অনুষ্ঠানের ছবি তুলেছিলেন। ভুলে তার যন্ত্রপাতির সাথে আমাদের কিছু ক্যাসেট চলে গেছে। সেগুলো আমাদের খুব প্রয়োজন। আমি দেখেছিলাম ঐ ভদ্রলোক আপনার গাড়িতে করেই গেছে। এখন আপনিই করেছিলেন অনেক কষ্টে।

ইরতিজা চৌধুরী তাকালেন পিকুর দিকে। লাওয়াছড়া বনে বিরল টমারিন প্রাপ্তি রহস্যের সমাধান শেষ পর্যন্ত হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে ঐ বানরগুলো বংশ বিস্তার করে সেখানে এখনো টিকে রয়েছে।

পিকু ভাবছে পাখিবন্ধু তার সিডিটি পাওয়ার জন্য এতো হন্যে হয়ে উঠলো কেন? এজন্য বিরাট ষড়যন্ত্রের জাল ছড়ালো। তার বক্তব্য ভিডিওতে ধারণ করলো। বান্টিকে করলো কিডন্যাপ। আসলে কি চাইছিলেন পাখিবন্ধু?

পিকুর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ওঠে।

পাখিবন্ধুর কথায় জানা গিয়েছিল তিলাকিকে সে চেনে। তিলাকি একজন ভয়ংকর স্বভাবের অপরাধী। দুষ্প্রাপ্য পশুপাখি চোরাচালানকারী। কাঁটাবন বস্তিতে তার ডেরায় অভিযান চালিয়ে পাওয়া গেছে খাঁচা ভর্তি মনিপুরি পাহাড়ি কালিজ পাখি, রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বাচ্চা, মনিপুরের বিরল নাচুনে হরিণ। ইদানিং বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক পশুপাখি চোরাচালানকারীরা করিডোর হিসেবে ব্যবহার করছে। তবে কি পাখিবন্ধু এই দলের কেউ। তার উদ্দেশ্য তেলিয়াপাড়ার কালো তিতির সংগ্রহ। আর লাওয়াছড়া বনের কালো টামারিন। লোকটি তার সম্পর্কে অনেক খবর রাখতো। এক পত্রিকায় সে লাওয়াছড়ার বিচিত্র বহু বর্ণের বানরের কথা একবার লিখেছিল। হয়তো সেই সূত্র ধরেই লোকটি তাকে খুঁজে বের করেছে। তার সিডিটি সংগ্রহের জন্য কিডন্যাপ করতে চেয়েছিল। তাকে না পেয়ে শেষে বাধ্য হয়ে বান্টিকে অপহরণ করে। বোঝাই যায় লোকটি খুব দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। উচ্চারণে রয়েছে আসাম অঞ্চলের টান।

পিকু দেখা করে তার ডিআইজি খালুর সাথে। তিনি ইন্টারপোলের একজন সদস্য। পিকু জানতে চায় আন্তর্জাতিক পশুপাখি চোরাচালানকারীদের সম্পর্কে ইন্টারপোলের কোনো তথ্য রয়েছে কিনা।

পিকু যে এর মধ্যে একজন কিশোর রহস্যভেদী হিসেবে বিখ্যাত হয়েছে এ কথা পিকুর খালু জানেন। পিকুর বেশ কটি অভিযান কাহিনী জেনে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। ছেলেটি সব ব্যাপারে খুব কৌতূহলী। সাহসী। উপস্থিত বুদ্ধি প্রচুর রাখে। পিকুর প্রশ্নটি জেনে তিনি এ সম্পর্কিত ফাইলপত্র বের করলেন। পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় এসে থামলেন।

: ইন্টারপোল থেকে পাঠানো শেষ তথ্যে জানা যাচ্ছে আসামের কুখ্যাত পশুপাখি চোরাচালানকারী রিয়াকান মাইবঙ এখন বাংলাদেশে তার নেটওয়ার্ক বিস্তার করেছে। মাইবঙের কারবার বিশাল অঞ্চল জুড়ে। মেঘালয়, অরুণাচল, মিজোরাম, আসামের দুষ্প্রাপ্য পশুপাখি সে নিয়মিত বিদেশে পাচার করে। জীবন বৈচিত্র্যের জন্য সে হুমকি স্বরূপ।

পিকু জানতে চায় রিয়াকান মাইবঙের কোনো ছবি আছে কিনা ফাইলে। খালু জানালেন আছে। ফাইল থেকে মাইবঙের ছবি বের করলেন। ছবিটি দেখে চমকে ওঠে পিকু। সেই মঙ্গোলিয়ান ধাঁচের চেহারার ভিডিও নির্মাতা।

: আমি জানি মাইবঙ এখন কোথায় রয়েছে। সে এই শহরেরই আছে।

: জানো! কি বলছো।

: এই ভয়ংকর লোকটি আছে ছায়াবিথির মান্দারিন গেষ্ট হাউজে।

তাকে এখনি এরেস্ট করার ব্যবস্থা নিন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মান্দারিন গেষ্ট হাউজ ঘেরাও করে গ্রেফতার করা হয় রিয়াকান মাইবঙকে।

ইন্টারপোলের প্যারিস কার্যালয়ে সাথে সাথে খবর পাঠানো হয়।

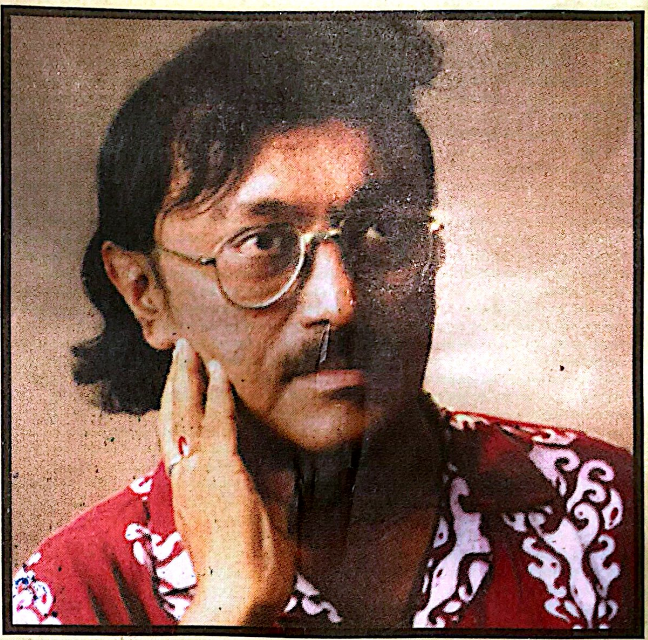
ডিআইজি খালু হাসিমুখে পিকুর পিঠ চাপড়ে দেন।

: ব্রাভো পিকু। বুদ্ধিমান সাহসী ছেলে। পৃথিবীর জীব বৈচিত্র্যকে যে মারাত্মক লোকটি স্বপ্ন বিপন্ন করে তুলেছিল তাকে আজ গ্রেফতার করা সম্ভব হলো তোমার বুদ্ধির জোরে। তুমি দেখছি ক্ষুদে শার্লক হোমস। বুদ্ধি খাটিয়ে সমস্যার সমাধান করলে। অপরাধী ধরতে প্রয়োগ করবে বিশ্লেষণ পদ্ধতি। আমি ভাবছি তোমাকে আগামী বছর লন্ডনের শার্লক হোমস যাদুঘরে নিয়ে যাব।

পিকুর মনে পড়লো টুনু মামার পাঠানো ই-মেইলটির কথা। তাকে যেতে বলেছে তেঁতুলিয়ার মহানন্দার তীরে সাইবেরিয়ান সারসের খোঁজে। কালকেই যাবে সে তেঁতুলিয়াতে।

কথাটা ভাবতেই পিকুর কাছে ভীষণ ভালো লাগে। এই ধূসর শহর ছেড়ে সে চলে যাবে বিশাল এক জলাভূমির কাছে। যেখানকার আকাশ এখন ভরে আছে পরিযায়ী পাখিদের পাখসাটে। তার মধ্যে যদি হঠাৎ করে দেখা যায় বিরল সাইবেরিয়ান সারসকে। তাহলে কি ভালোই যে লাগবে।

পিকুর চোখের সামনে থেকে তখন মিলিয়ে যাচ্ছে ধূলি ধূসর ইঁট কাঠের শহর। সে যেন দেখতে পাচ্ছে টলটলে নির্মল আকাশ। সাঁই সাঁই করে ডানা মেলে পাখিদের ফিরে আসার শব্দ শুনতে পেল পিকু।



আলোকচিত্র : তৌহিদুল ইসলাম

জন্ম : ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৫০ ব্রাহ্মণবাড়িয়া। পিতা : মরহুম আলী আকবর, মাতা : শাহজাদী বেগম।

শিশু সংগঠক, সুবক্তা এবং ৫৩০টি শিশুসাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা। প্রকৃতি, পরিবেশ, বিজ্ঞান, প্রাণিজগত, ইতিহাস, ঐতিহ্য, পুরাকীর্তি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে লিখেছেন। সাহিত্যের সবকটি শাখা, ছড়া-কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, জীবনী, ভ্রমণকাহিনি, অনুবাদ, বিজ্ঞান কল্পকাহিনি রচনা করেছেন।

১৯৬৬ সালে ঢাকার নবাবপুর স্কুল হতে ম্যাট্রিকুলেশন। ১৯৬৭-৬৯-এ জগন্নাথ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র। কলেজের ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন। ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর।

প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ : ১৯৭৬ সালে গল্প সংকলন 'দ্বীপের নাম মধুবুনিয়া'। প্রকাশক : বর্ণ মিছিল, ঢাকা।

বাংলা একাডেমীর ফেলো। দেশের বিশিষ্ট সব পত্রপত্রিকায় লিখেছেন প্রচুর। তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনের সাবেক মহাব্যবস্থাপক। তাঁকে পেশাগত কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঘুরতে হয়েছে। এর মধ্যে ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা, সিঙ্গাপুর, হংকং, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, আরব আমীরাত, জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ব্রাজিল প্রধান।

তিনি তার সামগ্রিক সাহিত্যকর্মের জন্য যে সমস্ত পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাংলা একাডেমী পুরস্কার (২০০২), শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণপদক, ইকো সাহিত্য পুরস্কার, বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ স্বর্ণপদক, নওয়াব সলিমুল্লাহ পদক, নবকুঁড়ি পদক, সমাজকল্যাণ কর্মী সংঘ পুরস্কার, জসীমউদ্‌দীন স্মৃতি সংসদ পুরস্কার, হোসনে আরা শিশুসাহিত্য পুরস্কার, অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার (২ বার), ছোটদের কাগজ শিশুসাহিত্য পুরস্কার, লুবনা জাহান সাহিত্য পুরস্কার, সুকান্ত সাহিত্য পুরস্কার, নাট্যসভা পুরস্কার, ইউরো শিশুসাহিত্য পুরস্কার, নওয়াব ফয়জুননেসা স্বর্ণপদক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী পুরস্কার (২০১২), চন্দ্রাবতী একাডেমি পুরস্কার (২০১৫)।

স্ত্রী : রাজিয়া ইমাম লিপি

পুত্র : তানভীর ইমাম অন্ত

কন্যা : সাব্রিনা ইমাম অনিতা

পৌত্র : মুনতাকা ইমাম অমিয়

শামিন মুন্তাকিন



আলী ইমাম এবং শিশুসাহিত্য-দুটোই সমার্থক। প্রায় ৫০ বছর ধরে নিরন্তর স্বপ্নবিলাসী শিশুসাহিত্য রচনার এক দক্ষ রাজকুমার তিনি। শিশুমানস, শিশুজগত, শিশুকল্পনাকে ধারণ করে বহু বিচিত্র রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি বাংলা শিশুসাহিত্য। চিরায়ত রচনাভঙ্গি, ধ্রুপদ কাহিনি নির্মাণ এবং ক্লাসিক্যাল শিশুসাহিত্যের মর্মকে তিনি কর্মে রূপান্তর করেছেন। পাঁচ শতাধিক গ্রন্থের আয়নায় আলী ইমামকে প্রতিবিম্বিত করলে বিস্মিত হতে হয়। শিশুসাহিত্য জগতের যাবতীয় অনুষঙ্গ ও কলকজাকে সযত্নে তিনি আত্মস্থ করেছেন। শব্দজালে বন্দি করেছেন মধুর রূপকল্পনাকে। আলী ইমাম সেই বিরল বাক্য শ্রমিকদের একজন-ত্যাগ ও মোহের ছলনে যিনি শিশুসাহিত্যের স্বপ্নময় পথ থেকে কখনই সরে দাঁড়াননি।

কমপ্লিট শিশুসাহিত্যিক বলতে যা বোঝায় আলী ইমাম তারই স্বয়ন্ত প্রতীক। শুধুই অর্থহীন কল্পনার উড্ডীন ফানুস নয়, আলী ইমামের রচনা বাস্তব পৃথিবীর ধুলিকণাকেও স্পর্শ করেছে। আলী ইমামের মূল ক্ষেত্র গদ্য রচনা। গল্প, উপন্যাস, ফিচার, ভ্রমণকাহিনি, বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা, প্রবন্ধ-বিন্দু বিন্দু বহু রত্নকণায় তিনি আমাদের শিশুসাহিত্যকে পত্র-পুষ্প-পল্লবে সজ্জিত করেছেন। আলী ইমাম নিজস্ব অবস্থান তৈরি করেছেন স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে। নিষ্ফলা, অনুর্বর, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিভাবকহীন আমাদের শিশুসাহিত্যকে তিনি সাবালক করেছেন। অজস্র, অবিরাম, ক্লান্তিহীন রচনা তার। দূর লক্ষ্যপানে একাকী অভিলাষী যাত্রা তার। আলোর মশাল হাতে, গভীর ও সুপ্তি-ভাঙানিয়া, তিমিরবিদারী অভ্যুদয়ের সৈনিক তিনি। এক সামগ্রিক জীবন-মগ্নতায় শিশুচৈতন্যকে যিনি লালন করেন, তার মতো সার্থকনামা শিশুসাহিত্যিক সমগ্র বাংলাসাহিত্যের প্রেক্ষাপটেই খুঁজে পাওয়া ভার। দ্বিধাহীন বাক্যে লেখা যায়, আলী ইমাম একমেবাদ্বিতীয়ম।

প্রচ্ছদ :: মশিউর রহমান